ড. মরিস বুকাইলি

বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান

রূপান্তর : খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান

বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান

মূল : ড. মরিস বুকাইলি

রূপান্তর

খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান

©
প্রকাশক

জ্ঞান বিতরণী প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১২

প্রচ্ছদ

সুব্রত সাহা

প্রকাশক

মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১৭৩৯৬৯

অক্ষরবিন্যাস

জন্মভূমি কালার স্পট

মুদ্রণ

নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস

১০/১ বি. কে. দাস রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা
প্রফেসর বুক কর্ণার
১৯১, মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা

যুক্তরাজ্য পরিবেশক

সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য

২০০ টাকা U.S.$-5

BIBLE KORAN O BIGGAN
Written By **Dr. Maurice Bucaille**
Translated by **Khandakar Mashood-ul-Hasan**
Published By Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/-2ka Banglabazar
Dhaka-1100, Tel : 7173969

ISBN : 984-8747-67-2

অনুপ্রেরণার প্রয়াসে

শামীমা হাছান নিম্নি

ভূমিকা

প্রকৃতপক্ষে, পাঠকদের উদ্দেশে আমার প্রথমেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করা উচিত। কেননা, "ভূমিকার বদলে" এই গ্রন্থে আমি একটি ভূমিকার স্বরূপ সন্নিবেশিত করেছি; কিন্তু তবুও "প্রথা" বলে কথা। বইতে যেন ভূমিকা একটি দিতেই হবে, এ না হলে আমাদের দেশের পাঠক-প্রকাশকদের একটি বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে যা ভেঙে দেবার সাহস, সাধ আমার থাকলেও সাধ্য নেই।

যাহোক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই; এখানে এখন শুধু এটুকুই বলবো, এই গ্রন্থ গ্রন্থিত হয়েছে ড. মরিস বুকাইলি বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান গ্রন্থকে উপলক্ষ করে। আর তাই এই বইয়ের নাম দেয়া হয়েছে *"বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান"*।

এক্ষেত্রে, ড. মরিস বুকাইলির বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান বইতে যা পাঠনীয় রয়েছে, উপরন্তু আরও বেশিকিছু নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে, এই বইয়ের পাঠক বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান বইতে পঠনীয় পাঠসহ আরও বেশকিছু নতুন তথ্য পাবেন। এই গ্রন্থকারের এই গ্রন্থনার উদ্দেশ্য— তিনি মনে করেন, ড. মরিস বুকাইলি এখন যদি তাঁর বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান বইটি লিখতেন, সম্ভবত তিনি এ সকল তথ্য সন্নিবেশিত করতেন। এমনকি আরও বেশিকিছু।

যাহোক, অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন কলেবরে কম অথচ তথ্যেসমৃদ্ধ এ আবার কেমন দাবি? উত্তরে বলবো, বইটি পড়ে দেখুন।

শেষোক্ত, গ্রন্থকার নিজের সকল ঔদ্ধত্যপনা এবং পুনর্ব্যক্ততার জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয় হয়ে সকলের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রার্থনা করে আমার একমাত্র পুত্র খন্দকার শামস্ ইবতেহাজ জাহানের প্রজন্মের হাতে বইটি তুলে দেয়া হলো যেন বইটি সর্বপঠনীয় হয়ে ওঠে এই কামনায়। প্রকাশকসহ প্রকাশনার কাজে যাঁরা নিরলস কাজ করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাবার দুঃসাহস আমার না থাকলেও জানালাম, পাঠকদের নিকট পরীক্ষা প্রার্থনীয় থেকে বিদায় নিলাম।

— খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান

সূচিপত্র

ভূমিকা নয়, সূচনা

নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ রয়েছে, একত্ববাদী এমন তিনটি ধর্ম— ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম। এ সকল ধর্মে বিশ্বাসীদেরকে তাঁদের ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান। যে ধর্মে যে বিশ্বাসী তাঁদের কাছে তিনি যে-ই হোন-না-কেন, তাঁর ধর্মগ্রন্থ তাঁর বিশ্বাসের বুনিয়াদ, নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থকে আসমানী ওহীর লিপিবদ্ধ রূপ বলে বিবেচনা করেন। তাঁদের বিশ্বাস, এ ধরনের ওহী হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এবং হযরত মুসা (আঃ) সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেয়েছিলেন এবং ওহী হযরত ঈসা (আঃ) লাভ করেন ফাদার বা পিতার নামে আর হযরত মোহাম্মদ (দঃ) লাভ করেছিলেন প্রধান ফিরিস্তা জিব্রাইলের মাধ্যমে।

ধর্মীয় ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে তাওরাত, জবুর, ইঞ্জিল অর্থাৎ বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম এবং কোরআন একই ধরনের ওহী বা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্মগ্রন্থ।

যদিও বর্তমান সভ্য-জগতের সাল-গণনার প্রথম শতকে এবং আরও অনেক আগেও 'বাইবেল' শব্দটি কারও জানা ছিল না। অর্থাৎ, কোন পুস্তককে, নাম বাইবেল ছিল না। অবশ্য, চতুর্থ শতকে কনস্টান্টিপোলের (বর্তমানে যে-স্থান ইস্তাম্বুল) একজন গোষ্ঠীপতি জন ক্রাইসোটর ইহুদিদের দ্বারা সংগৃহীত পুঁথিগুলোকে 'বিবলিয়া' অর্থাৎ 'বুকস' (গ্রন্থমালা) বলে উল্লেখ করেছেন।

বাইবেলের দু'টি অংশ ঃ প্রথম অংশকে বলা হয় 'পুরাতন নিয়ম' (The Old Testament)। এতে রয়েছে, যীশুর অবর্তমানে বিভিন্ন লেখক কর্তৃক যীশুর জীবনী, উপদেশাবলী এবং তৎপ্রতি প্রত্যাদিষ্ট ঐশীবাণীসমূহের অংশবিশেষ প্রসঙ্গক্রমে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে।

এখন থেকে সোয়াশ' বছর আগে থেকে আরম্ভ করে এখনপর্যন্ত অনেক জ্ঞানীব্যক্তি বিশুদ্ধ খ্রিস্টান হয়েও বাইবেলের উক্তিগুলোকে ঠিক আপ্তবাক্য বলে মেনে না নিয়ে, নিজেদের বিচার-বুদ্ধির আলোকে ক্রমাগত তথ্য অনুসন্ধান করতে করতে সুসমাচার সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। যা আপ্তবাক্যের চেয়েও নির্ভরযোগ্য।

তাঁদের সকলের সিদ্ধান্ত সবসময় একইরকম না হলেও তা থেকে মোটামুটি ধারণা জন্মে যে, বাইবেলের 'নতুন নিয়ম' 'পুরাতন নিয়ম'-এর বৈপরীত্য ছাড়াও নানারকম তর্ক-বিতর্ক বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি করে।

এই পুস্তকে কোনো ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মাবলম্বীকে বা তাঁর বা তাঁদের বিশ্বাসকে আঘাত হানার প্রয়াস চালানো হয়নি বরং বিশ্বাস করে নিতে দ্বিধা নেই একত্ববাদী ধর্মাবলম্বীদের নিকট অবশ্যই অনেক ঐশ্বরিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্মগ্রন্থ এসেছে।

যদিও মুসলমানেরা এই নীতি মেনে চলেন, কিন্তু কোরআনকে পাশ্চাত্যের ইহুদী-খ্রিস্টান সংখ্যাগুরু সমাজ প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চান না। ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে পরস্পরের এই যে দৃষ্টিভঙ্গি, খুব সম্ভবত এ থেকেই কারো বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, একটি ধর্মীয় সমাজ অপর ধর্মীয় সমাজ সম্পর্কে কি ধরনের মনোভাব পোষণ করেন। ইহুদিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিব্রু ভাষার বাইবেল। উল্লেখ্য, হিব্রু বাইবেল খ্রিস্টানদের বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বা 'পুরাতন নিয়ম' থেকে আলাদা।

খ্রিস্টানরা এই 'ওল্ড টেস্টামেন্টে' বেশ কয়েকটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন যা হিব্রু বাইবেলে অনুপস্থিত। এই সংযোজনা কিন্তু বাস্তবে ইহুদি মতবাদে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটিয়েছে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা, ইহুদিরা নিজস্ব হিব্রু বাইবেলের পরে আর কোনো ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার কথা অস্বীকার করেন। হিব্রু বাইবেল যেমনটি ছিল তেমনইভাবে তাকে গ্রহণ করা হলেও এরসঙ্গে খ্রিস্টানরা আরও কিছু নতুন অধ্যায় সংযোজন করেছেন। যদিও খ্রিস্টানরা যীশুর ধর্মপ্রচারের সাথে পরিচিত সবগুলো রচনাকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেননি। যীশুর জীবনী ও শিক্ষা-সংক্রান্ত পুস্তকের সংখ্যা কম ছিল না, তবুও নিজেদের ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গির্জার পুরোহিত-অধিকারীরা এসব থেকে যাচাই-বাছাই ও কাট-ছাঁট করে শুধু কয়েকটি রচনাকে ধর্মগ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছেন। এভাবে, কিছুসংখ্যক রচনা বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে স্থান পেয়েছে। এরমধ্যে প্রামাণ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিচিত চারটি গসপেল বা সুসমাচার। খ্রিস্টানরাও যীশু এবং তাঁর প্রেরিতদের পর আর কোনো প্রত্যাদেশের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাই কোরআন তাঁদের কাছে বাতিল বলে গণ্য।

যীশুখ্রিস্টের ছ'শ বছর পর কোরআনের বাণীসমূহ অবতীর্ণ হয়, তাওরাত ও গসপেলের (ইঞ্জিল) বহু তথ্য ও পরিসংখ্যানের উল্লেখ ছাড়াও কোরআনে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বহুল উদ্ধৃতি বিদ্যমান। কোরআন ঃ ৪ ঃ ১৩৬-এর মাধ্যমে

ইতিপূর্বেকার সবগুলো আসমানী কিতাবের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়াও, কোরআন অন্যান্য পয়গম্বর যেমনঃ যীশু বা হযরত ঈসা, হযরত মুসা ও তাঁর পরবর্তী নবীদের এবং তাঁদের ওপর অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহ্‌র বাণী সম্পর্কে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিশেষ এক মর্যাদা দেয়া হয়েছে যীশু বা হযরত ঈসা (আঃ)-কে। বাইবেলের মতো কোরআনও তাঁর জন্মকে অতি-প্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছে। কোরআনে যীশুমাতা মেরী বা হযরত মরিয়ম বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন। এমনকি কোরআনের ১৯নং সূরার নামকরণ করা হয়েছে যীশুমাতার নামানুসারে 'মরিয়ম'।

সাধারণভাবে পূর্ববর্ণিত তথ্যসমূহ পাশ্চাত্যের লোকজনের অজানা। যদিও, তাই বলে বিস্ময়ের কিছু নেই, পাশ্চাত্য জগতে পুরুষানুক্রমে এমনভাবে এই শিক্ষাই দিয়ে আসা হচ্ছে। এক্ষেত্রে, তাঁদের অন্যতম প্রচারণা ইসলাম ধর্ম সম্পূর্ণভাবে একজন মানুষের সৃষ্টি এবং এই ধর্মের প্রবর্তনায় গড বা বিধাতার (খ্রিস্টীয় অর্থে) কোনো ভূমিকা নেই।

এখন বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ইসলামের দার্শনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে আগ্রহী হলেও তাঁরা কখনো ইসলামের ওহী বা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বাণী-সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের তেমন কোনো আগ্রহ অনুভব করেননি। অথচ, তা করা তাঁদের উচিত।

ড. মরিস বুকাইলি বলেন,

"যখন আমি বাইবেল ও কোরআনের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের জন্য খ্রিস্টান মহলের সাথে মত বিনিময়ের চেষ্টা চালিয়েছিলাম, তখন এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, মুসলমানদের কী ঘৃণার চোখেই না দেখে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীগণ।"

ড. মরিস বুকাইলি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা চিরাচরিত পদ্ধতিতেই কোরআনের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছেন। বিভিন্নবিষয়ে কোরআনের যে বক্তব্য, তা গ্রহণ করা তো দূরের কথা, এতদসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে কোরআনের প্রতি সামান্য আকার-ইঙ্গিতও তাঁরা আমলে নিতে রাজি হননি। কোরআনের কোনো উদ্ধৃতি তাঁদের কাছে দেয়া যেন শয়তানের বরাত দিয়ে কথা বলার সমান।

যাহোক, এখন খ্রিস্টান-জগতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে এ-বিষয়ে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ভ্যাটিক্যানের 'নন-ক্রিশ্চিয়ান এ্যাফেয়ার্স দফতর থেকে দ্বিতীয় ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলের পর একটি তথ্যমূলক পুস্তিকা

প্রকাশ করা হয়েছে। এর ফরাসি নামের বাংলা হচ্ছে 'মুসলিম-খ্রিস্টান আলাপ-আলোচনায় দিক-নির্দেশিকা'। ১৯৭০ সনে ফরাসি ভাষায় এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় রোমের "আনকোরা" নামের এক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে।

এই পুস্তকে মুসলমানদের ব্যাপারে ভ্যাটিক্যানের দৃষ্টিভঙ্গি যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, এই পুস্তকে ইসলাম সম্পর্কে খ্রিস্টানদের প্রতি অতীত থেকে পাওয়া যাবতীয় বাতিল ধারণা ও কুসংস্কার এবং বিদ্বেষপ্রসূত বিকৃত মতামত পরিহারের জন্য বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ভ্যাটিক্যান থেকে সম্প্রচারিত এই দলিলে স্বীকৃত হয়েছে ঃ

> "অতীতে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে এবং সেজন্য খ্রিস্টবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত পাশ্চাত্য সমাজই দায়ী।
>
> তাছাড়া, খ্রিস্টানদের মধ্যে যে-সব ভুল ধারণা রয়েছে মুসলমানদের অদৃষ্টবাদ, ইসলামিক বিধি-বিধান, তাঁদের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে সে-সব নিয়েও এই বইয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। এই পুস্তকে স্রষ্টার একত্বের ভিত্তিতে ঐক্য গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপসহ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যে, ১৯৬৯ সনের মার্চ মাসে কার্ডিনাল কোয়েনিং এক সরকারি বৈঠকে যোগদানের জন্য কায়রো শহরে গিয়ে আল-আজহার মুসলিম ইউনিভার্সিটির জামে মসজিদে এই ঐক্য গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর সেই আহবানে শ্রোতারা অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই পুস্তকে এও বলা হয়েছে যে, ১৯৬৭ সনে ভ্যাটিক্যান দফতর থেকে রমজান শেষে যথাযথ ধর্মীয় গুরুত্ব সহকারে মুসলমানদের প্রতি পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য খ্রিস্টানদের প্রতি আহবান জানানো হয়েছিল।
>
> রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাস ও ইসলামের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে এই যে পদক্ষেপ, তা কিন্তু এখানেই থামেনি, বরং পরবর্তীতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও যৌথ বৈঠকের মাধ্যমে তা আরো গতিশীল ও আরো সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। অবশ্য, সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশনের দ্বারা তো বটেই অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের সকল সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এইসব ঘটনা তেমন কোনো প্রচার পায়নি।
>
> ভ্যাটিক্যানের 'নন-ক্রিশ্চিয়ান এ্যাফেয়ার্স দফতরের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল পিগনোডেলি ১৯৭৪ সনের ২৪ এপ্রিল সরকারি সফরে সৌদি আরব যান এবং বাদশাহ্ ফয়সালের সাথে সাক্ষাৎ করেন, এই

সংবাদটিও পত্র-পত্রিকায় তেমন কোনো প্রচার পায়নি। এ সম্পর্কে ফরাসি সংবাদপত্র লে মন্ডেতে কয়েক ছত্র সংবাদ প্রকাশ করেছিল, তারিখটি ২৫শে এপ্রিল ১৯৭৪। ওই সংবাদসূত্রে জানা যায়, 'ইসলামী বিশ্বের প্রধানতম নেতা মহামান্য বাদশাহ্ ফয়সালের নিকট মহামান্য পোপ ৪র্থ পল এই মর্মে এক বাণী পাঠিয়েছিলেন যে, তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, এক আল্লাহ্‌র আনুগত্যের ভিত্তিতে ইসলামী বিশ্ব ও খ্রিস্টান-জগৎ ঐক্য গড়ে তুলতে পারে।"

ঘটনার গুরুত্ব এই বাণীর মর্ম থেকেই উপলব্ধি করা যায়।

উল্লেখ্য, এর কয়েক মাস পর সৌদী আরবের গ্র্যান্ড উলেমা এক সরকারি সফরে ভ্যাটিক্যানে আসেন এবং পোপ তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এই উপলক্ষে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে এক আলোচনা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার শিরোনাম ছিল 'ইসলামে মানুষের সাংস্কৃতিক অধিকার'। ভ্যাটিক্যানের সংবাদপত্র 'অবজারভেটর রোমানো' ১৯৭৪ সনের ২৬ অক্টোবর প্রথম পৃষ্ঠায় এই ঐতিহাসিক বৈঠকের বিবরণ প্রকাশ করে।

উল্লিখিত বৈঠকের সমাপ্তি অধিবেশনে রোমের সাইনড অব বিশপবর্গ উপস্থিত ছিলেন কিন্তু এই সমাপ্তি অধিবেশনের সংবাদটি প্রথম অধিবেশনের তুলনায় ছোট করে ছেপেছিল।

সৌদি আরবের গ্রান্ড ওলেমাকে এরপর সংবর্ধনা জানান, জেনেভাস্থ গির্জাসমূহের এডুমেনিকাল কাউন্সিল এবং স্ট্রাসবুর্গের লর্ড-বিশপ মহামতি এলাচিংগার। বিশপ তাঁর উপস্থিতিতেই গ্রান্ড উলেমাকে গির্জাতে জোহরের নামায আদায় করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অনুমান করা চলে, ধর্মীয় গুরুত্ব হিসেবে নয় বরং *বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার বিবরণী হিসেবে সংবাদপত্রগুলোতে ওইসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।* কেননা, এসব ঘটনার মধ্যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সম্পর্কে ড. মরিস বুকাইলি যাঁদেরই প্রশ্ন করেছেন, জেনেছেন, তাঁদের অনেকেই এর গুরুত্ব সম্পর্কে তেমন সচেতন নন।

ইসলাম সম্পর্কে পোপ চতুর্থ পল এই যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তা দুই ধর্মের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পথে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে যা দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

পোপ নিজেই এ ব্যাপারে বলেন যে, "এক আল্লাহ্‌র উপাসনার ভিত্তিতে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার ব্যাপারে এক সুগভীর বিশ্বাস তাঁকে পরিচালিত করেছিল।"

ক্যাথলিক চার্চের প্রধানের কাছ থেকে মুসলমানদের জন্য এরকম মানসিক ভাবাবেগের সত্যি প্রয়োজন রয়েছে। কেননা, বেশিরভাগ খ্রিস্টানই বড় হয়ে থাকেন ইসলাম-বিরোধিতার বিদ্বেষপূর্ণ এক উদ্দীপনার মধ্যে। ফলে, তাঁরা আদর্শের প্রশ্নে ইসলামের নামগন্ধ পর্যন্ত বরদাশত করতে রাজি নন। ভ্যাটিক্যান থেকে প্রকাশিত উল্লিখিত পুস্তকে এ জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

এ কথাও অনস্বীকার্য নয়, উল্লিখিত বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের জন্যেই সত্যিকারার্থে ইসলাম যে কি, তা বেশিরভাগ খ্রিস্টান সম্পূর্ণভাবেই অজ্ঞাত থাকেন। একই কারণে ইসলামী-প্রত্যাদেশ সম্পর্কে তাঁদের ভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা রয়ে গেছে।

যাহোক, স্বাভাবিকভাবেই একত্ববাদী কোনো একটি ধর্মের প্রত্যাদেশ-সংক্রান্ত কোনো বিষয় যখন পর্যালোচিত হয় তখন এ বিষয়ে অপর দুই একত্ববাদী ধর্মের বক্তব্য কি, তার তুলনামূলক আলোচনাও এসে পড়ে।

তাছাড়া, যেকোনো সমস্যার সার্বিক বিচার-পর্যালোচনা বিচ্ছিন্ন কোনো আলোচনার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়। এ কারণে ড. মরিস বুকাইলি মন্তব্য করেন,

> "যেসব বিশেষ বিষয়ে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের বক্তব্যের সাথে বিশ-শতকের বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধ রয়েছে বলে মনে করা হয়, সেসবের পর্যালোচনায়ও উল্লিখিত তিন ধর্মের কথা এসে যায়। সকলের এই সত্যও অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, বস্তুবাদের সুতীব্র অভিযানের মুখে তিন ধর্মই আজ হুমকির সম্মুখীন, এই যখন অবস্থা, তখন পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গুণে ধর্ম তিনটি সহজেই সমবেতভাবে একটি সুদৃঢ় প্রতিরোধ-প্রাচীন গড়ে তুলতে পারে। বিজ্ঞান এবং ধর্ম পরস্পরবিরোধী বলে যে ধারণা, তা ইহুদী ও খ্রিস্টান-অধ্যুষিত দেশগুলোতে যেমন, তেমনি মুসলিম বিশ্বেরও কোনো কোনো মহলে বেশ জোরদার। কেন এই অবস্থা— সে প্রশ্নের সার্বিক জবাব খুঁজে পাওয়ার জন্য দীর্ঘতর আলোচনা প্রয়োজন।

প্রকৃতপক্ষে, এই পর্যালোচনা তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে অগ্রসর হওয়ার আগে একটি মৌলিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর খুঁজে নিতে হবে। সেই প্রশ্নটি হচ্ছে, ধর্মগ্রন্থের লিপিবদ্ধবাণীসমূহ কতোটা সঠিক? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে যে অবস্থা ও যে পরিবেশে এসব বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা যেমন পরীক্ষণীয়; তেমনি এও পরীক্ষণীয় যে, কার মাধ্যমে বা কোন পথে এসব বাণী মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

পাশ্চাত্য জগতে বাইবেলের সমালোচনামূলক গবেষণা একদম হালের ঘটনা। শত শত বছর ধরে সেখানকার মানুষ নতুন ও পুরাতন নিয়ম তথা বাইবেলকে যখন যে অবস্থায় পেয়েছে, তখন সে অবস্থায় তা গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত থেকেছে। এই ধর্মগ্রন্থ তারা যেমন ভক্তিভরে পাঠ করেছে, তেমনি টীকা-টিপ্পনী সংযোজন করে সে গ্রন্থের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনেরও প্রয়াস চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, ধর্মগ্রন্থের বিরুদ্ধে সামান্যতম সমালোচনাকেও তারা 'পাপ' বলে গণ্য করতে ছাড়েননি। এই বিষয়ে, পুরোহিতেরা ছিলেন সবসময়ই সবার উপরে। কেননা, তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ বাইবেল ভালোভাবে জানার সুযোগ ছিল বেশি। পক্ষান্তরে, বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ ধর্মীয় ভাষণ কিংবা বিভিন্ন উপাসনা উপলক্ষে বাইবেলের নির্বাচিত অংশের পাঠ শুনেই নিজেদের ধন্য মনে করেছেন।

কোনো ধর্মগ্রন্থের উপর বিশেষভাবে কোনো গবেষণা পরিচালনাকালে দেখা গেছে যে, এতদ্‌সংক্রান্ত কোনো সমস্যা যা কখনো কখনো জটিল হয়ে দাঁড়ায়, তার মূল উদ্‌ঘাটন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণের জন্য সেই গ্রন্থের পাঠ বা বাণীর দোষ-গুণ বিচারের প্রয়োজন সর্বাধিক। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের গুণাগুণ বিচারের নামে তথাকথিত গবেষণামূলক যেসব পুঁথি-পুস্তক বাজারে রয়েছে সেগুলো পাঠ করলে নিরাশ হতে হয়।

কারণ, সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এইসব পুস্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনে এমনভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, লেখক যেন সেই সমস্যা এড়িয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন। এসব ক্ষেত্রে যাঁরা ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতা রাখেন ও নিরপেক্ষ রায় প্রদানের সাহস দেখাতে পারেন, তাঁরাও কিন্তু নিজেদের আজগুবি ধারণা ও স্ববিরোধিতা ঢেকে রাখতে পারেন না। আরো দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, যতো তর্কই হোক আর যতো যুক্তিই দেখানো হোক, সেসবের মোকাবেলায় অনেকেই নির্দ্বিধায় বাইবেলের অংশবিশেষকেই প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পেশ করেন। তাঁরা বুঝতেও চান না যে, বাইবেলের এইসব বক্তব্য কতোটা ভ্রান্ত ও ধাঁধায় পূর্ণ। তাছাড়া, এইসব লেখক একবারও ভেবে দেখেন না যে, তাঁদের এই ধরনের যুক্তিহীনতা স্রষ্টার অস্তিত্বে-বিশ্বাসী শিক্ষিত লোকদের মনোভাবে কি বিরূপ ও ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

বরং, এমনও দেখা গেছে, সামান্য কিছুসংখ্যক লোকই এ যাবত বাইবেলের এসব গোলকধাঁধা চিহ্নিত করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। পক্ষান্তরে, বেশির ভাগ খ্রিস্টান তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা সত্ত্বেও বাইবেলের ওইসব অসঙ্গতির ব্যাপারে নির্বিকার থাকেন।

যদিও, সেসব অসঙ্গতি একেবারেই মৌলিক বিষয়-সংক্রান্ত। উল্লেখ্য, বাইবেলের নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত সুসমাচারসমূহের সাথে তুলনীয় হতে পারে, এমন ধর্মগ্রন্থ মুসলমানদেরও রয়েছে, তাহলো ঃ হাদীস গ্রন্থ। হাদীস হলো, মোহাম্মদের (দঃ) বক্তব্য ও কার্যবিবরণীর সংকলন। যীশুর বাণী ও কর্মবিবরণীর সংকলন হিসেবে বাইবেল। অর্থাৎ, নতুন নিয়মের সুসমাচারসমূহ : ইঞ্জিল হলো খ্রিস্টানদের অনুরূপ ধর্মগ্রন্থ। যীশুর আবির্ভাবের কয়েক দশক পরে যেমন বাইবেলের সুসমাচারসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তেমনি হাদীসও লিপিবদ্ধ হয়েছিল। মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর কয়েক দশক পর হাদীস ও বাইবেল উভয়ের মধ্যেই রয়েছে অতীতের ঘটনাবলীর মানবীয় সাক্ষ্য। পক্ষান্তরে, অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রামাণ্য বাইবেলের (সুসমাচারসমূহ) রচয়িতারা নিজেরা কিন্তু লিপিবদ্ধ ঘটনার কিংবা কোনো বিবরণের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। এই পুস্তকে আলোচিত হাদীসের সংকলকদের ব্যাপারেও একথা প্রযোজ্য।

এখানেই হাদীস ও বাইবেলের তুলনামূলক আলোচনার শেষ। হাদীসসমূহের সঠিকত্ব বা নির্ভুলতা নিয়ে অতীতে বহু বিচার, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। পক্ষান্তরে, খ্রিস্টীয় প্রথম শতকেই গির্জার অধিকারীবৃন্দ বহুসংখ্যক সুসমাচার থেকে যাচাই-বাছাই করে শুধু চারটি সুসমাচারকে প্রামাণ্য বলে চূড়ান্তভাবে রায় দিয়েছেন। অথচ, বাইবেলের নতুন নিয়মে সংকলিত সেই চারটি প্রামাণ্য সুসমাচারে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে তেমন কোনো ঐকমত্য সৃষ্টি হয় না। তবুও, ওই চারটিকে 'প্রামাণ্য' বলে গ্রহণ করে বাদবাকি সুসমাচারকে 'বাতিল' বলে রায় দেয়া হয়। এভাবে বাতিলকরণের এই প্রক্রিয়া থেকেই 'এ্যাপোক্রাইফা' টার্মের উৎপত্তি।

ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারে খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে আর একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান ঃ খ্রিস্টানদের এমন কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই যার বাণীসমূহ সরাসরি ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং যে গ্রন্থে বাণীসমূহ হুবহু লিপিবদ্ধ। পক্ষান্তরে, ইসলামের কোরআন এই চরিত্রের ধর্মগ্রন্থ, এই গ্রন্থ সরাসরিভাবে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত।

কোরআন প্রধান ফিরিশতা জিব্রাঈলের মাধ্যমে মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক প্রাপ্ত ওহী তথা আল্লাহ্‌র বাণী। প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ওহীর বাণীসমূহ লিখে রাখা হত; বিশ্বাসীরা তা কণ্ঠস্থ করে ফেলতেন এবং নামাজে সেইসব বাণী বা আয়াত তেলাওয়াত করা হত যা এখনো হয়। বিশেষত, প্রাপ্ত বাণীসমূহ রমজান মাসে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে তেলাওয়াতের ব্যবস্থা থাকতো। এখনো সেই ধারা চালু রয়েছে। মোহাম্মদ (দঃ) নিজেই প্রাপ্ত বাণীসমূহ বিভিন্ন সূরায় ভাগ করে

গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে এইসব সূরা সংগ্রহ করে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

এখন যে কোরআন, এই হলো সেই গ্রন্থ। অপরপক্ষে, খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে সংকলিত হয়েছে। তাদের ধর্মগ্রন্থের বাণীসমূহ সরাসরি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত নয়; বরং তা বহুজনের বর্ণিত পরোক্ষ বিবরণী।

মূলত, যীশুর জীবন-বৃত্তান্ত কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর চাক্ষুষ বিবরণী থেকে পাওয়া যায় না। যদিও অনেক খ্রিস্টানই মনে করেন, বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের ধর্মগ্রন্থের বাণীর সঠিকত্ব ও নির্ভুলতা নিয়ে যেসব প্রশ্ন ওঠে, এই তার মূল পটভূমি।

যে দ্বন্দ্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর সাথে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বলে কথিত ধর্মগ্রন্থসমূহের, তা সবসময় মানুষের চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। প্রথমে মনে করা হত, বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়াটাই বুঝি কোনো ধর্মগ্রন্থের বাণীর সঠিকত্ব ও নির্ভুলত্বের প্রয়োজনীয় প্রমাণ। সেন্ট অগাস্টাইন তাঁর ৮২নং পত্রে ধর্মগ্রন্থের সঠিকত্ব-বিচারের এই নিয়ম প্রবর্তন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের আরো অগ্রগতি সাধিত হলে দেখা যায়, বিজ্ঞানের সাথে বাইবেলোক্ত সুসমাচারসমূহের অসঙ্গতি খুবই স্পষ্ট। পরিশেষে, এই মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে, অতঃপর বাইবেলের তুলনামূলক বিচার-পর্যালোচনার ধারা স্থগিত থাকবে। এই সিদ্ধান্তের ফলেই এখন এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যেখানে এসে বাইবেলের ভাষ্যকার ও বিজ্ঞানীরা একে অপরের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। যাহোক, যে গ্রন্থের বাণী সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল নয়, তাকে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করে নেয়া যায় না।

এক্ষেত্রে যদিও সামঞ্জস্য বিধানের একটা পথ খোলা থাকে। তা হলো, ধর্মগ্রন্থের যেসব বক্তব্য বিজ্ঞানের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়, সেসব বক্তব্যকে অসত্য বলে বিবেচনা করে সান্ত্বনা লাভ করা। কিন্তু এ পন্থাও ধর্মীয় নিয়ম বলে গ্রহণ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে, ধর্মগ্রন্থের অখণ্ডতা ও তার প্রতিটি বাণীর সত্যতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞরা বাইবেলের সুসমাচারসমূহের প্রতিটি বাণীকে সত্য বলে চালানোর জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন। অথচ, কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষেই এ ধরনের অযৌক্তিক কোনো বিষয়কে সমর্থন করা অসম্ভব।

বাইবেলের ক্ষেত্রে সেন্ট অগাস্টাইন যেভাবে মনে করতেন, সেভাবে ইসলামের অনুসারীরাও সবসময় মনে করে আসছেন যে, আসমানী কিতাবের বক্তব্য বৈজ্ঞানিক সত্যের সমর্থক। এমনকি, আধুনিককালে ইসলামের ধর্মগ্রন্থ

কোরআন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনার পরেও এ মনোভাব পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে না। এই গ্রন্থপাঠে দেখা যাবে, বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের বহু বিষয় কোরআনে উল্লিখিত রয়েছে এবং কোরআনের বাণীসমূহ বাইবেলের বাণীর তুলনায় নির্ভুল। বাইবেলে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বক্তব্য অল্প কিছুসংখ্যক; কিন্তু সেগুলো বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী।

পক্ষান্তরে, বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বক্তব্য কোরআনে প্রচুর এবং তার সবগুলোই সত্যনিষ্ঠ। বস্তুত, কোরআনে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত একটি বক্তব্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেটি বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী। ড. মরিস বুকাইলির আলোচ্য গবেষণায় কোরআন সম্পর্কে এই মূল সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

হাদীস হল, মোহাম্মদের (দঃ) বাণীর সংকলন। হাদীসের পুস্তকগুলোতে এমন কিছু কিছু বক্তব্য দেখা যায় যেগুলো বৈজ্ঞানিক দিকথেকে অগ্রহণযোগ্য।

উল্লেখ্য, ইসলামের সুনির্দিষ্ট নীতির আলোকেই হাদীসগ্রন্থসমূহের উপর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। অজানা নয়, কোনো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কোরআনের সুস্পষ্ট নীতি ও নির্দেশ ঃ

বিজ্ঞান তথা যুক্তির নিরিখে কোনো বক্তব্য যদি অসঙ্গত বিবেচিত হয়, তবে সে বক্তব্যের সূত্র যতো সঠিকই হোক না কেন, তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধর্মগ্রন্থের কোনো বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক সত্যের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য কিংবা অগ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত করার আগে 'বৈজ্ঞানিক সত্য' সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা প্রদান জরুরি।

এ বিষয়ে একটি কথার উপর ড. মরিস বুকাইলি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

তিনি বলেন,

"বৈজ্ঞানিক তথ্য-পরিসংখ্যান বলতে সেই সত্যকে বোঝাতে চেয়েছি, যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই বিবেচনায় ব্যাখ্যামূলক সেইসব থিওরি বা সিদ্ধান্ত বাদ দেয়া হয়েছে যেসব থিওরি একসময় কোনো প্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হত, কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে সেগুলোর উপযোগিতা হারিয়ে গেছে।

এ কথার মাধ্যমে যা বলতে চাওয়া হচ্ছে, তা হলো, ড. বুকাইলি শুধু সেই বৈজ্ঞানিক সত্যকেই বিচারের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছেন যা অখণ্ডনীয় এবং অবিসম্বাদিতভাবেই সত্য। আর যেসব বিষয়ে বিজ্ঞান এ যাবত কিছু আংশিক বা

অসম্পূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছে, সেসব ক্ষেত্রে শুধু ততোটুকু গ্রহণ করা হয়েছে যতোটুকু বৈজ্ঞানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যতোটুকুর ব্যবহারে ভুলের কোনো আশঙ্কা নেই।

এখানে একটি উদাহরণ তুলে ধরে ড. মরিস বুকাইলি বলেন,

'যদিও পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের কোনো সন-তারিখ বিজ্ঞানীদের হাতে নেই, তবু সুদূর অতীতের মানুষের নানাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ ও বিভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব আবিষ্কার থেকে আমরা মোটামুটিভাবে মানুষের আবির্ভাবের একটা সময়কাল পাচ্ছি। আর সেই সময়টা হচ্ছে— খ্রিস্টপূর্ব এক কোটি বছর আগে (টেন্‌থ মিলিয়ন বি. সি.)। এ বিষয়ে বাইবেলে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাকে কিছুতেই বিজ্ঞানের সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে পারি না। বাইবেলের আদিপুস্তকে (টেক্সট অব জেনেসিস) আদি মানুষের আবির্ভাবের অর্থাৎ আদম সৃষ্টির সময় যে বংশ-তালিকা দেয়া হয়েছে, সে সময়টা হচ্ছে মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব সাইত্রিশ শতাব্দীর। ভবিষ্যতে বিজ্ঞান হয়তো এ বিষয়ে আরো তথ্য আবিষ্কার ও সরবরাহ করতে সক্ষম হবে এবং তার মাধ্যমে আমরা অনায়াসেই মানুষের আবির্ভাবের প্রশ্নে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সময়কালের তুলনায় অনেক সঠিক সময় তথা তারিখ পেয়ে যাব। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, ভবিষ্যতের সেই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হবে আধুনিক বিজ্ঞানের ইস্পাতকঠিন সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত'।

অন্যদিকে, তিনি বলেন,

'এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাইবেলের সুসমাচার-পুস্তকের সূচনাপর্বের পর্যালোচনায় আমাকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথম পৃষ্ঠাতেই রয়েছে যীশুর বংশ-লতিকা কিন্তু এ বিষয়ে মথি-লিখিত সুসমাচারের বক্তব্য স্পষ্টভাবে লুক-রচিত সুসমাচারের বক্তব্যের বিপরীত। শুধু তাই নয়, বাইবেলের এই নতুন নিয়মে অর্থাৎ প্রচলিত ইঞ্জিলের ক্ষেত্রে পরবর্তী সমস্যা দেখা দেয়, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের কাল নিয়ে। এ বিষয়ে লুক-লিখিত সুসমাচারের যে তথ্য, তা আধুনিক তথ্য-জ্ঞানের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ।

অবশ্য, বাইবেলের বক্তব্যের মধ্যে এই যে পারস্পরিক বৈপরীত্য, এই যে অবাস্তবতা ও অসঙ্গতি, তা কিন্তু স্রষ্টার উপর আমার বিশ্বাসকে

কখনো চিড় ধরাতে পারেনি। বরং, আমার মনে হয়েছে বাইবেলের এই অসঙ্গতির জন্য মানুষই দায়ী। প্রকৃতপক্ষে, আর কারোপক্ষেই বলার উপায় নেই, বাইবেলের বাণীর প্রাথমিক বা আদিরূপ কি ছিল! কে জানে, সুদূর অতীতে কে কিভাবে বাইবেল সম্পাদনা করে গেছেন। আর কতোজন যে ইচ্ছাকৃতভাবে এর উপর কলম চালিয়ে গেছেন, কে তা বলতে পারে? এভাবে কতোজন যে নিজ ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় বাইবেলকে তার বর্তমান আকার দিয়ে গেছেন, তার খোঁজ কে দেবে? কিন্তু তাঁরা যাঁরাই হোন, তাঁরা কি কোনোদিন ভেবেছিলেন যে, এমন একদিন আসবে, যেদিন বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যের নিরিখে বাইবেলের ওইসব বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি প্রকট হয়ে ধরা পড়বে?

মূলত, বাইবেলের এই ধরনের রদবদল সাধন করে সেকালে ওইসব ব্যক্তি ভালো কাজ করেছেন বলে যতোই মনে করে থাকুন-না-কেন, বিশেষজ্ঞ ও গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন একদম অনবহিত। অথবা, নিজেদের এসব কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি দৃষ্টি পড়লেও তাঁরা সম্ভবত দক্ষতার সাথে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পার পেতে চেয়েছিলেন। বাইবেলের মথি ও যোহন-লিখিত সুসমাচারের আলোচনায় প্রমাণ তুলে ধরে দেখানোর চেষ্টা করা হবে যে, খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ ও জাঁদরেল ভাষ্যকারেরা পর্যন্ত এসব ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে কিভাবে শব্দের মারপ্যাঁচে আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়াস পেয়ে গেছেন।

পক্ষান্তরে, বাইবেলের কোনো বক্তব্যের অবাস্তবতা কিংবা স্ববিরোধিতা ধামাচাপা দিতে কেউ কেউ অতি বিস্ময়করভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে আরো বেশি 'দুর্বোধ্য' করে তুলেছেন। এভাবে তাঁরা কখনো-সখনো বাইবেলের এসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ধামাচাপা দেয়ার কাজে ব্যর্থও হননি। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের এতোসব মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে এতো বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান কেন যে এরকম অনবহিত কিংবা কেন যে এত নীরব, তার ব্যাখ্যা ও কারণ বোধ করি, পূর্বোক্ত বিষয় বৈ অন্য কিছু নয়।

এ গ্রন্থে প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্মগ্রন্থের মর্ম উপলব্ধির ব্যাপারে বিজ্ঞানের ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়োগ ও অবদানের বিশদ উদাহরণ রয়েছে। সেখানে দেখা যাবে, কোরআনে এমন কিছুসংখ্যক বাণী রয়েছে যেসব বাণীর অর্থ এতকাল ধারণা-শক্তির অতীত না হলেও সর্বসাধারণের কাছে অনেকটা দুর্বোধ্য হয়েই বিরাজ করছিল।

কিন্তু এখন সেইসব দুর্বোধ্য বাণী আধুনিক সেক্যুলার-জ্ঞানের আলোকে ক্রমশ অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় ইসলাম সম্পর্কে যখন বলা হয়, এই ধর্ম সবসময়ই বিজ্ঞানকে তার যমজ বোন হিসেবে বিবেচনা করে থাকে, তখন বিস্ময়ের কি থাকতে পারে? আবির্ভাব-পর্বের সূচনা থেকেই ইসলাম তার অনুসারীদের প্রতি বিজ্ঞানচর্চার নির্দেশ দিয়ে আসছে। এই নির্দেশ পালনের ফলে ইসলামী সভ্যতার সেই মহান যুগে মুসলমানেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল এবং তা থেকে রেনেসাঁর পূর্বপর্যন্ত পাশ্চাত্য জগৎ হয়েছিল বিশেষ লাভবান। এখন ধর্মগ্রন্থ ও বিজ্ঞানের সংঘাত জোরদার হওয়ার কারণে আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধানী-আলোকে নতুন করে কোরআনের বিভিন্ন বক্তব্যর উপরে দৃষ্টি নিপতিত হচ্ছে। আর এ কারণেই গড়ে উঠছে কোরআন ও বিজ্ঞানের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের একটা সমঝোতা।

ইতিপূর্বে কোনো কোনো বিষয়ে সম্যক-জ্ঞানের অভাব থাকায়, কোরআনের বিভিন্ন বক্তব্যকে অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য বলে আখ্যায়িত করা হত। বর্তমানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান কোরআনের ঐসব বক্তব্যের ব্যাখ্যায় প্রভূত সহায়তা জুগিয়ে যাচ্ছে'।

মধ্যযুগীয় কাব্য-কাহিনী বনাম সুসমাচার কাহিনী

প্রকৃতপক্ষে, মধ্যযুগীয় সাহিত্যের বিভিন্ন গাথা বা কাব্য-কাহিনী যেভাবে গড়ে উঠেছিল, সুসমাচার-রচনার কাহিনী অনায়াসেই সেসবের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এরমধ্যে সর্বাধিকভাবে তুলনীয় হতে পারে 'সঙ্ অভ রোল্যান্ড' নামক সর্বজনপরিচিত কাহিনী-কাব্যটি। এই কাহিনী-কাব্যে একটি সত্য ঘটনাকে রূপকথার মত সাজিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ঘটনাটি ছিল এইরূপ :

> শার্লিমেনের সেনাবাহিনীর একটি অংশের দলপতি ছিলেন রোল্যান্ড। তিনি যখন তাঁর বাহিনীকে নিয়ে ফিরে আসছিলেন, তখন রনসভকস-এর নিকট তাদের উপর হামলা চলে। ইতিহাসে দেখা যায়, ঘটনাটি ঘটেছিল ৭৭৮ সালের ১৫ই আগস্ট। (এগিনহার্ড) মূলতঃ এ ঘটনাটি সাংঘাতিক এক যুদ্ধের কাহিনী হিসেবে প্রচার লাভ করে। শুধু তাই নয়, শেষপর্যন্ত এই যুদ্ধের ঘটনাটি ধর্মযুদ্ধের কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। উল্লেখ্য যে, শার্লিমেনকে তাঁর সীমান্তরক্ষার জন্য প্রায়ই প্রতিবেশি শক্তির অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হতে হত। অথচ, রূপকথার রচয়িতাবৃন্দ এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে তাঁদের কল্পনাশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে ছেড়েছেন।

অন্যদিকে, গাথা বা মহাকাব্যের মত যত রঙই ছড়ানো হোক, বর্ণিত কাহিনীর মধ্যেও একটি সত্য ঘটনা যে লুকানো রয়েছে, তা স্বীকার করতে হয়।

অনুরূপভাবে, মথি তাঁর সুসমাচারে যতই আদি-ভৌতিক কাহিনীর অবতারণা করুন, সুসমাচারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বৈপরিত্য যতই মারাত্মক হয়ে ধরা পড়ুক, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের তুলনায় সেসব রচনার বর্ণনা যতই অবাস্তব ও অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হোক এবং পরবর্তী পর্যায়ে এসব কাহিনীকে যতই ঝুটলানো হয়ে থাক-না-কেন ওইসব সুসমাচারের রচনার মধ্যেও সেই একই ধরনের সত্য ঘটনা লুকানো রয়েছে।

বলা অনাবশ্যক, সুসমাচার রচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের সত্য ঘটনাকে ভিত্তি ধরে নিয়েই তার সাথে মেশানো হয়েছে মানবীয় কল্পনার নানারূপ, নানারঙ,

নানাবর্ণ, নানাগন্ধ ইত্যাদি। কল্পনার এতসব রূপ ও রঙ সত্ত্বেও কিন্তু যীশুখ্রিস্টের মিশন তথা তাঁর কার্যকলাপ ও বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে, প্রচলিত বাইবেল তথা ইঞ্জিলে যীশুর সেই মিশনকে যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে, শুধু সেই বর্ণনার ক্ষেত্রেই দেখা দেয় যত সন্দেহ ও সংশয়।

এখানে এই গ্রন্থকার সেই সংশয় ও সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার মতো কিছু কারণ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস ইতোমধ্যে চালিয়েছেন। অনেকেই সম্ভবত মত প্রকাশ করবেন, ড. মরিস বুকাইলি রচিত 'বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান' রচিত গ্রন্থে যেহেতু এ-সকল বক্তব্য তথা মন্তব্য তিনি তুলে ধরেননি, এখানে কেন তা আসবে? এই গ্রন্থকার বিনয়ের সাথে সে-সকল পাঠকদের উদ্দেশে বলছেন ঃ

> 'আমি মূলত ড. মরিস বুকাইলি রচিত 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' গ্রন্থকে অবলম্বন করে পরোক্ষ এবং কখনো কখনো প্রত্যক্ষভাবে তাঁর গ্রন্থটিকে পাঠকদের নিকট বর্ণনা করতে চাচ্ছি, আর তাই তাঁর অর্থাৎ ড. মরিস বুকাইলি রচিত গ্রন্থে উল্লিখিত মন্তব্য, বক্তব্য ও উক্তিকে আরও দৃষ্টান্ত-সমৃদ্ধকরণে প্রয়াসী এবং এ কারণেই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে *প্রসঙ্গ ঃ 'ড. মরিস বুকাইলির বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান'* শুধু 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' নয়। তবে, আমি সম্মানিত সে-সকল বোদ্ধা পাঠকগণকে এই বলে আশ্বস্ত করছি, ড. মরিস বুকাইলি রচিত 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান অবলম্বিত আমার এই গ্রন্থে তাঁর অর্থাৎ ড. মরিস বুকাইলি রচিত 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' গ্রন্থে পরিবেশিত সকল তথ্য ভিন্নরূপ উপস্থাপনায় পরিবেশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয়কে ভিন্নআঙ্গিকে উপস্থাপন করে সহজে পাঠকমনে বোধগম্য করার প্রয়াস রয়েছে, যেমনি কিছুটা বেশি তথ্য পরিবেশনের দায় গ্রহণ করা হয়েছে।
>
> মূলত, এ বইটি গ্রন্থিত হয়ে প্রকাশিত হলো ড. মরিস বুকাইলি রচিত 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' গ্রন্থটি প্রকাশ হয়েছে বলেই, কিন্তু তথ্য-জ্ঞানের এই প্রতিযোগিতার যুগে অবিরত নতুন নতুন তথ্য আমাদের হাতে আসছে, আর তাই এই গ্রন্থে কিছুটা প্রাসঙ্গিকতার কারণে বেশি তথ্য পরিবেশিত হয়েছে এবং মূল বইয়ের বক্তব্যকে পরোক্ষভাবে অবিকৃত রেখে, যে-কারণে ঔদ্ধাত্যপনা হয়ে গেলেও এই গ্রন্থকার বোদ্ধাপাঠকদের উদ্দেশে বলতে বাধ্য হচ্ছেন এই গ্রন্থে মূলগ্রন্থের চেয়ে বেশি তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ায় অন্যান্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ

থেকেও তথ্য নেয়া হয়েছে। এই গ্রন্থপাঠে পাঠকবর্গ উপকৃত হবেন বৈ অপকৃত হবেন না, এখন পাঠকদের বক্তব্য-সমালোচনা শোনা ও জানার দায় নিয়ে ক্ষমাসুন্দরদৃষ্টি কামনা করে এবং এই গ্রন্থ প্রকাশে যে-সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থ থেকে তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে সম্মানিত সে-সকল গ্রন্থকার, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি ঃ

সুসমাচার লেখক 'লূক'-এর বিভ্রান্তি

সুসমাচার লেখক লূক তাঁর সুসমাচারে যীশুখ্রিস্টের জন্মকাল সম্পর্কে লিখেছেন,

"তখনকার আগস্ত কৈসর (Augustus Caesar)-এর এক রাজাজ্ঞা বের হলো যে, সাম্রাজ্যের সমুদয় লোককে নাম লেখাতে হবে। সুরিয়ার (Syria) দেশাধ্যক্ষ (Governor) কুরীণীয়ের সময় এই প্রথম নাম লেখানো হয়। সবাই নাম লিখে দেয়ার জন্য নিজ নিজ নগরে গিয়েছিল। আর যোসেফও গালীলের নাসরত নগর থেকে যিহূদিয়ার বেথেলহেম আখ্যাত দায়ুদের নগরে গেলেন, কারণ, তিনি দায়ুদের কূর ও বংশজাত ছিলেন; তিনি তাঁর বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়মের সাথে নাম লিখে দিতে গেলেন। মরিয়ম তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; তারা যখন সেখানে ছিলেন, তখন তাঁর সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হলো, আর তিনি তাঁর প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করলেন ..." (২ঃ১-৭)।

অর্থাৎ, লুকের এই বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, সিরিয়ার গভর্নর কুরীণীয়ের সময় রোম সাম্রাজ্যে প্রথম লোক গণনা করা হয় এবং এই লোক গণনায় নাম লিখে দিতে আসন্ন সন্তানপ্রসবা মরিয়ম তাঁর বাগদত্তা স্বামী যোসেফের সাথে গালীলের নাসরত নগর থেকে ৭০ মাইল দূরবর্তী বেথেলহেম নগরে গিয়েছিলেন এবং তখনই তিনি তাঁর প্রথমজাত সন্তান যীশুকে প্রসব করেন। কিন্তু লুক বর্ণিত এই ঘটনা ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত নয়। কারণ, যীশুর জন্মকালে রোম সাম্রাজ্যে লোক গণনার এবং সিরিয়া দেশে কুরীণীয় নামে দেশাধ্যক্ষ থাকার প্রমাণ খ্রিস্টান পণ্ডিতদের কাছে নেই। বরং, ইহুদী ইতিহাসবিদদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ফ্লেবিয়াস যোসেফাসের লেখা অনুযায়ী যীশুর জন্মের সাতবছর পরে রোম সাম্রাজ্যে প্রথম লোক গণনা করা হয় এবং যীশুর জন্মের দশবছর আগে থেকে হেরোদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত সিরিয়ায় যথাক্রমে স্টিপলাস ওয়ারদাছ (Stiplus Wardus), সেনটিরিস (Sentiris) এবং তীথনিস (Titnis) দেশাধ্যক্ষ ছিলেন বলে Ency. Britanica, Under "Chronicle"-এ নিশ্চিত করা হয়েছে।

সুতরাং, লুক বর্ণিত আলোচ্য তথ্যটি অবিশ্বাস্য হলেও প্রশ্ন জাগে : এমন ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণাদির প্রতিকূলে লুক কি উদ্দেশ্যে লোকসংখ্যা গণনার মত একটি ইতিহাস যীশুর জন্মকালে হয়েছিল বলে আবিষ্কার করলেন? এই আবিষ্কারের পিছনে বাধ্যবাধকতামূলক কোনো নেপথ্যকারণ (background) নিশ্চয় তাঁর ছিল। মনে হয়, যোসেফ মরিয়মকে নিয়ে তাঁর গর্ভাবস্থাকালীন সময় শারীরিক দুর্বলতার চরমসীমায় বেথেলহেমের মত সুদূরবর্তী স্থানে এক দুঃসাধ্য ভ্রমণের ঝুঁকি কেন গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়েই লুক এহেন নৈরাশ্যজনক অনুসন্ধান চালান এবং পরিণামে লোকসংখ্যা গণনার প্রকৃত ঘটনার বিষয়ে হোঁচট খান, যা তাঁর আরোপিত তারিখের সাত বছর পরে সংগঠিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, জনসংখ্যা গণনা ও যীশুর জন্ম একইসময় ঘটেছিল এমন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি ইচ্ছে করেই জনসংখ্যা গণনার তারিখ সাত বছর এগিয়ে দেন, যা প্রকৃত ঘটনার প্রায় সত্তর-আশি বছর পর ইতিহাস লিখতে গিয়ে সম্ভবত তিনি মনে করেন যে, দীর্ঘকাল পরে এ ধরনের ঐতিহাসিক ভ্রমণকাল নিরূপণের বিষয়টি কেউ আর বুঝবে না। এভাবে সাতবছর পরে সংঘটিত জনসংখ্যা গণনাকে যীশুর জন্মবর্ষে আরোপ করে লুক নিজে নিজে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন যে, যোসেফ কেন তার রুগ্ন স্ত্রীকে পূর্ণ গর্ভাবস্থায় ৭০ মাইল দূরবর্তী বেথেলহেম ভ্রমণের কষ্ট দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এভাবে লুক নিজের কাছে ব্যাখ্যাদানে কৃতকার্য হয়েছেন।

কিন্তু তবুও একটি দুর্বোধ্য ব্যাপার থেকে যায়, যীশুর জন্মকালে যদি লোকসংখ্যা গণনার মতো প্রচলিত ইতিহাস থেকেই থাকে তবে লুক কেন বেথেলহেম ভ্রমণের মতো ইতিহাস আবিষ্কারে এত সচেষ্ট হলেন? কেনই-বা তিনি যোসেফকে নিয়ে মরিয়মের ওই কষ্টকর ভ্রমণে বাধ্য করালেন? মূলতঃ লুকের এই আবিষ্কার তার নিজের জন্যই অন্তরায় ছিল। কারণ, মরিয়মের পবিত্র আত্মায় গর্ভধারণের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন যে, বড় বড় আশ্চর্যজনক অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ শুরু হয় এবং যীশুর জন্মপর্যন্ত এসব ঘটনা ঘটতে থাকে। তিনি আশংকা করেন যে, যোসেফ ও মরিয়মের এই ভ্রমণের উপযুক্ত কারণ যদি প্রমাণ করা না হয়, তাহলে জনসাধারণের কাছে তারা ন্যায়সঙ্গতভাবেই দুর্বল বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত হবেন এবং জনসাধারণ স্বভাবতঃই বলবে যে, উক্ত গর্ভধারণের সময় এত অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরও যোসেফ লোকজনের সমালোচনা ও কুৎসা রচনার ব্যাপারে তখনও ভীত ছিলেন এবং উক্ত গর্ভধারণের ঘটনা ও পরবর্তী জন্মবৃত্তান্ত গোপন করার উদ্দেশ্যেই তারা নাসরত নগর ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু রূঢ় বাস্তব বিষয় ছিল, তারা অতি দূরবর্তী স্থানে বেথেলহেমের ভ্রমণ পরিগ্রহণ করেছিলেন বাস্তব ন্যায়সঙ্গত কারণে। লুক

সম্ভবতঃ ভেবেছিলেন যে, জনসাধারণ বলতে পারে যে, উক্ত গর্ভধারণের অব্যাবহিত পরেই অলৌকিক কার্যকলাপ ও স্বর্গীয় চিহ্নাদি যদি সত্যিই সংঘটিত হয়ে থাকে তবে মরিয়মের গর্ভধারণ ও পরবর্তীতে যীশুর জন্মবৃত্তান্ত গোপন করার জন্য যোসেফ মরিয়মকে তাঁর কায়িক দুর্বলাবস্থায় এই কঠিন ও ক্লান্তিময় ভ্রমণে বাধ্য করেছিলেন?

এ সকল কারণই যীশুর গর্ভে থাকাবস্থায় বড় বড় অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ আবিষ্কারের বিষয়টিই লুককে লোকসংখ্যা গণনা ও লোকসংখ্যা গণনাকালীন সময়ে মরিয়মকে বেথেলহেম যাওয়ার গল্প তৈরি করতে বাধ্য করে।

যদিও যীশুর জন্মসময়ে লোকসংখ্যা গণনা করা হয়েছিল এহেন তথ্য আবিষ্কার করা লুকের অপ্রয়োজন ছিল, সহজেই তিনি ব্যাখ্যা দিতে পারতেন, মরিয়ম মন্দিরে থাকাকালীন যোসেফের সাথে বিয়ে হয়, যেহেতু যোসেফ নিজেও মরিয়মের সতীত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং এ মর্মে তিনি পূর্বেই এক স্বপ্ন দেখেছিলেন (মথি, ১ : ২০-২১) কিন্তু তিনি যেহেতু আশংকা করছিলেন, তাই তিনি অন্য লোকদেরকে এ ঘটনা বিশ্বাস করাতে সমর্থ হবেন না এবং লোকজনের তরফ থেকে কুৎসা রটনার ভীতিও পোষণ করতেন, তাই তিনি মরিয়মের গর্ভধারণের পূর্ণত্বপ্রাপ্তি লোক-সমাজে প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই তাঁকে সুদূরবর্তী স্থানে নিয়ে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু লুক তা করেননি। কারণ, সেক্ষেত্রে মরিয়মের গর্ভধারণের সময় বড় বড় অলৌকিক ক্রিয়া-সংঘটনের সকল গল্প চুরমার হয়ে যেতো। এভাবেই সমস্ত জটিলতার উদ্ভব হয়েছে এবং একটি আবিষ্কার আরেকটি আবিষ্কারকে সৃষ্টি করেছে।

যীশুর জন্মসন নিয়ে মতভেদ ঃ

যীশুর জীবনী লেখক পৃথিবীখ্যাত রেঁনা বলেছেন, অগাস্টাস সিজারের রাজত্বকালে ৭৫০ রোমান অব্দে এবং খুব সম্ভবতঃ বর্তমান সভ্যজগতের সাল গণনার প্রথমবর্ষের কয়েক বছর আগে যীশু জন্মগ্রহণ করেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রোম সম্রাট অকটোভিয়াস (সরকারি নাম অগাস্টস সিজার)-এর সময় সাঁইত্রিশ বছরকাল রাজত্ব করে ইহুদীদের রাজা হেরোদ সত্তর বছর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার মৃত্যুর আগের বছর অথবা সেই বছরই উত্তর প্যালেস্টাইনের গালিলী প্রদেশের নাজারেথ শহরে যীশুর জন্ম হয়। তাঁর জন্মের চার কি পাঁচ বছর পর থেকে তাঁর জন্মানোকেই উপলক্ষ্য করে প্রচলিত খ্রিস্টাব্দের গণনা আরম্ভ হয়েছে। আর সাধু লুকের বিবৃতি থেকে জানা যায়, বছর মাথাপিছু পোল ট্যাক্স বা জিজিয়া কর আদায়ের অভিপ্রায়ে লোকসংখ্যা গণনা করা হয় সেই বছরই যীশু জন্মগ্রহণ করেন। এই লোকসংখ্যা গণনার কাজ শুরু হয় ছয় খ্রিস্টাব্দে আর শেষ হয় সাত খ্রিস্টাব্দে। এই হিসেবে তখন যীশুর বয়স

দশ কি এগারো বছর দাঁড়ায়। সুসমাচার রচয়িতা মথি ওই ঘটনাকেই দশ বছর এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। গোলমাল হয় দেখে, অনেকে আবার যীশুর জন্মসালকে দশবছর পিছিয়েও দেন। কিন্তু তাহলে সুসমাচারে বর্ণিত কালক্রমের প্রায় সবটাই ওলোট-পালোট হয়ে যায়।

যাহোক, প্রচলিত রয়েছে, যীশুর জন্ম হয়েছিল 'আগস্ট-সেপ্টেম্বর'-এর কোন একসময়। সেক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের ভ্রান্তির পরিমাণ সম্ভবতঃ তিন-চার মাসের। কিন্তু দিন-মাস নিয়ে মতান্তর নয়, প্রচলিত বিশ্বাসের সাথে গবেষকদের গুরুতর মতপার্থক্য রয়েছে সংশ্লিষ্ট বছর সম্পর্কে। পণ্ডিতদের মতে, যীশুর জন্ম চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে একাদশ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কোন একসময়ে। পণ্ডিতরা এর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে একটি তারার কথা এবং তিনজন পূর্বদেশীয় পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করেছেন। এই পণ্ডিত তিনজন 'মর্মজ্ঞ মহাত্মা' (Magi), সম্ভবতঃ ইহুদী। লক্ষণ গণনা করে তাঁরা নবজাতক যীশুর দর্শন পান তারকা চিহ্নিত পথ ধরে এসে। যে তারকাটি লক্ষ্য করে তাঁরা পথ চলছিলেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণে বেথেলহেমে এসে তা একটি পান্থশালায় থামে। তখন যে উজ্জ্বল তারাটির কথা বলা হয়েছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে তাকে হ্যালির ধূমকেতু বা ওইরকম কোন ধুমকেতুকেই বলা হয়েছে।

মথি লিখিত সুসমাচারের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, যীশুর জন্মের পরে পূর্বদেশ থেকে একদল দৈবজ্ঞ গুণী জেরুজালেমে এসে দেখা দিলেন। তারা সেখানে এসে খোঁজ করতে লাগলেন, ইহুদীদের যিনি রাজা হবেন তিনি কোথায় জন্মেছেন? পূর্বাকাশে তাঁরা তাঁর জন্ম-তারা উঠতে দেখেছেন, তাই তাঁরা তাঁকে অর্ঘ্য নিবেদন করতে এসেছেন। কথাটা পরম্পরাগতভাবে যখন জুডিয়ার রাজা হেরোদের কানে উঠল তখন তিনি বেশ খানিকটা ভীতসন্ত্রস্ত হলেন এবং তিনি সকল প্রধান পুরোহিত ও ধর্মগুরুদের সম্মিলিত করে জিজ্ঞেস করলেন, প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্তা (খ্রিস্ট) কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন?

তাঁরা পুঁথিপত্র ঘেঁটে জানালেন, শাস্ত্রে আছে তিনি জুডিয়ার বেথেলহেমে জন্মাবেন (২ : ৩-৫)। তখন রাজা হেরোদ পূর্বদেশ থেকে আগত সেই দৈবজ্ঞ-গুণীদের নিজের কাছে ডেকে এনে গোপনে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিলেন, সর্বপ্রথম কবে তারা পূর্বাকাশে সেই তারা উঠতে দেখেছেন। তারপর তাদের বেথেলহেম শহরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'আপনারা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখুন। খোঁজ পেলেই আমায় এসে জানাবেন। তাহলে আমিও সেখানে গিয়ে তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে আসবো'।

রাজার আদেশ শুনে গ্রহাচার্যেরা বেথেলহেমের দিকে পা বাড়ালেন। আশ্চর্য, যে তারাটি তাঁরা পূর্বাকাশে দেখেন, সেই তারাই এখন তাদের যেন পথ দেখিয়ে

নিয়ে চলল। অবশেষে, যীশু যে জায়গায় জন্মেছিলেন সেই জায়গার ঠিক মাথার উপর তা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দৈব মর্মজ্ঞরা বুঝলেন, তারা ঠিক জায়গায় পৌঁছেছেন। খুশি হয়ে তারা ঘরের ভেতর ঢুকতেই নবজাতক শিশুকে তার মায়ের কোলে দেখতে পেলেন, পিতা যোসেফ কাছেই দাঁড়িয়ে। তাদের সবাইকে প্রণিপাত করে তাঁরা গাটরি-প্যাঁটরা খুলে নানারকমের দামী দামী উপহার সামগ্রী বের করে শিশু-যীশুকে নিবেদন করলেন।

তারপর সেইরাতেই তাঁরা স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেলেন, 'তাঁরা যেন আর হেরোদের কাছে ফিরে না যান'। আদেশ শুনে তারা আর দেরি না করে অন্য পথ ধরে স্বদেশে ফিরে গেলেন। ওদিকে রাজা হেরোদ যখন বুঝতে পারলেন দৈবজ্ঞরা তাকে ফাঁকি দিয়ে গেছে, তখন রাগে তিনি একেবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই পণ্ডিতদের নিকট বিশেষ করে যে সময় জেনে নিয়েছিলেন সে অনুসারে দু'বছর ও তৎকম বয়সের যত বালক বেথেলহেম ও তৎসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠিয়ে সেসব শিশু বালকদের নির্বিচারে হত্যা করল (২ : ১৬)।

ফলে, অনেক নিঃষ্পাপ শিশুর মৃত্যু হল। কিন্তু জল্লাদদের হত্যাকাণ্ড শুরুর পূর্বেই মরিয়মের বাগদত্ত স্বামী যোসেফ স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পান, কালবিলম্ব না করে সে যেন শিশুটিকে আর তার মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যান এবং যতদিন না তাদেরকে ফিরতে বলা হয়, ততদিন যেন সেখানেই থাকেন। এভাবে, শিশু যীশু যোসেফ কর্তৃক তাঁর মাকে নিয়ে মিসরে পালিয়ে যাওয়ায় ওই নির্বিচার হত্যার হাত থেকে রক্ষা পান।

কিন্তু, ইতিহাসের বিবরণ মানতে গেলে, পৃথিবীর সর্বত্রই ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে এমন অনেক কথা কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, যা মূলত ইতিহাস নয়। রাজা হেরোদের নির্বিচারে শিশু হত্যার বিষয়টিও একই। কারণ, রাজা হেরোদের অনেকরকম হত্যাকাণ্ডের কথা, তার বহু অপকীর্তির কাহিনী ঐতিহাসিকরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, কিন্তু ওরকম একটি বিনাবাছবিচারে পাইকারী হারে নিষ্পাপ শিশুহত্যার কথা কোন বইয়ের পাতায় কিংবা কোন দলিল-দস্তাবেজে কখনো দেখা যায় না। তবে, হেরোদ যে চরিত্রের লোক ছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে ওরকম একটি হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করানো কেমন কোনো আশ্চর্যের ব্যাপার নয় বলেই বোধহয় মথির কাহিনীতে জুড়ে দেয়া হয়েছে। তবে, জুডিয়ার সিংহাসনে বসার আগের সবকথা বাদ দিলেও, ঐতিহাসিক উক্তি অনুসারে ইহুদীদের রাজা হয়ে বসার পর হেরোদের এমন একটি দিন যায়নি, যেদিন কেউ-না-কেউ তাঁর হাতে খুন না হয়েছেন। তাঁর ওই আসুরিক কাণ্ড থেকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউই বাদ যায়নি। এক

শ্যালক, দুই ভগ্নিপতি, এক স্ত্রী, সেই স্ত্রীর গর্ভজাত দুই পুত্র, এক শ্বাশুড়ি, দুই দাদা শ্বশুড় সবাই তাঁর হাতে একে একে নিহত হন। এমনকি মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন আগেও তার দশ রানীর এক রানীকে ও আরেক রানীর গর্ভজাত পুত্রকে তিনি হত্যা করার আদেশ দেন।

ঐতিহাসিকেরা তেমন মিথ্যা টিপ্পনি কাটেননি যে হেরোদকে দেখে মনে হত, যেন কোন হিংস্র পশু বন থেকে বেরিয়ে এসে জুডিয়ার সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছে।

যাহোক, ঐতিহাসিকগণ পেয়েছেন, শিশু-হন্তা হেরোদ যে বছর মারা যান সেইবছর ইহুদীদের নিস্তার-পর্ব (passover) নামের বিশেষ উৎসবের অব্যবহিত পরেই একটি চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ইহুদী ক্যালেণ্ডার সম্পর্কিত জ্ঞান এবং গ্রহণ সংক্রান্ত সূত্র প্রয়োগ করে জানান, তা ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব চার অব্দে। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা (১৯৮৬) সংস্করণ, পঞ্চদশ খণ্ড) বলে, Jesus was born a few years before the end of his (Herod) reign, অন্যত্র, where Jesus birth and early lot are set in the time of Herod I and the change of regime (4 BC). সুতরাং, বিষয়টি নানাদিক থেকে বিচারবিশ্লেষণ করে গবেষকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, যীশুর জন্ম হয় খ্রিস্টপূর্ব ছয় অব্দে— তার আগেও হয়তোবা হতে পারে।

ড. এস. পিক *জে, স্টুয়ার্ট হোয়েন 'ডিড আওয়ার লর্ড অ্যাকচোয়্যালি লিভ'?* গ্রন্থে বলেন, পুস্তকে এঙ্গোরা মন্দিরগাত্রে রক্ষিত শিলালিপি এবং প্রাচীন চীনা ক্লাসিকে উদ্ধৃত সুদূর চীনে ২৫-২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত সুসমাচারে বর্ণিত কাহিনীর বর্ণনা থেকে যুক্তির মাধ্যমে যীশুর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব আট অব্দে সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর বলে নির্ধারণ করেছেন।

লূক লিখিত সুসমাচার থেকে জানা যায়, তাইবেরিয়াস সিজারের শাসনকালের পঞ্চদশ বছরে যখন পান্তিয়াস পীলাত ইহুদীদের দেশাধ্যক্ষ, হেরোদ গালীলের রাজা, তার ভ্রাতা ফিলিপ যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের রাজা এবং লূষাণিয়া অবলিনী (Abilane)-এর রাজা তখন হানন (Annas) ও কায়াফা (Caiaphas)-এর মহাযাজকত্বকালে সখরিয়ের পুত্র যোহন (হযরত জাকারিয়ার পুত্র হযরত ইয়াহ্ইয়া) প্রথম ঐশীবাণী (নবুয়ত) লাভ করেন (৩ : ১-২)। উদ্ধৃত তিবিরিয়া কৈসরের শাসনকালের পঞ্চদশ বছরকে ব্রিটানিকা বিশ্বকোষ ২৮/২৯ খ্রিস্টাব্দ বলে উল্লেখ করেছে। সর্ববাদীসম্মত মত এই যে,

যীশু ও যোহন সমবয়সী (ছয় মাসের ছোট-বড়) ছিলেন (লূক, ১ ঃ ২৪-২৬) এবং যোহনের অব্যবহিত পরেই যীশু নবুয়ত লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কাউকেই চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুয়ত প্রদান করেননি এবং পবিত্র কোরআনেও নবুয়ত লাভের বয়স ৪০ বছর বলে উল্লিখিত হয়েছে **(সূরা আরাফ, সূরা আল্ আহ্কাফ)**। এই মতানুসারে যীশুর জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব (৪০-২৮ =)১১/১২ অব্দে। আর এ বিষয়টি মথি বর্ণিত একটি আকাশীয় লক্ষণ থেকেও জানা যায়।

মথি লিখিত সুসমাচারে বর্ণিত রয়েছে, যীশুর জন্ম হওয়ার পরে পূর্বদেশ (খুব সম্ভবতঃ ভারত) থেকে ক'জন জ্ঞানী পণ্ডিত জেরুজালেমে এসে বলেন, ইহুদীদের যে রাজা জন্মেছেন তিনি কোথায়? কারণ, তাঁর জন্মের লক্ষণস্বরূপ যে তারাটি উদিত হওয়ার কথা, তারাটি তারা পূর্বদেশে দেখেছেন এবং তাঁকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন (২ : ১-২)— এখানে সকল গবেষক-পণ্ডিতই প্রশ্ন তুলেছেন ঃ যীশুর জন্মকালে পূর্বদেশের ক'জন (স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, মনে হয় তিনজন) জ্ঞানী পণ্ডিত আকাশে কি দেখেছিলেন, যা লোকমুখে আজও Star of Bethlehem বা বেথেলহেমের তারা বলে অভিহিত হয়ে আসছে?— এ সম্বন্ধে Merit Students Encyclopeadia (Vol, 4, P-469) বলে :

> 'জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বাইবেলে (মথি, ২ঃ২,৯) উল্লিখিত তারাটি নির্ণয়ের চেষ্টা করেন, যার অনুসরণ করে জ্ঞানী ব্যক্তিরা বেথেলহেমে এসেছিলেন। সম্ভাব্য তারাটি প্রথমত, এগারো খ্রিস্টপূর্বাব্দে বেথেলহেমের উপরে হ্যালীর ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ খ্রিস্টপূর্ব সাত বা আট অব্দে বৃহস্পতি, শনি ও মঙ্গলের কক্ষপথগুলো এমনভাবে একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছিল যে পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হতো, ওইসব গ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত আলো এক বিন্দু থেকেই আসছে। সবশেষে, বেথেলহেমের তারাটি হয়তো বা একটি নোভা অর্থাৎ, এমন একটি তারা, যা হঠাৎ করেই অধিক উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে এবং কিছুসময় পরেই আবার আঁধারে মিলিয়ে যায়। যাহোক, খ্রিস্টের জন্ম-তারিখ যখন নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি, তখন এসব সূত্রের কোনটিকেই সত্য বলে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।"

তবে, পণ্ডিতদের অধিকাংশই উল্লিখিত তারাটিকে ধূমকেতু বলে বিশ্বাস করেন। আবার কেউ কেউ তা অশুভ ঘটনার প্রতীক বলে নাকচ করে দিয়েছেন। কিন্তু, বিষয়টি একেবারে অসম্ভব নয়। কারণ, পরবর্তীকালে ধূমকেতু অমঙ্গলের

প্রতীকে পরিণত হলেও প্রাচীনকালে ধূমকেতু সর্বক্ষেত্রে অবিমিশ্র মন্দ বলে বিবেচিত ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতীয় জ্যোতির্বিদ বরাহ মিহির-এর কথা বলা যায়, তিনি তাঁর গ্রন্থ 'বৃহৎ সংহিতা'য় প্রধানতঃ পূর্বসূরীদের মতামতের সারকথা একত্রে পরিবেশন করে রায় দেন— আকার, আকৃতি, স্থায়ীত্ব ইত্যাদির তারতম্য অনুযায়ী ধূমকেতু শুভ বা অশুভ— দু'য়েরই ইঙ্গিত বহন করতে পারে। শুধু তাই নয়, দুর্নামের পাশাপাশি কিছু সুনামও যে ধূমকেতুরা বেশ প্রাচীনকাল থেকেই অর্জন করে তাও তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন।

আর এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, বাইবেলোক্ত প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিরা যান পূর্বদেশ থেকে এবং খুব সম্ভবতঃ তারা ধর্মবেত্তা পণ্ডিত ও জ্যোতিষী ছিলেন বলেই তারা আকাশে পরিলক্ষিত ঘটনার পার্থিব অর্থ করেছিলেন।

শুধু পূর্বদেশেই নয়, প্রতীচ্যেও ধূমকেতুকে মঙ্গলজনক ঘটনার সাথে যুক্ত করার অন্ততঃ একটি পুরোনো নজির রয়েছে, তাও খ্রিস্টের জন্ম প্রসঙ্গেই।

১৩০১ সালে হ্যালীর ধূমকেতু পৃথিবীর আকাশে দেখা দিয়েছিল এক মনোহররূপে এবং সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কিছুদিন পরেই ইতালীর সুধীশিল্পী জিয়োত্তো (Giotto) পাদুয়া (Padua) ভজনালয়ের জন্য একটি চিত্র অংকন করেন 'অ্যাডোরেশন অব মেইজ মেজাই' নামে।

প্রসিদ্ধ ওই চিত্রে তিনি জ্ঞানীব্যক্তিদের মাতার উপরে আকাশে একটি ধূমকেতুকেই স্থাপন করেছিলেন।

উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টপূর্ব বারো অব্দের, ছাব্বিশে অক্টোবর পর্যন্ত আকাশে হ্যালির ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল।

এভাবে, সম্প্রতি খ্রিস্টধর্মের গোড়ার ইতিহাস গবেষণায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রচলিত খ্রিস্টাব্দের গণনা ভুল এবং যীশু ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেননি, জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রচলিত খ্রিস্টীয় সনের এগারো বছর পূর্বে যখন বেথেলহেমের আকাশে হ্যালীর ধূমকেতু দেখা দিয়েছিল এবং সেখানকার খেজুর গাছে টাটকা-পাকা খেজুর ছিল, আর তখন মেষপালকরা রাত্রে তাদের মেষপালগুলো মাঠে চরাতে পারত।

ডিসেম্বর নিয়ে ভাবনা : এটি ক্রীষ্টমাস না কৃষ্ণমাস

খ্রিস্টান জাতি প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসকে ক্রীষ্টমাস হিসেবে যীশুখ্রিস্টের জন্মতিথি হিসেবে পালন করে আসছে। কিন্তু এই মাসটি দু'হাজার বছর বা তারও বেশিসময় ধরে জড়িয়ে আছে আরেকটি নামের সঙ্গে। খ্রিস্টানদের পূর্বে,

আরও বহু জাতি এই মাসে তাদের আনন্দোৎসব পালন করতো। রোমকরা পালন করতো 'Saturnalia' আনন্দোৎসব। টিউটনরা (Teuton) পালন করতো 'ইয়ূল' উৎসব (Yule Festival)। আর ইহুদীদের বিখ্যাত 'হানুখাহ্' (Hanukhah) বা Festivial of lights উৎসবটিও অনুষ্ঠিত হয় তাদের কিসলেভ (Kislev) মাসের ২৫ তারিখে, যা সাধারণতঃ ডিসেম্বর মাসেই পড়ে। আর এই উপমহাদেশে ভারতের হিন্দুরা খ্রিস্টজন্মের বহুবছর পূর্ব থেকেই পালন করে আসছে 'গীতা-জয়ন্তী' উৎসব এবং এই মাসকে তারা অভিহিত করে আসছে কৃষ্ণমাস নামে। কারণ, এই মাসে নাকি মহাভারতের যুগের হিন্দু অবতার কৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে গীতা উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই হিন্দুরা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বলে এই মাসকে 'কৃষ্ণমাস' নামে অভিহিত করে আসছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, খ্রিস্টানদের 'ক্রিষ্টমাস' এবং হিন্দুদের 'কৃষ্ণমাস' উৎসব নিয়ে আধুনিক বক্তব্য বেশ কৌতুহলোদ্দীপক।

পণ্ডিতগণ বলেন, কৃষ্ণমাস নামটি থেকেই মূলতঃ ক্রিষ্টমাস নামটি এসেছে। কারণ, কৃষ্ণের গীতা উপদেশের বহুপরে এমনকি রোম সভ্যতারও পতনের বহু পরে, মাত্র চতুর্থ শতাব্দীতে এসে ২৫শে ডিসেম্বর যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাই আমাদের বক্তব্য ক্রিষ্টমাস এবং ডিসেম্বর মাসের পার্থক্য নিয়ে।

গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জীর দ্বাদশ মাস বা শেষ মাস হলো ডিসেম্বর। প্রাচীন রোমক পঞ্জিকার দশম মাস। 'ডিসেম্বর' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে। 'Decem' শব্দের অর্থ হলো দশ। আবার 'দশম' শব্দটির ল্যাটিন রূপ হলো 'Decem'। 'দশম-অম্বর' বা 'দশ-অম্বর' হলো অম্বর বা আকাশের দশম অংশ। আকাশকে মোট বারোটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি ভাগকে একটি নির্দিষ্ট রাশির জন্য পৃথক করেন প্রাচীন ভারতীয়রা, যারা এই বারোটি রাশিচক্র অনুসারে বারো মাসের ভাগ ঠিক করেন। তাদের বছর আরম্ভ হতো মার্চ মাসের সময় থেকে। সে অনুসারে এই মাস দশম মাস। সূর্য তখন এই মাসে দশম রাশিচক্র অতিক্রম করতো। ভারতীয়দের এই অতিপ্রাচীন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মাস বিভাগ পরবর্তীকালে প্রাচীন রোমকরা গ্রহণ করে। প্রথমে গ্রীকরা নিয়েছিল এই বিভাজন। তারপর নেয় রোমকরা। ফলে, এই মাস গ্রীক বা রোমকদের বছরের দশম মাস হিসেবেই নির্দিষ্ট ছিল। তাই মাসের নাম 'Decem-mber' বা 'December', যা সংস্কৃত 'দশম-অম্বর' বা 'দশ-অম্বর'-এর ল্যাটিন এবং পরবর্তীকালে শুধু রোমীয় রূপান্তর। সুতরাং, 'December' নামকরণটি এসেছে

সংস্কৃত নামকরণ থেকে। তাই গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জীতে এই মাস দ্বাদশ মাস হলেও, প্রাচীন দশম মাসের নামটি এখনও ধরে রেখেছে এবং এই কথাই প্রমাণ করেছে যে গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার কাছে বহুকাল থেকেই সম্যকভাবে ঋণী।

খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে ভুল করেন যে, ক্রিস্টমাস হচ্ছে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ। কিন্তু সংস্কৃত 'মাস' শব্দটি থেকে বুঝা যায় যে, 'ক্রিষ্টমাস' শব্দটির একটি পুরো মাস বোঝানোর সংস্কৃত ব্যঞ্জনা আছে। অনেকে এটাকে 'X-mas'-ও বলেন। খ্রিস্টান বিশ্বাস অনুযায়ী 'X-mas'-মানে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। এখানেও সেই একই ভুল। 'X' এই প্রতীকটি রোমানলিপিতে "১০" বুঝায়। 'X-mas'-অর্থ 'দশম মাস'। আবার ল্যাটিন 'Decem' শব্দের অর্থও দশম। সুতরাং, ক্রিষ্টমাস বা 'X-mas'-সম্পূর্ণ একটি মাসকেই বুঝাচ্ছে, কোন বিশেষ সপ্তাহ নয়। তাছাড়া, 'mas' ('মাস') বলতে সম্পূর্ণ মাসটিই বোঝায়, কোন সপ্তাহ বা দিন নয়। 'X-mas'-মানে দশম মাস, 'December' অর্থও দশম মাস এবং 'Chirstmas' অর্থ কৃষ্ণের নামে উৎসর্গীকৃত পুরো মাসটিই, বা কৃষ্ণমাস। এছাড়া, 'Christmas Day' বা 'X-mas Day' কথাটিও অর্থহীন। কারণ, এখানে মাসকে 'Day' বা দিনের সমার্থক ভাবা হচ্ছে। যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন বোঝাতে মাসটিকে 'Christmas' না বলে দিনটিকে বলা যেতো 'Christ Day'। প্রাচীনকাল থেকে তা কিন্তু বলা হয়নি। তাই বলতে হচ্ছে : খ্রিস্টমাস কথাটি দু'হাজার বছর বা তারও বেশি সময় ধরে জড়িয়ে আছে এই মাসের আরেকটি নামের সঙ্গে।

ত্রিত্ববাদ ও যীশু

ত্রিত্ববাদ (Trinity) খ্রিস্টধর্মের বৈশিষ্ট্য। খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের মতে, খোদার তিন রূপ— পিতা খোদা (God the Father), পুত্র খোদা (God the Son) এবং পবিত্র আত্মা খোদা (God the Holy Spirit)। সাধু পৌল প্রচারিত এবং ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রাচীন খ্রিস্টান দুনিয়ার দ্বিতীয় সার্বভৌম ক্যাথলিক ধর্মসভার আহ্বায়ক সম্রাট থিয়োডোসিউস কর্তৃক ঘোষিত মতবাদ 'একের ভিতরে তিন' (The Doctrine of the Trinity) অনুসারে খ্রিস্টানগণ বলেন পিতা, খোদা স্রষ্টা, সকল কিছুর আদি উৎস; পুত্র হিসেবে তিনি যীশুর মধ্যে মূর্ত এবং পবিত্র আত্মা হিসেবে তিনি সকল সৃষ্টির মধ্যে এবং আমাদের আত্মার মধ্যে বিরাজমান। এককথায়, খ্রিস্টানগণ বিশ্বাস করেন, একই খোদার সমমর্যাদাসম্পন্ন ও সমশক্তিসম্পন্ন তিনটি রূপের মধ্যদিয়ে প্রকাশ ঘটে— পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার। অর্থাৎ, খ্রিস্টানরা এক খোদায় বিশ্বাস করেও এক ঐক্যের মধ্যে

তিনের বিভেদের কথা বলে থাকেন। তাদের মতে, পিতা খোদা, পুত্র খোদা এবং পবিত্র আত্মা খোদা— এই তিন খোদার প্রত্যেকটি হচ্ছেন পূর্ণ ও স্বতন্ত্র খোদা। আবার এই তিন খোদা মিলে হচ্ছে এক পূর্ণ খোদা। কিন্তু এই মতবাদ যে অবিশ্বাস্য এবং ব্যবহারিক জীবনে অচল তার প্রমাণ মেলে ভারতীয় একজন ইসলাম ধর্ম প্রচারক ডক্টর মুফতি মুহম্মদ সাদেক-এর একটি উপমা থেকে।

> ১৯২০ সালে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে মুফতি মুহম্মদ সাদেক যান ভারত থেকে আমেরিকায়। সেখানে তিনি চিকাগোর ওয়াবাস (Wabash) এভিনিউতে একদিন এক বইয়ের দোকান-মালিককে খ্রিস্টধর্মীয় মতবাদের (ত্রিত্ববাদের) অসারতা বুঝাতে গিয়ে একটি বই পছন্দ করেন। ঐ দোকানের সকল বইয়ের মূল্যই তিন সেন্ট ছিল। ফলে, দোকান-মালিক বইটির মূল্য তিন সেন্ট চাইলে ডক্টর সাহেব তাকে পকেট থেকে শুধু একটি সেন্ট বের করে দেন। এতে দোকান-মালিক তাঁকে জানালেন যে তিনি ভুল করছেন, তাঁকে আরও দু'সেন্ট দিতে হবে। এতে ডক্টর সাহেব তাঁকে বললেন, "সে কি কথা! আমি তো ঠিকই দিয়েছি; আপনি কি বিশ্বাস করেন না 'তিনে এক, একে তিন?" এতে দোকান-মালিক লজ্জিত হয়ে বললেন, "ওটা তো ধর্মের কথা, ব্যবসায়তে ওটা চলে না।" অথচ 'তিন খোদা এক এবং এক খোদা তিন' এই জাজ্বল্যমান মিথ্যে মতবাদ প্রচার করে খ্রিস্টানরা বিশ্বকে বিভ্রান্ত করছে। পাশ্চাত্য জাতি সূক্ষাতি-সূক্ষ্ম হিসেবে পারদর্শী হয়েও এক যে তিন হয় না এবং তিন যে এক হয় না, ধর্মের ব্যাপারে এই সহজ সত্য কথা তারা বুঝে না, তারা এমনি অন্ধ।

যাহোক, 'তিন খোদা এবং এক খোদা তিন'— এই অভিনবত্ব বাইবেলের নতুন নিয়মের সৃষ্টি, পুরাতন নিয়মে এমন নয়। সেখানে খোদা এক ও অদ্বিতীয়রূপেই ব্যাখ্যাত হয়েছে, যেমন—

১. "তোমরা যেন জানতে ও আমাকে বিশ্বাস করতে পারো এবং বুঝতে পারো যে, আমিই তিনি, আমার পূর্বে কোন খোদা নির্মিত হয়নি, এবং আমার পরেও হবে না। আমি, আমিই সদাপ্রভু; আমি ভিন্ন আর ত্রাণকর্তা নেই" (যিশাইয়র, ৪৩ : ১০-১১)।

২. সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমি ভিন্ন আর কোন খোদা নেই" (যিশাইয়, ৪৪ : ৬)।

৩. "তথাপি আমিই মিশর দেশ অবধি তোমার খোদা সদাপ্রভু; আমাকে ব্যতিরেকে আর কোন খোদাকে তুমি জানবে না এবং আমি ভিন্ন ত্রাণকর্তা আর কেউ নেই" (হোশেয়, ১৩ : ৪)।

৪. "সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমি সদাপ্রভু সর্ববস্তু নির্মাতা, আমি একাকী আকাশমণ্ডল বিস্তার করেছি, আমি ভূতল বিছিয়েছি, আমার সঙ্গী কে?" (যিশাইয়, ৪৪ : ২৪)।

৫. "এখন দেখ, আমি, আমিই তিনি, আমি ব্যতীত কোন খোদা নেই" (দ্বিতীয় বিবরণ, ৩২ : ৩৯)

৬. "তবে তোমরা কার সাথে খোদার তুলনা দিবে? তাঁর সদৃশ বলে কি প্রকার মূর্তি উপস্থিত করবে? .... তুমি কি জ্ঞাত হওনি? তুমি কি শুননি? অনাদি অনন্ত খোদা, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্তসমূহের সৃষ্টিকর্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না; তাঁর বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না" (যিশাইয়, ৪০ : ১৮, ২৮)।

৭. "আকাশমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা সদাপ্রভু, স্বয়ং খোদা, যিনি পৃথিবীকে সংগঠন করে নির্মাণ করেছেন, তা স্থাপন করেছেন ও অনর্থক সৃষ্টি না করে বাসস্থানার্থে নির্মাণ করেছেন, তিনি এই কথা বলেন, আমি সদাপ্রভু, আর কেউ নয়" (যিশাইয়, ৪৫ : ১৮)।

৮. "হে প্রভু, দেবতাদের মধ্যে তোমার তুল্য কেউ নেই ..... কারণ, তুমি মহান এবং আশ্চর্য-কার্যকরী; তুমিই একমাত্র খোদা" (গীত সংহিতা, ৮৬ : ৮, ১০)।

৯. "আর তারা জানুক যে, তুমি— যাঁর নাম সদাপ্রভু, একা তুমিই সমস্ত পৃথিবীর উপরে পরাৎপর" (গীত সংহিতা, ৮৩ : ১৮)।

১০. "পুরাকাল পর্যন্ত তুমি ভিন্ন আর কোন খোদা আছেন বলে লোকে শুনেনি, কর্ণে অনুভব করেনি, চক্ষুতে দেখেনি" (যিশাইয়, ৬৪ : ৪)।

১১. "আমাদের খোদা সদা প্রভুর তুল্য কেউ নেই" (যাত্রা পুস্তক, ৮ : ১০)।

১২. "সদাপ্রভুই খোদা, তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই" (দ্বিতীয় বিবরণ, ৪ : ৩৫)।

১৩. "হে সদাপ্রভু, তোমার তুল্য কেউ নেই, ও তুমি ব্যতীত কোন খোদা নেই" (১ বংশাবলী ১৭ : ২০)।

১৪. "হে ইস্রায়ীল, শুন : আমাদের খোদা সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু" (দ্বিতীয় বিবরণ; ৬ : ৪)।

১৫. "মনে রাখ যে, উপরিস্থ স্বর্গে ও নীচস্থ পৃথিবীতে সদাপ্রভুই খোদা, অন্য কেউ নেই" (দ্বিতীয় বিবরণ, ৪ : ৩৯)।

১৬. তোমরা আপনাদের খোদা সদাপ্রভুরই অনুগামী হও, তাঁকেই ভয় কর, তাঁরই আজ্ঞা পালন কর, তাঁরই রবে অনুধাবন কর, তাঁরই সেবা কর ও তাঁতেই আসক্ত থাক" (দ্বিতীয় বিবরণ, ১৩ : ৪)।

১৭. "অতএব, হে সদাপ্রভু খোদা, তুমি মহান; কারণ তোমার তুল্য কেউই নেই, ও তুমি ব্যতীত কোন খোদা নেই, আমরা স্বকর্ণে যা যা শুনেছি, তদনুসারে ইহা জানি" (২ শমূয়েল, ৭ : ২২)।

বাইবেলের নতুন নিয়ম পাঠ করলেও জানা যায়, যীশু কখনও তিন খোদার কথা প্রচার করেননি, বরং এক খোদা ও একত্ববাদই প্রচার করতেন, যেমন—

১. "হে ইস্রায়ীল! শুন. আমাদের খোদা প্রভু একই প্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার খোদা প্রভুকে প্রেম করবে" (মার্ক, ১২ : ২৯-৩০; দ্বিতীয় বিবরণ, ৬ : ৪-৫)।

২. "সকলের খোদা ও পিতা এক, তিনি সবার উপরে, সবার নিকটে ও সবার অন্তরে আছেন" (ইফিষীয়, ৪ : ৬)

৩. "এবং খোদা এক ছাড়া দ্বিতীয় নেই; ... দেবতা নামে খ্যাত কিছু যদি স্বর্গে, অথবা পৃথিবীতে থাকে .... তথাপি আমাদের একমাত্র খোদা আছেন, তিনি পিতা, তাঁর থেকে সকলই হয়েছে ও আমরা তারই জন্য" (করিন্থিয়, ৮ : ৪-৬)

৪. "আমি আলফা এবং ওমিগা, আদি এবং অন্ত— ইহা প্রভু খোদা বলেন। যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন ও যিনি বিরাজ করছেন, যিনি সর্বশক্তিমান" (প্রকাশিত বাক্য— ১ : ৮)।

যীশুকে 'খোদার পুত্র খোদা' বলার কল্পকাহিনী ঃ

এখন খ্রিস্টানবিশ্ব যীশুখ্রিস্টকে খোদার পুত্র বলে জানে এবং বলে থাকে তিনি খোদার জীবন্ত প্রতিরূপ (Incarnation of God)। এই বিশ্বাসটি তাদের মতো আরও অনেক পৌত্তলিক জাতির মধ্যেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু যীশুর এই পুত্রত্বের সাথে খ্রিস্টান জগত আরও যেসব বিশ্বাস ও সংস্কারের সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর নেই।

খ্রিস্টানদের মতে সাবেক সদাপ্রভু বা পিতা খোদাকে পূর্বে কেউ দেখেনি। অর্থাৎ "একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন" (ব্যাপ্টিষ্ট মিশন, ১৯২৮-পরিবর্তনসহ)।

Begotten Son অর্থ ঔরসজাত পুত্র। সুতরাং, প্রথম পদের অর্থ হবে "একমাত্র ঔরসজাত পুত্র"। একজাত শব্দের দ্বারা Only begotten পদের যথার্থ তাৎপর্য জানা যায় না। তাছাড়া, বাইবেলে বলা হয়েছে যে, যীশুর আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত যে খোদা কুদরতের কারখানা যথানিয়মে চালিয়ে আসছিলেন, সম্ভবতঃ নিরাকার বলে, কেউ তাঁকে দর্শন করতে পারেনি। কিন্তু যীশুখ্রিস্ট নিজেকে প্রকাশ করে, তাঁকেই জড় দেহের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করে দিয়েছেন। সুতরাং, যীশুকে খোদার পুত্র করে দেয়ার জন্য খ্রিস্টান জগৎ পৌত্তলিকতার কোন অন্তঃস্থলে গিয়ে উপনীত হয়েছে, এসব সংস্কার থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ, এটা কখনোই যীশুর শিক্ষা ছিল না। প্রাথমিক যুগের ধর্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিদের সাথেও এর কোন সম্বন্ধ সংস্রব ছিল না (দেখুন, Encyclopeadia of Biblica, "Son of God")। এ সম্বন্ধে ভলতেয়ারের উক্তিগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভলতেয়ার বলেন, খ্রিস্টের ঈশ্বরত্ব নিয়ে যে বিরাট প্রশ্নটি খ্রিস্টান ধর্মমণ্ডলীর হৃদয় আলোড়িত করেছিল, খ্রিস্টের পর ৩২৪ অব্দে রোম সম্রাট কনস্টেনটাইন কর্তৃক আহূত নিসিয়া সম্মেলনে তা মীমাংসিত হয়। এই সভায় অন্যূন আঠারোজন বিশপ এবং দু'হাজার সাধারণ পাদ্রী যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন এবং তা নিয়ে বিরুদ্ধ-তর্ক করেন। কিন্তু অনেক ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ ও বিরুদ্ধ তর্কবিতর্কের পর যীশুকে 'পিতা পরমেশ্বর কর্তৃকজাত তাঁর একমাত্র পুত্র' বলে ঘোষণা করা হয়। বিরুদ্ধবাদী আঠারোজন বিশপের অন্যতম এরিয়াস একত্ববাদী অর্থাৎ খ্রিস্টের ঈশ্বরত্বে আস্থাহীন ব্যক্তিদেরকে পরিচালিত করেন এবং এই কাজের জন্য তিনি ধর্মদ্রোহী বিবেচিত হওয়ায় নির্বাসিত হন। কিন্তু অবিলম্বেই কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমান ইস্তাম্বুল) পুনরাহূত হয়ে নিজের ধর্মমতকে প্রবল করতে সমর্থ হন। ত্রিত্ববাদীদের নেতা। তাঁর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিরশত্রু এথানাসিয়াসের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁর ধর্মমতসমূহ সমগ্র রোম জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।"

'খ্রিস্টান পুরোহিতদের দ্বিতীয় সম্মেলন কনষ্টানটিনোপলে ৩৮১ খ্রিস্টাব্দে বসেছিল। নিসিয়া সম্মেলনে 'পবিত্র-আত্মা' সম্বন্ধে যা অসীমাংসিত রয়ে গিয়েছিল, এই সভায় তা পরিষ্কার করে নেয়া হয় এবং এই সম্মেলনে সিদ্ধান্তহয় যে, প্রভু পবিত্রাত্মাই মূলতঃ পিতা থেকে সমুৎপন্ন এবং পিতা ও পুত্রের সাথে একত্রে সম্মিলিত এবং একই সাথে গৌরাবান্বিত হন। পবিত্র আত্মা পিতা এবং

পুত্র থেকে জাত হয়েছেন। এই ধর্মমত নবম শতাব্দীর পর থেকে ক্রমশঃ লাতিন ধর্ম সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৩১ খ্রিস্টাব্দে ইফিসাসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সাধারণ সম্মেলনে ইহা নির্ধারিত হয় যে, মেরী প্রকৃতই ঈশ্বরের জননী। সুতরাং, যীশুর দু'টি স্বভাব এবং একটি দেহ। এ নিয়ে নবম শতাব্দীতে লাতিন ও গ্রীক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম মতভেদের সৃষ্টি হয়, এরপর পোপের পদ নিয়ে মতভেদের জন্য রোম শহরে অন্যূন উনত্রিশটি মারাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।" (Voltair Quoted, 6th Essay, P-23-24)।

যাহোক, এখন কিছু নজির উপস্থাপন করে দেখার প্রয়াস পাব যে যীশু খোদা অথবা খোদার পুত্র কোনটিই ছিলেন না; এরূপ দাবী তিনি কখনও করেননি; বরং, তিনি ছিলেন খোদার প্রেরিত একজন নবী— ভাববাদী।

বিনাপিতায় জন্ম খোদাত্বের প্রমাণ নয় ঃ

জগতের দু'টি জাতি, খ্রিস্টান ও মুসলমান একমত পোষণ করে যে যীশুর জন্ম সাধারণ নিয়ম বহির্ভুত হয়েছে। তবে খ্রিস্টান জাতি একে অতিপ্রাকৃতিক (Supernatural) বা অলৌকিক বলে এবং ইহুদীরা একে অবৈধ (illegitimate) বলে মনে করে (Jew. Ency.)। এছাড়া পারিবারিক জন্ম-তালিকাতেও যীশুর জন্ম এরূপেই লিপিবদ্ধ রয়েছে (Tulmud)। শুধু এই বাস্তব ঘটনাটিই গ্রহণযোগ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করে যে, যীশুর জন্ম অসাধারণ ছিল। উল্লেখ্য, মথি লিখিত সুসমাচার অনুযায়ী মরিয়মের স্বামী যীশুর জন্মের পূর্বপর্যন্ত দাম্পত্য জীবনের কোন সম্পর্ক স্থাপন করেননি (১ : ২৫)

প্রকৃতপক্ষে, খ্রিস্টান ও ইহুদী জাতি যীশুর জন্মকে অতিপ্রাকৃতিক ও অবৈধ বলে মনে করে, কিন্তু তাঁর জন্ম অতিপ্রাকৃতিকও ছিল না, অবৈধও ছিল না। অথচ, খ্রিস্টান জাতি যীশুর 'পিতৃহীন জন্ম'কে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে বলে থাকে যে, তিনি মানব-সৃষ্টির সাধারণ নিয়মের বিপরীত বিনাপিতায় জন্ম গ্রহণ করেছেন (মুসলমানরাও এ কথা স্বীকার করেন)। সুতরাং, এই অলৌকিক জন্মের জন্যই তাঁকে খোদা বলে মানতে হবে। কিন্তু জননীর জরায়ুতেই যে তাঁর প্রথম সঞ্চার ঘটেছিল এবং অন্যান্য জরায়ুজ জীবের ন্যায়ই ভ্রূণ-জীবের বিভিন্ন রূপ, স্তর ও আকারের মধ্যদিয়েই যে তাঁকে ক্রমশঃ পুষ্ট ও বর্ধিত হতে হয়েছিল, তাতে কোন মতভেদ নেই। ভ্রূণতত্ত্ব (Embryology) সম্বন্ধে যাঁর সামান্য কিছু জানা আছে, তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে, জরায়ুতে ভ্রূণের সঞ্চার হতে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত বাইরের একটি শক্তি বা নিয়মের অধীন হয়েই তাঁকে নানারূপে

পরিবর্তিত হতে হয়। এ নিয়মের অধীন হয়ে যাকে আত্মপ্রকাশ করতে হয় খোদা সে নয়। বরং, সেই নিয়মের নিয়ামক যিনি তিনিই খোদা।

খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের যুক্তি হল, যেহেতু বিনাপিতায় শুধু যীশুই জন্মগ্রহণ করেছেন সেহেতু তিনিই খোদার পুত্র। তাই, বিনাপিতায় জন্মগ্রহণ করলে কেউ খোদার পুত্র হয় কিনা এবং এ ধরনের জন্ম প্রকৃতিসম্মত কিনা তা আমরা প্রাচীন গ্রন্থ ও বিজ্ঞানের আলোকে আলোচনা করতে বা দেখতে পারি।

> "কথিত আছে যে, লুম্বিনী উদ্যানে এক বিশেষ দর্শনলাভের পর রাণী মায়াদেবী গর্ভধারণ করেন এবং এমনিভাবে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। রাজা শুদ্ধোদন মহাত্মা বুদ্ধের প্রকৃত পিতা ছিলেন না। যোসেফের সাথে যীশুর যে সম্পর্ক শুদ্ধোদনের সাথেও গৌতমের সেইরূপ সম্পর্ক। মূলত, গৌতমের জন্ম বিনাপিতায়ই হয়েছিল (Budhism in Christianity, By Arther lillie)।
>
> হিন্দুধর্মগ্রন্থ, মহাভারতে রয়েছে, যীশুখ্রিস্ট যেভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কর্ণও সেইভাবে বিনাপিতায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ শূর তাঁর প্রথমজাত সন্তানকে মানত করেন। এই মানতের পর এক কন্যা-সন্তান 'পৃথা' জন্মগ্রহণ করেন। পৃথাকে কুন্তিভোজের তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মণ সেবায় রাখা হয়েছিল বলে ঐ কন্যা 'কুন্তি' নামে আখ্যাত হন। কথিত আছে যে, কুন্তি দেবী কুমারীবস্থায় সূর্যের দ্বারা (প্রাকৃতিক নিয়ম) গর্ভবতী হন এবং কর্ণকে প্রসব করেন (আদি পর্ব, ১১১ অধ্যায়)"।

পূর্বোক্ত বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের দুটো নজির ছাড়াও প্রাচীন পারস্যবাসীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস থেকে জানা যায়, খোদা ও মানুষের মধ্যে প্রধান মাধ্যম 'মিথরা'র জন্ম হয়েছিল বিনাপিতায় একজন কুমারীর গর্ভে। আর এই বিশ্বাস খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দেও প্রচলিত থাকার প্রমাণ রয়েছে (দ্রষ্টব্য : Religions Of The World)।

অতএব, শুধু যীশুই যে বিনাপিতায় জন্মগ্রহণ করেননি, তা বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম এবং পারস্যে প্রচলিত একটি নজির থেকেও জানা গেল। প্রকৃতপক্ষে, বিনাপিতায় জন্মগ্রহণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। বিজ্ঞানের গবেষণায়ও বিষয়টি এখন সমর্থিত। কারণ, মাতৃগর্ভে (জরায়ুতে) উৎপন্ন ডিম্বাণুর দ্বারা সন্তান উৎপাদনের জন্য পিতৃপুরুষের সংমিশ্রণ যে একান্তই জরুরি, তা নয়। পুরুষ-বীর্যের সহায়তা ছাড়াই স্ত্রী ডিম্বাণুর স্ফূটন ঘটতে পারে, যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'বিনা নরে

জন্ম' বা 'পার্থেনোজেনেসিস (Parthenogenesis) বলা হয়। এ সম্বন্ধে The World Book of Dictionary বলে, কোন পুরুষ সংসর্গের প্রভাব ছাড়াই প্রজনন, যেমন— কোন কোন কীট-পতঙ্গের মাঝে বিপরীত লিঙ্গের সংসর্গ ছাড়াই কুমারী স্ত্রী-ডিম্বকোষের উর্ব্বরতা ঘটে থাকে, পার্থেনোজেনেসিস বা 'বিনা নরে জন্ম' কীট পতঙ্গের মাঝে অতি সাধারণ হলেও বড় জাতের প্রাণীদের মাঝে তা কখনো কখনো ঘটে।

Macmillan Family Encyclopaedia (Vol. 15. P-100) বলে, নারীদের ক্ষেত্রে একটি ডিম্বকোষের মাঝে যখন প্রাথমিক বিভাজন ঘটে তখন দু'টি কোষের উৎপত্তি হয়। কোষ দু'টির প্রত্যেকটিতে নির্দিষ্ট (ডিপ্লয়েড) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। এদের একটি কোষ উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে ক্ষয়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় একে প্রাথমিক পোলার বডি বলা হয় এবং এটি অপর কোষের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ডিম্বকোষের প্রবৃদ্ধির এই স্তরে এসেই যৌন-সংসর্গবিহীন বা বিনা-নরে জন্মদানের রতিক্রিয়ার উদ্দীপনা জোটে। এ ধরনের রতিক্রিয়াকালে ডিম্বকোষের দ্বিতীয় বিভাজন ঘটে। দু'ভাবে এটি ঘটতে পারে: হয় যুক্ত ক্রোমোজোম পৃথক হয়ে যাবে এবং প্রতিটি সদৃশ ক্রোমোজোম এলোমেলো কিছু পরিপূরক ক্রোমোজোমকে ফেলে দ্বিতীয় অক্ষবর্তী দেহ নিয়ে বাইরে বিক্ষিপ্ত হবে; না হয় দ্বিতীয় পোলার বডি সৃষ্টি হবে না। এ কারণে ডিম্বকোষের মাঝে নির্দিষ্ট (ডিপ্লয়েড) সংখ্যক ক্রোমোজোম রয়ে যাবে। যৌন-সংসর্গবিহীন জন্ম কখনো কখনো এই দ্বিতীয় প্রকারের ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যেই ঘটে থাকে। উল্লেখ্য, রুশ বিজ্ঞানী Dr. Igor Golman বিনাপিতায় জন্ম লাভ সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করেছেন এবং এরকম জন্মের সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন (Daily Express, Jesselton, 14 October, 1966)। তাছাড়া, Sunday Pictorial, November, 1955 সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যে, বিজ্ঞানীদের মতে কোন কোন নারী দেহে একপ্রকার টিউমার হয়ে থাকে, এতে পুরুষের ন্যায় শুক্রকীটের উদ্ভব হয়। কখনো কখনো এই টিউমার থেকে শুক্রকীট বের হয়ে ডিম্বাকোষে প্রবেশ করে এবং এতে কখনো কখনো গর্ভের সঞ্চার করে, যদিও তা খুবই বিরল। পত্রিকাটিতে কয়েকজন কুমারী মাতার নামও প্রকাশ করা হয়েছে। বিখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী Lancet-এ বলা হয়েছে যে, চিকিৎসা বিজ্ঞান তথা জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকৃতির বিশেষ ব্যবস্থাধীনে যৌন-সংসর্গ ব্যতীত সন্তান জন্ম বা পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে নারীর সন্তান উৎপাদনের সম্ভাব্যতাকে অসম্ভব বলা যায় না। চিকিৎসাবিদগণ নারীর শ্রোণীতে বা শিশ্নাঙ্গের মধ্যে কখনো কখনো প্রাপ্ত 'আরহেনোব্লাস্টোমা' নামক একপ্রকার বিশেষ টিউমারের কারণে

এই সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এসব টিউমার পুরুষ শুক্রাণু এবং পুং-জনন কোষ উৎপাদন করতে সক্ষম। যদি এই 'আরহেনোব্লাস্টোমা' দ্বারা কোন নারীদেহে স্বক্রিয় বা জীবিত পুং-জনন কোষ সৃষ্টি হয় তবে সেই নারী কুমারী হলেও তার গর্ভধারণ করার সম্ভাব্যতা অস্বীকার করা যায় না। সেই নারীর দেহ এমনভাবে ক্রিয়াশীল হবে যেন কোন পুরুষ-দেহ থেকে শুক্রাণু সাধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা অথবা কোন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর সাহায্যে তার দেহে স্থানান্তরিত হয়েছে। সম্প্রতি ইউরোপের স্ত্রীরোগ বিশারদগণ সন্তান-প্রসবের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করতে এমন তথ্য প্রকাশ করেছেন যেখানে প্রসূতি-মাতার কোন সম্পর্ক বা সংযোগ কোন পুরুষের সঙ্গেই ছিল না। Lancet-এর এই বিষয়টির বিস্তারিত তথ্য-বিবরণ লন্ডন থেকে W. B. Saunders & Co. কর্তৃক প্রকাশিত Anomalies and Curiosities of Medicine নামক পুস্তকে George M. Gould, A.M. M.D. এবং Walter L. Payle, A.M., M.D. কর্তৃক আরও জোরালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে :

> "চিকিৎসাবিদগণ প্রাকৃতিক 'পারথেনোজেনেসিস' বা কোন পুরুষ সংসর্গ ছাড়াই শুধু নারীর দ্বারা সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ ধরনের উক্তিকে দ্বিধাহীনচিত্তে হাস্যস্পদ মনে হলেও জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে কতগুলো শর্তসাপেক্ষে এহেন সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে হয়। ডক্টর টিমি এমন সম্ভাবনা সম্পর্কে বলেন, 'আরহেনোব্লাস্টোমা' নামে পরিচিত (পুরুষ এবং বীর্য'র জন্য গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত) একপ্রকার টিউমার নারীর লিঙ্গের মধ্যে কখনো কখনো উৎসৃষ্ট হয়, যার ফলে এমন ঘটে। এ টিউমারগুলো পুরুষ শুক্রাণু বা পুং-জননকোষ উৎপাদন করতে সক্ষম। স্বভাবতঃই যদি এই পুরুষ শুক্রকোষগুলো জীবন্ত ও তৎপর হয়ে নারীর ডিম্বকোষে অথবা ডিম্বের সংস্পর্শে আসে, তবেই গর্ভসঞ্চার হতে পারে। এমন ঘটনার প্রক্রিয়ায় যৌক্তিকতা রয়েছে ... ... ডক্টর টিমি বলেন, ইউরোপে এমন বিশটি প্রাথমিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া গেছে, যাতে *'আরহেনোব্লাস্টোমাই'* পুরুষ জননকোষ সৃষ্টি করেছে। *'আরহেনোব্লাস্টোমা'* এক ধরনের টিউমার, যাতে ব্লাস্টোডারমিক কোষ থাকে। ... এই কোষগুলোর গঠন-প্রক্রিয়া সৃজনশীল এবং যেকোন সময় বর্ধিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। কাজেই *'আরহেনোব্লাস্টোমা'য়* অবস্থিত এই অপরিপক্ক কোষগুলো যে অণ্ডকোষ-উপাদান সৃষ্টি করতে পারে এবং পুরুষ জীবকোষও সৃষ্টি করতে পারে বৈজ্ঞানিক মতে, তা সম্ভব। ... যদি

'আরহেনোব্লাস্টোমা' প্রক্রিয়ায় নারীদেহে জীবন্ত পুরুষ শুক্রকোষ সৃষ্ট হয়, তাহলে নারীদেহে এমনকি কুমারী গর্ভেও সন্তান উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং, এহেনবস্থায় নারীর নিজ দেহে একই অবস্থার সৃষ্টি হবে, যে অবস্থার সৃষ্টি হবে পুরুষ দেহ থেকে যদি জীবকোষ স্বাভাবিকভাবে অথবা চিকিৎসকের সাহায্যে নারীদেহে স্থানান্তরিত হয়।" — (আমেরিকান মেডিকেল জার্নাল)।

পত্রিকাটিতে পিতৃবিহীন সন্তান-জন্মের কয়েকটি ঘটনাও উল্লিখিত আছে : "উত্তম নৈতিক চরিত্রের এক যুবতী গর্ভধারণ করেছিল অথচ এই উৎস সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্রও জ্ঞান ছিল না। .... পুরুষের সংস্পর্শবিহীন এক অবিবাহিতার গর্ভধারণের এমন এক ঘটনা রয়েছে যে, তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করার সকল প্রকারের প্রচেষ্টাকে সে যুক্তি প্রমাণ দ্বারা কৃতিত্বের সাথে ব্যর্থ করে দিয়েছে। সে বিনাপিতায় গর্ভবতী হয় এবং সুগঠিত সুদর্শন এক কন্যা-সন্তান প্রসব করে।"

সুতরাং, মরিয়ম কিভাবে যীশুকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, উপরোদ্ধৃত তথ্যাদি থেকে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌তা'য়ালার কার্যকলাপ দুর্বোধ্য এবং তার শক্তিসমূহ অপরিসীম, যিনি সমগ্র বিশ্ব একটি 'কুন' (হও) শব্দ উচ্চারণের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। তিনি পদার্থে এমন পরিবর্তন ঘটাতে পারেন, যার ফলে যা বাহ্যতঃ দুর্বোধ্য বলে মনে হলেও তার সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

যাহোক, যীশুর বিনাপিতায় জন্মলাভের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই, আর এজন্য তিনি খোদার পুত্র হতে পারেন না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, *"সেইত তিনি, যিনি তোমাদের জরায়ুতে যেমন ইচ্ছা আকার দান করেন; তিনি ব্যতীত খোদা আর কেউ নেই— প্রবল প্রজ্ঞাময় তিনি"* (৩ : ৫)। যীশু সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, *'ইন্না মাছালা ঈসা ইন্দাল্লাহি কামাছালি আদামা খালাকাহু মিন তুরাব* (৩ : ৬০) অর্থাৎ—*আল্লাহ্'র কাছে যীশুর জন্ম অস্বাভাবিক কিছু নয়— বরং আদামা বা অন্যান্য মানুষের জন্মের মতোই অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তিনি যীশুসহ সকল মানুষকেই মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন।* এখানে খ্রিস্টান প্রচারকরা যদি আদামা অর্থে শুধু একজন আদি মানব হযরত আদম (আঃ)-কে বুঝাতে চান, তাহলেও এ থেকে তাঁদের কুসংস্কারের প্রতিবাদ হয়ে যায়। কারণ, ধর্মীয় কারণে তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, হযরত আদম (আঃ) বিনাপিতামাতায় সৃষ্ট হয়েছিলেন। সুতরাং, যীশু 'বিনাপিতায় পয়দা' বলে যদি খোদার পুত্র খোদা হওয়ার অধিকারী হন তবে শুধু পিতা নয় মাতারও সংস্রব

ছাড়া জন্ম যে হযরত আদমের, তিনি তো তাঁর অপেক্ষা বৃহত্তর খোদা হওয়ার অধিকারী নন কি!

'Son of God' প্রসঙ্গ ঃ

খ্রিস্টানধর্ম প্রচারকগণ যীশুর খোদাত্বের প্রমাণস্বরূপ 'নতুন নিয়মে' যীশুর জন্য ব্যবহৃত Son of God বা 'খোদার পুত্র'। তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী, যীশুকে যেহেতু 'খোদার পুত্র, বলা হয়েছে, সেহেতু তারা খোদার পুত্রকেও খোদারূপে মান্য করেন। শাস্ত্রজ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই খ্রিস্টানরা এই ভ্রমে পতিত। যদি তারা ভালভাবে শাস্ত্রপাঠান্তে চিন্তা করতেন, তবে দেখতে পেতেন, বাইবেলের নতুন ও পুরাতন উভয় নিয়মেই খোদাপ্রাপ্ত অসংখ্য পবিত্র ব্যক্তিকে রূপকভাবে 'খোদা বা খোদার পুত্র' আখ্যা দেয়া হয়েছে, কিন্তু এজন্য তাঁরা কেউই প্রকৃত খোদা বা খোদার পুত্র হয়ে যাননি। যেমন— ইহুদীরা যখন যীশুকে পাথর মারতে উদ্যত হয় তখন যীশু বললেন, "কেন আমাকে পাথর মার? ইহুদীরা তাঁকে উত্তর দিল, 'কারণ, তুমি মানুষ, অথচ নিজেকে খোদা করে তুলছ, এজন্য।' যীশু তাদেরকে উত্তর দিলেন, 'তোমাদের ব্যবস্থায় কি লেখা নেই, 'আমি বললাম, তোমরা খোদা'? যাদের নিকট খোদার বাক্য উপস্থিত হয়েছিল, তিনি যদি তাদেরকে খোদা বললেন— আর শাস্ত্রের খণ্ডন ত হতেই পারে না— তবে যাঁকে পিতা পবিত্র করলেন ও জগতে প্রেরণ করলেন, তোমরা কি তাঁকে বল যে, তুমি খোদা নিন্দা করছ। কারণ, আমি বললাম যে, আমি খোদার পুত্র?" (যোহন, ১০ : ৩২-৩৬)। এখানে ইহুদীদের মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে যীশু বলছেন যে, ইহুদী-শাস্ত্র গীত সংহিতার ৮২ : ৬ পদে যেরূপ রূপকভাবে খোদার বাক্য লাভকারী ব্যক্তিদেরকে খোদা বলা হয়েছে তেমনই তিনিও রূপকভাবে খোদার পুত্র। অন্যত্র যীশু বলেন, "ধন্য যারা মিলন করে দেয়, কারণ তারা খোদার পুত্র বলে আখ্যায়িত হবে।" (মথি, ৫ : ৯)। এরূপ বাইবেলে আরও বহু লোককে রূপকভাবে খোদার পুত্র বলা হয়েছে। যেমন— "সদাপ্রভু এই কথা বলেন, ইস্রায়ীল আমার পুত্র, আমার প্রথম জাত" (যাত্রা পুস্তক, ৪ : ২২)। "তুমি আমার পুত্র" (গীত সংহিতা, ২ : ৭)। "শলোমন খোদার পুত্র" (১ বংশাবলী, ২২ : ১০; ২৮ : ৬)। "যত লোক খোদার হুকুম দ্বারা চালিত হয়, তারাই খোদার পুত্র" (রোমীয়, ৮ : ১৪)। "আমরা খোদার সন্তান" (রোমীয়, ৮ : ১৬)। "তোমরা আপনাদের খোদা সদাপ্রভুর সন্তান" (দ্বিতীয় বিবরণ, ১৪ : ১)। "আমাদের একমাত্র পিতা আছেন, তিনি খোদা" (যোহন, ৮ : ৪১) "খোদা আপন পবিত্র বাসস্থানে পিতৃহীনদের পিতা" (গীত সংহিতা, ৬৮ : ৫)।

"পৃথিবীতে কাউকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করো না, কারণ তোমাদের পিতা একজন, তিনি সেই স্বর্গীয়" (মথি, ২৩ : ৯) অতএব, যীশু খোদা অথবা খোদার পুত্র নন, তিনি খোদার বাক্য লাভকারী এক পবিত্র ভাববাদী, নবী। বাইবেলে অন্যান্য লোককে যেমন খোদার পুত্র বলা হয়েছে, তেমনই যীশুকেও খোদার পুত্র বলা হয়েছে রূপকভাবে।

যীশুকে বাইবেলে খোদার পুত্র কেন বলা হয়েছে সে বিষয়ে একটি উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক ঃ হিব্রুতে 'খোদার পুত্র' স্থলে 'বেনে এলোহীম' বলা হয়েছে, এর অর্থ অত্যন্ত প্রিয়, রাজা, স্বর্গীয় দূত, খোদার সেবক' (দেখুন Gesenius কৃত Hebrew And English Lexican, English Translation- J. W. Gibbs, page-34)। এছাড়া, খোদার পুত্র বা ঈশ্বরপুত্র শব্দটি একটি সম্মানসূচক রাজকীয় পদবী। রোমান সম্রাট এই উপাধিটি (ডিভি/ফিলিউস) ধারণ করতেন। কিন্তু, যীশু এসবে খুবই বিরক্ত হতেন এবং বারবার লোকদেরকে এ বিষয়ে সাবধান করতেন যদিও নিবৃত্ত করতে পারতেন না।

বার্ণাবার উত্তর

বার্ণাবা, যিনি পৌলের সহপ্রচারক ও বন্দী জীবনের সঙ্গী তিনি তাঁর সুসমাচারে যীশুর একত্ববাদ প্রচারের কথা উল্লেখ করে লিখেন, "যারা যীশুকে খোদার পুত্ররূপে পূজা করে তাদের উপর মহাত্মা যীশু অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। যেমন, 'Crused be every One who shall insert into my Saying that I am the Son of the God' (Chapter-53)। বার্ণাবা তাঁর সুসমাচারের শেষ— ২২২ অধ্যায়ে লিখেন, Certain evil men, ... preached, and yet preach, that Jesus is the Son of God, among whom is Paul decived, অর্থাৎ— কয়েকজন অপবিত্র লোক ... প্রচার করে থাকে যে, যীশু খোদার পুত্র, আর এসব প্রচারকদের মধ্যে প্রতারিত পৌলও একজন।

যীশুর অলৌকিক কীর্তিকলাপ খোদাত্বের প্রমাণ?

খ্রিস্টান ধর্ম-প্রচারকরা যীশুর খোদাত্বের প্রমাণস্বরূপ বলে থাকেন যে, যীশু নানাপ্রকার অলৌকিক কাজ করেছেন, যা খোদা ব্যতীত অন্য কারও দ্বারা অসম্ভব। যেমন ঃ মৃতকে জীবিত করা, অন্ধকে দৃষ্টিদান করা কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্যদান প্রভৃতি। এর স্বপক্ষে তারা পবিত্র কোরআনের ৩ : ৫০ আয়াতের উল্লেখ করে বলে থাকেন যে, কোরআনেও যীশুর খোদাত্ব স্বীকার করা হয়েছে এবং কোরআনের কোন কোন তাফসীরকারও যীশু কর্তৃক "মৃত্তিকার দ্বারা পাখির আকৃতি গঠনপূর্বক ফুৎকার প্রদান করে তাকে জীবিত পাখিতে পরিণত করা,

মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করা এবং কুষ্ঠ-রোগীকে স্পর্শমাত্র আরোগ্য করা .... এতদ্ভিন্ন সমবেত লোকদের খাদ্য-পানীয় এবং সংগৃহীত দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও নানারূপ বিস্ময়কর সংবাদ" দেয়া সম্বন্ধে বিশ্বাস ও সংস্কারের পূর্ণ সমর্থন করেছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আলী হাসান বলেন, "বাইবেলে হযরত ঈসা কর্তৃক জন্মান্ধকে দৃষ্টিদান, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য এবং মৃতকে জীবিত করার প্রথা লিপিবদ্ধ রয়েছে; কিন্তু মৃন্ময় পক্ষীকে সজীব করার কথা উল্লিখিত হয়নি। ইহুদীরা ঐসব কথায় সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। খ্রিস্টানরাও বাইবেলে যা লিখিত আছে, তদ্ব্যতীত অন্যকথার প্রতি অবিশ্বাসী। আধুনিক কোন কোন তাফসীরকার হযরত ঈসার অলৌকিক নিদর্শন সম্বন্ধে পবিত্র কোরআন ও বাইবেলে যে-সব উক্তি আছে, তার সবগুলোকেই রূপক বর্ণনা বলে অভিহিত করছেন তাঁরা বলেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের পক্ষে মৃতকে জীবন দান করা, কোন নতুন জীব সৃষ্টি করা কিংবা প্রাকৃতিক শক্তিকে স্বীয় আজ্ঞাধীন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব"। তাঁদের মতে, মৃন্ময় পক্ষী-মূর্তিকে সজীব করার অর্থ তুচ্ছ মাটির মানুষকে আধ্যাত্মিক জীবন্ত-শক্তি প্রদান করা, মৃতকে জীবিত করার অর্থ অবনত ও পতিত জাতিকে উন্নত ও শক্তিশালী করা এবং অন্ধকে দৃষ্টিদান, খঞ্জকে চলৎশক্তি, রোগীকে আরোগ্য ও বধিরকে শ্রবণ-শক্তি দান করা (নতুন নিয়ম) প্রভৃতির অর্থ ধর্মহীনকে ধর্ম শিক্ষাদান, পথভ্রান্তকে পথ-প্রদর্শন, অজ্ঞানান্ধকে জ্ঞানের আলোক বিতরণ এবং নির্বোধ মুর্খদেরকে ধর্মজ্ঞান ও উপদেশ প্রদান প্রভৃতি। তঃ কবির, বয়জবী ও বাঃ কোঃ— মঃ আঃ প্রভৃতি তুলিতব্য।" (তরজমা ও তাফসীর, ১ম খণ্ড, ১৭১-৭২ পৃষ্ঠা, ওসমানিয়া লাইব্রেরি, কলকাতা)।

পবিত্র কোরআনের ৩ : ৫০ আয়াতে বলা হয়েছে, ফেরেশতা কর্তৃক যীশু তাঁর স্বজাতীয়দের কাছে কি বলবেন, কি করবেন সেই ভাবী বিষয়গুলো যীশুর বিশেষ নিজস্ব ভাষায় মরিয়মের নিকট অভিব্যক্ত হয়েছে। যীশু বনী ইস্রায়ীলের নিকট রসূলরূপে প্রেরিত হয়ে বলেছিলেন :

> *"... আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য কাঁদা থেকে পাখির আকার সদৃশ সৃষ্টি করব; অতঃপর তাতে আমি ফুৎকার করব, ফলে তা আল্লাহ্র আদেশে উড্ডয়নশীল হবে এবং আমি আল্লাহ্র আদেশে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করব এবং মৃতদেরকে জীবনদান করব এবং তোমরা কি খাবে এবং তোমাদের ঘরে কি সঞ্চয় করবে সে বিষয়ে তোমাদেরকে আমি অবহিত করব। নিশ্চয় এর মধ্যে তোমাদের জন্য এক নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা মোমেন হও।"*

এখানে আয়াতের বিভিন্ন অর্থবাচক শব্দগুলোকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করলে স্বীকৃত হয়, সৃষ্টি করার, মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করার এবং মৃতদেরকে জীবিত করার শক্তি যীশুর ছিল এবং সে শক্তি নিশ্চয় তিনি প্রয়োগও করেছেন। কিন্তু কোরআনের নৈতিক শিক্ষার বিরুদ্ধে এমন তাৎপর্য গ্রহণ করা মোটেই সঙ্গত হবে না। কেননা, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"এবং তারা তাঁর পরিবর্তে এমন মা'বুদ গ্রহণ করেছে যারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্ট, বস্তুতঃ তারা নিজেদের জন্যও না কোন উপকার এবং না কোন অপকার করার ক্ষমতা রাখে এবং না জীবন না মরণ এবং না পুনরুত্থানেরই তারা কোন ক্ষমতা রাখে।" (২৫ : ৪)।

"হে মানবমণ্ডলী! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, তোমরা তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর— নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদেরকে ডাকছ, তারা কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্র হলেও। এবং মাছি যদি তাদের নিকট থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তারা তাও তার নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে অন্বেষক ও অন্বেষিত উভয়ই কত দুর্বল" (২২ : ৭৪)।

এই আয়াত দুটো থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদেরকে তার আসনে বসানো হয়েছে (১) সৃষ্টির অধিকার তাদের নেই (২) কারও মৃত্যু ঘটানোর অধিকার তাদের নেই। (৩) কাউকে জীবনদানের অধিকার তাদের নেই। (৪) কোন মৃতকে জীবিত করার শক্তি তাদের নেই।

সুতরাং, ভ্রষ্ট মানব-সমাজ এ পর্যন্ত যাদেরকে আল্লাহ্‌র অংশীদাররূপে গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম যীশুখ্রিস্ট যে ঐ গুণ চতুষ্টয়ের অধিকারী ছিলেন না, তা স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষ একবার মরে যাবার পর কিয়ামত পর্যন্ত তার পুনর্জীবিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন— পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন :

"এবং প্রত্যেক জনপদের জন্য, যাকে আমরা ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে হারাম (অলঙ্ঘনীয় বিধান) করা হয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ পুনরায় কখনও ফিরে আসবে না" (২১ : ৯৬)।

হাদিসে আছে, আল্লাহ্‌তায়ালা শহীদদেরকে তাদের প্রার্থনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করছেন : **'হে আমার বান্দা, আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তা দান করব।'** শহীদরা তখন বলে : **'আমাদের**

কোনই অভাব নেই।' আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে বারবার ঐরকম প্রশ্ন হওয়ার এবং তাদের পক্ষ থেকে ঐধরনের উত্তর দেয়ার পরও যখন আল্লাহ্ ঐরূপ জিজ্ঞেস করেন, শহীদরা তখন বলেন, হে প্রভু, আমাদের একমাত্র আকাঙ্খা আপনি আবার আমাদেরকে জীবিত করে দুনিয়ায় পাঠান, আবার আমরা আপনার নামে জেহাদ করি এবং শহীদরূপে নিহত হই।' তখন আল্লাহ্ বলেন : 'আমার অলঙ্ঘ্য নির্দেশ : মৃতেরা আর দুনিয়ায় ফিরবে না।' (মুসলিম শরীফ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ প্রভৃতি)।

প্রকৃতপক্ষে, যীশুর মূল শিক্ষা থেকে খ্রিস্টান সমাজ কতদূর স্খলিত হয়েছে, নাজরান ডেপুটেশনকে তা বুঝিয়ে দেয়ার জন্যই যীশুর নিজমুখের উক্তি ৩ : ৫০ আয়াতে তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত হয়েছে। এরমধ্যে যে গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে, তা জানতে যীশুর জীবনচরিতের আশ্রয় নিতে হবে। তাঁর জীবনেতিহাস রচয়িতারা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, যেকোন কারণেই হোক, যীশু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন রূপকভাবে (Allegorical) উপমা উদাহরণের মাধ্যমে।

মথি বলেছেন :

"তখন তিনি উপমাদ্বারা তাদের নিকট অনেক কথা বললেন (১৩ : ৩) পরে শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে বললেন, আপনি কি কারণে উপমাদ্বারা এদের নিকট কথা বলছেন? তিনি উত্তরে তাঁদের বললেন, স্বর্গ-রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্বগুলো তোমাদের জানতে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের দেয়া হয়নি। কারণ, যার আছে, তাকে দেয়া হবে, আর তার উপচে পড়বে; কিন্তু যার নেই, তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে নেয়া হবে। এজন্য, আমি উপমা দ্বারা তাদের নিকট কথা বলি, কারণ তারা দেখেও-দেখে-না আর শুনেও-শুনে-না এবং বুঝেও-বুঝে-না" (১৩ : ১০-১৩)।

মার্ক বলছেন :

"তিনি উপমা দ্বারা তাদের অনেক বিষয় শিক্ষা দিলেন (৪ : ৩) পরে যখন তিনি একাকী ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গীরা সেই বারোজন শিষ্যকে নিয়ে তাঁকে উপমা কয়টির বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাঁদের বললেন, খোদার রাজ্যের নিগূঢ়-তত্ত্ব তোমাদের জানতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যারা বাইরে রয়েছে, তাদের জন্য সমস্ত কিছুই উপমা দিয়ে বলা হয়"। যেন 'তারা যদিও দেখে তবুও প্রত্যক্ষ না করে, যদিও শুনে তথাপি না বুঝে, পাছে তারা ফিরে আসে ও তাদের ক্ষমা করা হয়'।

পরে তিনি তাঁদের বললেন, তোমরা এই উপমাটি যখন বুঝতে পারলে না, তখন অন্যান্যগুলোর অর্থ কি করে বুঝবে?" (৪ : ১০ - ১৩)।

পূর্বোক্ত বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, যীশু জনসাধারণের মধ্যে রূপক ভাষায় উপমা উদাহরণের মধ্যদিয়ে ধর্মকথা প্রচার করতেন, যার মর্ম তারা কিছুই বুঝতে পারত না। এমনকি, তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য-সহচরদের পক্ষেও অনেক সময় সে সবের মর্ম গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব। এজন্য, বাড়ি গিয়ে তিনি তার মর্ম শিষ্যদেরকে বুঝিয়ে দিতেন।

অতএব, যীশু কি বলেছেন, না বলেছেন তার প্রকৃত মর্ম যখন তৎকালীন জনসাধারণ এমন কি শিষ্য-সহচররা পর্যন্ত বুঝতে পারতেন না, বর্তমান খ্রিস্টানদের তো বুঝার প্রশ্নই ওঠে না; অধিকন্তু যীশুর কাছে জিজ্ঞেস করার কোন সুযোগ-সুবিধা যখন এখন নেই তখন ৩ : ৫০ আয়াতের অবোধ্য উক্তি নিয়ে যীশুখ্রিস্টের অতিমানুষী বা খোদায়ী-স্বরূপের ভিত্তি খোঁজা খ্রিস্টান প্রচারকদের সঙ্গত নয়।

যুক্তরাজ্য থেকে ১৯৮৮ সালে Islam International Publications Limited কর্তৃক প্রকাশিত The Holy Quran, Vol. 2, p-401-404-এ আলোচ্য আয়াতের টীকায় বলা হয়েছে :

"বাইবেলের কোথাও উল্লেখ নেই যে, ঈসা (আঃ) মোজেযা প্রদর্শন করার জন্য পাখি সৃষ্টি করে আকাশে উড়িয়েছেন। সত্যি সত্যি যদি ঈসা (আঃ) পাখি বানিয়ে উড়িয়ে থাকতেন, তবে বাইবেলে তা কিভাবে ও কেন অনুল্লিখিত থাকল? আল্লাহ্'র কোন নবী পূর্বে এ ধরনের ঐশী-নিদর্শন দেখাননি। অথচ, বাইবেল এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব। বাইবেলে এই মহা-নিদর্শনের উল্লেখ থাকলে, সকল নবীর উপর ঈসা (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হত এবং পরবর্তীকালের খ্রিস্টানরা ঈসার প্রতি যে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছে, তাও কিছুটা সমর্থন লাভ করত। **'খালুক'** শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়— মাপ বা ওজন করা, পরিমাপ ঠিক করা, নক্সা তৈরি করা, আকৃতি দেয়া, পোশাক তৈরি করা, সৃষ্টি করা ইত্যাদি। সৃষ্টি করা অর্থে **'খালুক'** শব্দটি কোরআনের কোথাও আল্লাহ্'র কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ বলে স্বীকৃতি পায়নি; আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও প্রতি এই গুণটি কোরআনের কোথাও আরোপিত হয়নি (১৩ : ১৭; ১৬ : ২১; ২২ : ৭৪; ২৫ : ৪; ৩১ : ১১-১২, ৩৫ : ৪১ এবং ৪৬ : ৫)।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এবং 'কাদা-মাটি'র রূপক অর্থ সম্মুখে রেখে *'তোমাদের জন্য কাদা-মাটি থেকে আমি পাখির অবস্থার অনুরূপ সৃষ্টি করব,*

অতঃপর তার মধ্যে আমি (নবজীবন) ফুৎকার করব, ফলে তা আল্লাহ্'র আদেশে উড্ডয়নশীল হয়ে যাবে' ইত্যাদি কথার মর্ম বুঝার চেষ্টা করলে, তার তাৎপর্য দাঁড়াবে এই যে, সাধারণ অনভিজাত লোক, যাদেরমধ্যে উন্নতি ও জাগরণের শক্তি রয়েছে, তারা যদি ঈসা (আঃ)-এর সংস্পর্শে আসে ও তাঁর বাণী গ্রহণ করে জীবনযাপন করে তবে তাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে যাবে। ধূলি-ধূসরিত, সংসারাসক্ত, বস্তু-কেন্দ্রিক জীবনকে জলাঞ্জলি দিয়ে, তারা অধ্যাত্মিক আকাশের উচ্চমার্গে পাখির মত বিচরণ করতে সমর্থ হবে এবং প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটেছিল। ঘৃণিত, অবহেলিত গালিলীর জেলেরা, তাদের প্রভু ও গুরুর উপদেশ ও উদাহরণ অনুসরণের মাধ্যমে, পাখিরই মত উচ্চমার্গে আরোহণ করে, বণী-ইস্রায়ীল জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের তৌফিক লাভ করেছিল। অন্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তদের রোগমুক্তির বা উপশমদানের সম্বন্ধে বলা যায়, এ ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে বণী-ইস্রায়ীল জাতি অপবিত্র ও নোংরা জানে, এদেরকে সমাজের সংশ্রব থেকে দূরে রাখত; সমাজে ঘেঁষতে দিত না। ... ... *'আমি মুক্ত করে দিব'* কথাটির তাৎপর্য এই যে, এসব রোগাক্রান্ত লোকেরা আইনগত ও সমাজগতভাবে, অবহেলিতবস্থায় বহু বঞ্চনা ও অসুবিধার মধ্যে ঘৃণিত পরিবেশে বাস করত। ঈসা (আঃ) এসে তাদেরকে সেবা-যত্ন করার তাগিদ দিয়ে, সমাজে তাদেরকে স্থান দান করে, তাদেরকে দুর্বিসহ জীবন থেকে মুক্ত করেছিলেন। এও হতে পারে যে, ঈসা (আঃ) এসব রোগীকে সুস্থ করতেন। ... ... আল্লাহ্'র নবীগণ আধ্যাত্মিক চিকিৎসকবিশেষ; তারা আধ্যাত্মিক অন্ধদেরকে চক্ষুদান করেন, বধিরকে শ্রবণশক্তি দান করেন, আধ্যাত্মিক মৃতদেরকে জীবনদান করেন (মথি, ১৩ : ১৫)। ... ... *'আমি মৃতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করব'* বাক্যটির অর্থ এটা নয় যে, ঈসা (আঃ) মৃত ব্যক্তিকে সত্যিই জীবিত করেছিলেন। যারা প্রকৃতই মরে যায়, তারা পৃথিবীর বুকে কখনও পুনরুজ্জীবিত হয় না। এ ধরনের বিশ্বাস কোরআনের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত (২ : ২৯; ২৩ : ১০০-১০১; ২১ : ৯৬; ৩৯ : ৫১-৬০; ৪০ : ১২; ৪৫ : ২৭)। ... ... প্রকৃতপক্ষে, আধ্যাত্মিক পরিভাষা মতে, নবীগণ তাঁদের অনুসারীদের জীবনে যে বৈপ্লবিক ও অসাধারণ মহাপরিবর্তন আনেন, তাকেই বলা হয় 'মৃতকে জীবিত করা'। ... ... *'এবং তোমরা কি খাবে এবং তোমাদের ঘরে কি সঞ্চয় করবে'* বাক্যাংশটির সামগ্রিক অর্থ দাঁড়ায় ঃ ঈসা (আঃ) তাঁর শিষ্যদেরকে শিক্ষা দিবেন, দিনযাপনের জন্য তারা কি পরিমাণ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খরচ করবে এবং কি পরিমাণ তারা বাঁচাবে অর্থাৎ, পরকালে পাবার জন্য খরচ করবে। অন্যকথায়, ঈসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, তারা ন্যায়ভাবে যা উপার্জন করবে, তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করবে, এবং অবশিষ্ট অর্থ আল্লাহ্'র পথে খরচ করবে। আর

আগামীদিনের কথা আল্লাহ্'র উপর ছেড়ে দিবে (তুলিতব্য, মথি, ৬ : ২৫-২৬)।"

মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেব আলোচ্য আয়াতের বিস্তারিত আলোচনার পর আয়াতের ভাবার্থে বলেন,

"হযরত ঈসা (আঃ) যা যীশুখ্রিস্ট আল্লাহ্'র বাণী প্রাপ্ত হয়ে প্রথমেই ঘোষণা করেছিলেন যে, — 'হে ইস্রায়ীলকুল, তোমাদেরকে প্রকৃতিগত মূল উপাদান (তীন) হতে আবার তোমাদেরকে পূর্বের ন্যায় একটি মহাজাতিরূপে গঠনের চেষ্টা করব, এজন্য প্রথমে গঠন করব— জাতির কাল্‌বুদ্‌ মাত্রকে। তারপর সে কালবুদের মধ্যে স্বর্গীয় প্রেরণা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে জ্ঞানান্ধ সমাজকে দিব্য দৃষ্টিদানে— নানা জঘন্য ব্যভিচার ব্যধি-কলুষিত জাতিকে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে এক মুক্ত জীবন্ত ও উর্ধ্বগতি উন্নতমুখী জাতিতে পরিণত করে দেব। এবং আল্লাহ্'র অনুমতিক্রমে— মূর্খতা ও পাপাচারে যাদের জ্ঞান ও বিবেক মরে গেছে, যাদের হৃদয় সত্যের অনুভূতি শক্তি থেকে বঞ্চিত ও অসাড় হয়ে পড়েছে, তাদের মধ্যে মুক্ত জ্ঞানের ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার স্বর্গীয় প্রেরণা জাগ্রত করে আবার তাদেরকে ধর্মের হিসেবে জীবন্ত করে তুলব। আর পার্থিব জীবনের ভোগ ও পারলৌকিক জীবনের সঞ্চয় কি হবে তাও তোমাদের জ্ঞাত করব। এই মিশন ও এই সাধনা নিয়েই আমি তোমাদের প্রভুর সন্নিধান থেকে তোমাদের সমীপে প্রেরিত হয়েছি।"

অবশেষে, খ্রিস্টান প্রচারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় যে, যীশু যেসব জ্বরা, মৃত্যু এবং ব্যধিগ্রস্ত লোককে আরোগ্য দান করেছিলেন, তারা কেউই প্রকৃতপক্ষে দৈহিকভাবে রোগাক্রান্ত বা মৃত ছিল না; বরং পাপের ফলে আত্মিক দিকদিয়ে মৃত বা ব্যধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল বলে খোদ বাইবেলেই প্রমাণ রয়েছে, যেমন— যীশু এক পক্ষাঘাতকে আরোগ্য দান করে বললেন, *"তোমার পাপ ক্ষমা হলো।"* (মথি, ৯ : ২)। এখানে পাপমুক্ত হওয়ায় যে রোগ আরোগ্য হয়ে গেল তা আত্মিক ব্যাধি ছাড়া অন্য কিছু নয়। অন্য এক রোগীকে সুস্থ করে বললেন, *"দেখ তুমি সুস্থ হলে, আর পাপ করো না।"* (যোহন, ৫ : ১৪)। অর্থাৎ, পুনরায় পাপ করলে আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে হবে। এস্থলেও আত্মিক দিকদিয়ে সুস্থ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আত্মিক মৃত সম্বন্ধে শিষ্যদের মধ্যে আর একজন তাঁকে বললেন,

"প্রভু, প্রথমে আমার পিতাকে কবর দিয়ে আসতে অনুমতি দিন। কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন, আমার অনুসরণ কর; মৃতেরাই নিজেদের মৃতদের কবর দিক" (মথি, ৮ : ২১-২২)।

প্রকৃত মৃতদের দ্বারা অন্য মৃত ব্যক্তিদের কবর দেয়া কখনও সম্ভব নয়। কেবল আত্মিক মৃতদের দ্বারাই তা সম্ভব। এমন আত্মিক মৃতকে প্রত্যেক নবীই জীবিত করতে পারতেন। যেমন— পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আছে,

"হে বিশ্বাসীরা! আল্লাহ্ এবং রসুলের আহবানে সাড়া দাও, যখন তিনি আহবান করেন তোমাদেরকে জীবিত করার জন্যে। (৮ : ২৫)।

প্রকৃতকথা হলো, যীশুসহ আরও অনেকেই এসব কাজ করতে সক্ষম ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও সক্ষম হবেন বলে খোদ বাইবেলেই বলা হয়েছে, যেমন— এলিয় এক মহিলার মৃত পুত্রকে জীবিত করে তুলেছিলেন (১ রাজাবলী, ১৭ : ২১-২২)। ইলীশায় নামান নামীয় কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যদান করেছিলেন (২ রাজাবলী, ৫ : ১-১৪)। অন্যেরাও ভূত ছাড়াতে সক্ষম (মার্ক, ১৬ : ১৭) যীশুর ন্যায় অদ্ভুত কাজ আরও অনেকেই করতে পারে (মথি, ২১ : ২১) এমনকি যীশু থেকেও বড় কাজ অন্যেরা করতে পারে (যোহন, ১৪ : ২১)।

যীশুর খোদাত্বের আরও কিছু অসারতা

খ্রিস্টধর্ম প্রচারকেরা যীশুর খোদাত্বের প্রমাণস্বরূপ আরও যেসব দলিল পেশ করেন, সেগুলোর অসারতা বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করা হল :

পাপমোচন করার ক্ষমতা খোদাত্বের প্রমাণ নয়, অন্যেরাও পাপ মোচন করতে পারে (যোহন, ২০ : ২৩)। যীশু পিতায় এবং পিতা যীশুতে থাকা খোদাত্বের প্রমাণ নয়, কারণ অন্য লোকেরাও যীশুর ন্যায় খোদাতে থাকতে পারেন (যোহন, ১৭ : ২১)। যীশু ও খোদা এক, এ বাক্যও খোদাত্বের প্রমাণ নয়। অন্যের জন্যও এ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। (যোহন, ১৭ : ১১; আদি, ১ : ২৭)। এছাড়া, যীশু সর্বদাই খোদাত্বের কথা অস্বীকার করেছেন, বরং তিনি নিজেকে খোদার দাস, প্রেরিত, ভাববাদী, মনুষ্য-পুত্র এবং পবিত্র ব্যক্তি বলে পরিচয় দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপন করা হল :

যীশু মানুষ (মথি, ৯ : ৮)। যীশু মনুষ্য-পুত্র (মথি, ১২ : ৮; ১৩ : ৩৭)। যীশু খোদার প্রেরিত (মথি, ১০ : ৪০; যোহন, ৭ : ১৬; ১৭ : ৩)। যীশু ভাববাদী (মথি, ১৩ : ৫৭; ২১ : ১১)। যীশু পবিত্র ব্যক্তি (যোহন, ৬ : ৬৯)। যীশু খোদার দাস (প্রেরিত, ৩ : ১৩; ৪ : ২৭)। যীশু মানুষ ছিলেন, এজন্য খোদার নিকট প্রার্থনা করতেন (মথি, ২৭ : ৪৬)। যীশু দুর্বল মানুষ ছিলেন, এজন্য মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন (মার্ক, ১৪ : ৩৬)। যীশু খোদা নন, এ জন্য তিনি মানুষের পাপের বিচার করতে পারেন না (যোহন, ১২ : ৪৭-৫০)। যীশু নিজেকে খোদা থেকে পৃথক দেখিয়েছেন; যেমন– তিনি বলেন, "খোদাতে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর" (যোহন, ১৪ : ১)।

ত্রিত্ববাদ ও খোদার পুত্রত্বের ইতিহাস

খ্রিস্টের দু'হাজার বছর পূর্বে ব্যবিলন অঞ্চলে **'মরদুক'** বলে এক দেবতার কাহিনী পাওয়া যায়। **'মরদুক'** ছিলেন ব্যবিলনবাসী সর্বেশ্বরবাদীদের সূর্য-দেবতা। খ্রিস্টপূর্ব ১৯৫০ অব্দে ব্যবিলনের রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের পর 'মরদুক' প্রাচ্যের প্রধানতম সেমাইটদের দেবতার মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়। খালদীন ও ব্যবিলনবাসীরা মরদূককে খোদার প্রিয় পুত্র মনে করত। তারা এই দেবতার প্রতি যেসকল গুণাবলী আরোপ করেছিল, যীশুর প্রতিও খ্রিস্টানরা সেই সমস্ত গুণাবলী আরোপ করেছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। আরব, ইরান, সিরিয়া এবং মিশরের মুশরেকরা বৌদ্ধমত ও সূর্য পূজার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল এবং তারাই যীশুর প্রতিও ঐ সকল গুণাবলী আরোপ করেছিল। এদিক থেকেও খ্রিস্টানরা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। যীশু নিজেকে একজন 'মানুষ'-এর অতিরিক্ত করে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হননি। পৌত্তলিকরা এবং অগ্নি-পূজকরাই তাঁকে খোদার পুত্র বলে আখ্যায়িত করেছে। ফলে, মুসা (আঃ) এবং বনি-ইস্রায়ীল পয়গম্বরদের দ্বারা প্রবর্তিত ধর্মের শিক্ষাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাঁর অব্যবহিত পরেই তাঁর দেয়া শিক্ষাও জটিল হয়ে ওঠে, যারফলে জন্ম নেয় খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদ। যা অজস্র রক্তপাতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যীশুর উপরে এ ধরনের মিথ্যা কল্পনারোপের ব্যাপারে 'মিথ্‌রা' মতবাদই খ্রিস্টানদেরকে সর্বাপেক্ষা বেশি বিপথগামী করেছে বলে মনে হয়। খ্রিস্টপূর্ব পাঁচশ' অব্দে পারস্যে এই মতবাদ প্রচলিত ছিল। মিথরার জন্ম হয় একটি পর্বতগুহায়। জন্মের তারিখটি ২৫শে ডিসেম্বর বলে মনে করা হয়। একজন কুমারীই তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তাঁর বারোজন সাগরেদ ছিলেন। তিনি বহু দেশদর্শী ছিলেন। মানবতার সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গীত হয়েছিল, তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন, কবরস্থ হয়েছিলেন, আবার বেঁচেও উঠেছিলেন। তাঁর পুনরুত্থানকে বিপুলভাবে অভিনন্দিতও করা হয়েছিল। এ সকল কথাই মিথরা সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস এবং তা যীশু সম্পর্কে তৈরি খ্রিস্টানদের কাহিনীর সাথে হুবহু মিলে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, সাধু পৌল মহাশয়ই নাকি এ-সকল ক্রিয়াকাণ্ডের মূলনায়ক। তাঁর অপব্যাখ্যাই যীশুখ্রিস্টকে এত বিকৃতরূপে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপিত করেছে। পক্ষান্তরে, সাধু পিতর, যিনি যীশুখ্রিস্টের একান্ত শিষ্য ছিলেন, তাঁর দ্বারা এসবকিছুই হয়নি।

মূলত, খ্রিস্টান ব্যাখ্যাকাররা পৌত্তলিকদের প্রীত করতে একদিকে যেমন হযরত যীশুর প্রচারিত তৌহিদীবাদকে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হওয়া আল্লাহ্‌র

কেতাব ইঞ্জিলকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে বসলেন, অপরদিকে পৌল নামক ধুরন্ধরের খপ্পরে পড়ে তার আনীত গ্রীক ও পার্সীক দর্শনের সংমিশ্রণে এক অভিনব উদ্ভট ধর্মকে খ্রিস্টানধর্মের নামানুকরণে চালিয়ে দেন। ফলে, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জুলুম করা হয়েছে হযরত যীশুর নবী-জীবনের মহিমার উপর। ইঞ্জিলগুলোতে নানাপ্রকার ভিত্তিহীন গল্প-গুজবের সমাবেশ ঘটিয়ে তা করা হয়েছে।

যীশুকে খোদা বলে প্রতিপন্ন করার জন্য সাধু পৌলের যুগ থেকেই খ্রিস্টান-ধর্মের প্রধান প্রবর্তকেরা আল্লাহ্র নামে মিথ্যা রচনা করেন এবং অন্যান্যপ্রকারে ধর্মশাস্ত্রের বিকার ঘটাচ্ছেন। এ শ্রেণীর জাল ও প্রবঞ্চনা তাঁদের পরিভাষায় "Pious fraud" বা সাধু প্রবঞ্চনা বলে কথিত হয়ে থাকে। প্রাথমিক যুগের খ্রিস্টান সাধুরা এ জাল জুয়াচুরির কথা সগৌরবে স্বীকার করে গেছেন। সাধু পৌল বলেছেন, "কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি খোদার সত্যনিষ্ঠতা তাঁর মহিমার উদ্দেশ্যে উৎকর্ষ লাভ করে, তবে পাপী বলে আমার বিচার হয় কেন?" (রোমীয়, ৩ : ৭)। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খ্রিস্টান পাদ্রী পুরোহিতদের এ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অনাচারও যে কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রচলিত হয়ে এসেছে, পাশ্চাত্য জগতের বহু খ্রিস্টান লেখকের লেখায় এর বিস্তারিত বিবরণ এখন দুনিয়াময় প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু এখন থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআন তাদের এই জাল-জুয়াচুরির কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছে।

এ শ্রেণীর জাল-জুয়াচুরি এবং শাব্দিক ও আর্থিক বিকার সাধন করার পর তারা দুনিয়াকে বুঝাচ্ছে, যীশুকে খোদা বলে বিশ্বাস করতে হবে, স্বয়ং যীশুই এ আদেশ প্রদান করেছেন। পবিত্র কোরআনের ৩:৭৮ আয়াতে মানুষের সাধারণ জ্ঞান-বিবেকের দিকথেকে এ দাবীর প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, যীশু মানুষ ছিলেন, তাঁর খোদাত্ব তোমাদের মিথ্যা রচনা। একজন মানুষকে আল্লাহ্ নিজের "বাণী" প্রদান করলেন, সেই বাণীকে সম্পূর্ণভাবে প্রাণগত করার উপযোগী প্রজ্ঞাও তাঁকে দিলেন, আর সাথে সাথে নবুয়তের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁকে আদেশ করলেন সেই বাণীকে ইস্রায়ীল-কুলের কাছে পৌঁছাতে। এমন সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার পরও কোন মানুষ নিজের প্রজ্ঞা ও আল্লাহ্র বাণীর বিপরীত এ ধরনের কথা কখনোই বলতে পারেন না যে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে মানুষ তাঁর পূজা করবে। এমনকথা বলা তাঁর পক্ষে অসঙ্গত এবং শোভনীয় নয়। ফলতঃ হযরত ঈসা (আঃ) বা যীশুর পক্ষে ঐ ধরনের কথা বলা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। প্রচলিত বাইবেলে তোমাদের উক্তির অনুকূল কিছু থাকলে তা তোমাদের নিষ্ঠুর "ধার্মিক জালিয়াতি" ছাড়া অন্য কিছু নয়।

একটি ভ্রান্তির অপনোদন প্রয়োজন ঃ

ইজ্ কালাতিল মালাঈকাতু ইয়া মারইয়ামু ইন্নাল্লাহা উ বাশিরুকী বি কালিমাতিম মিনহু— ইসমুহুল মাসীহু ঈসা ইবনু মারইয়ামা অর্থাৎ অন্য ফেরেশতারা যখন বলেছিল : হে মরিয়ম! আল্লাহ্ তোমাকে নিজ সন্নিধানের একটি কলেমা সম্বন্ধে সংবাদ দিচ্ছেন : তাঁর নাম আল্ মসীহ্ ইসা ইবনু মরিয়ম।

খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকরা পবিত্র কোরআনের উপরোদ্ধৃত (৩ : ৪৫) আয়াতের কলেমা শব্দ দ্বারা মুসলমানদের বুঝাতে চান যে, কোরআনও যীশুর অনাদিস্বরূপ ও খোদাত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু 'কলেমা' শব্দের অর্থ বাক্য। এটা আরবি ভাষার একটি ইডিয়ম, অর্থ—সংবাদ বা সন্দেশ। ইমাম রাগিব বলেছেন, ফরমান বা decree মাত্রকেই কলেমা বলা হয়— তা সে বাক্যতঃ হোক আর কার্যত হোক। হযরত ঈসার জন্ম সম্বন্ধে আল্লাহ্র যে ফরমান, ফয়সালা, নির্দেশ বা decree পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল ৩ : ৪৫ আয়াতে সাধ্বী মরিয়মকে সেই ফরমানের সংবাদ দেয়া হয়েছে।

কিন্তু, খ্রিস্টান পণ্ডিত-পুরোহিতরা নানাবিকার ও বিপ্লবের পর পবিত্র কোরআনের ৩ : ৪৫ আয়াতের 'কলেমা' শব্দকে যীশুর 'অনাদিস্বরূপ' অর্থে গ্রহণ করেছেন। কলেমার প্রতিশব্দরূপে বাইবেলের গ্রীক অনুবাদে Logos শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাইবেল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ও নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও স্বীকার করেছেন যে, গ্রীক দার্শনিক Heraclituse ও Philo প্রভৃতির অনুকরণ করে যীশুর পরবর্তী খ্রিস্টানরা, বিশেষতঃ যোহন খ্রিস্টানধর্মে এ মতবাদটি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ একে Christinising of the Logos conception বলে উল্লেখ করতেও কুণ্ঠিত হননি। এ Logos সম্বন্ধে Encyclopaedia Biblica'-এর লেখক J.G, Adolf D. D. 'Art. Logos'— এ বলেন ঃ

> চতুর্থ সুসমাচারের প্রস্তাবনা অংশ ছাড়া বাইবেলে উল্লিখিত আচার-আচরণের কোন বৈচিত্র্য নেই; এ থেকে কেবল কোন বাক্য বা কোন ধারণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দের জটিলতাকেই বুঝায়। 'the logos of God' পূর্ণাঙ্গ সুসমাচারকেই বলা যায়, অথবা আরও সহজ করে বললে বলতে হয় "বিমূর্ত স্বর" (The logos)।

প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক আরও বলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মত সুদূর অতীতেও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা 'ঐশ্বরিক' সুসমাচারের ঐতিহাসিক বর্ণনার প্রসঙ্গের চেয়ে তার দার্শনিক উপাদানের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন। আর বর্তমান লেখক 'বিমূর্ত বাণীর' বিষয়টিকে এভাবে প্রকাশ

করার সুযোগ গ্রহণ করায় বিষয়টি খ্রিস্টধর্মের প্রতি বিপদের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

খ্রিস্টান পণ্ডিতরা এভাবে কলেমা বা বাক্য শব্দের যে বিকৃত অনুবাদ করেছেন এবং গ্রীক দার্শনিকদের অনুকরণ করে যোহন এ অনুবাদে যেমন অন্যায়ভাবে যীশুকে ঈশ্বররূপে প্রবেশ করিয়েছেন, পূর্বোক্ত উদ্ধৃতাংশ থেকে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু, এসব জানা সত্ত্বেও খ্রিস্টধর্ম প্রচারকগণ আলোচ্য কলেমা শব্দকে অবলম্বন করে বলতে চান যে, কোরআনও যীশুর অনাদি ও ঈশ্বরত্ব বা খোদাত্ব হওয়ার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। তাই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দেয়ার জন্য এ অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হল। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের ৩ : ৪৫ আয়াতে 'কলেমা' শব্দ ব্যবহার করে যোহন প্রভৃতির প্রবর্তিত বিকারের মূল ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ভাষায় তার প্রতিবাদ জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যীশু শাশ্বত ও স্বয়ম্প্রকাশ নন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র নির্দেশ অনুসারে, অন্যান্য মানুষের মত তাঁকেও জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে।

পরিশেষ ঃ 'ত্রিত্ববাদ' এবং যীশুখ্রিস্টকে খোদার পুত্র খোদা বলার খ্রিস্টানদের কল্প-কাহিনী সম্বন্ধে 'ত্রিত্ববাদ ও যীশু' আখ্যায় এই অধ্যায়ে যা আলোচিত হয়েছে, তা পবিত্র কোরআনের সেইসব আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ, বলা হয়েছে :

> "তারা নিশ্চয় (যীশুর শিক্ষায়) অবিশ্বাসী, যারা বলে, 'আল্লাহ্ হলেন তিনের মধ্যে তৃতীয়, অথচ আর কোন খোদাই নেই একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া।" —(৫ : ৭৪)
>
> "নিশ্চয় তারা (প্রকৃত খোদায়) অবিশ্বাসী, যারা বলে মরিয়ম-পুত্র মসীহ্ই খোদা; অথচ মসীহ্ বলেছিলেন, হে বনি-ইস্রায়ীল! উপাসনা কর আল্লাহ্'র যিনি আমার ও তোমাদের প্রভু।" —(৫ : ৭৩)
>
> "এবং তারা বলে আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন, অথচ পবিত্র তিনি এথেকে।" —(২ ঃ ১১৭)
>
> "নিশ্চয় যীশুর দৃষ্টান্ত আল্লাহ্র নিকট আদমের দৃষ্টান্তস্বরূপ।" (৩ : ৬০)

যীশু কি আদৌ ক্রুশে নিহত হয়েছিলেন ঃ রক্ষণশীল খ্রিস্টান চার্চগুলো অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে সাধু পৌলের যুগ থেকে প্রচার করে আসছে যে, 'যীশুখ্রিস্ট ক্রুশে নিহত হয়েছিলেন'। কেননা, ক্রুশে নিহত করতে না পারলে তাঁর দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত পাপীর প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যাওয়ার চমকপ্রদ তত্ত্বটি অর্থাৎ সাধু প্রতারণাটা একেবারে পণ্ড হয়ে যায়; অন্যদিকে, ইহুদীদের দায়ুদের

সিংহাসন অধিকারের রাজনৈতিক প্রলোভনটিও মাঠে মারা যায়। সেক্ষেত্রে, যীশুর ক্রুশে নিহত হওয়ার কাহিনীটি শুধু খ্রিস্টানদের কাছেই নয়, ইহুদীদের কাছেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এছাড়া, বিষয়টি এখন মুসলমানদের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। কেননা, ইহুদীরা দাবী করে, যীশুকে তারা ক্রুশে নিহত করে মিথ্যেবাদী ও অভিশপ্ত প্রমাণ করেছে।

পক্ষান্তরে, খ্রিস্টানরা এ বিষয়ে একমত হয়েও এক বিশেষ মতভেদ রাখে যে, যীশু তাঁর অনুসারীদের যাবতীয় পাপের বোঝা নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করে তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ক্রুশে আত্মোৎসর্গ করেছেন। কিন্তু মুসলমানদের পবিত্র কোরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছে ঃ

> *"এবং তাদের এ কথা বলার কারণে, 'আমরা আল্লাহ্'র রসূল মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহ্কে হত্যা করেছি, অথচ তারা তাঁকে হত্যা করেনি, ক্রুশে বিদ্ধ করেও নিহত করেনি; কিন্তু তাদের নিকট তদ্রূপ সদৃশই করা হয়েছিল; আর নিশ্চয় যারা তার সম্বন্ধে মতভেদ করে তারা সন্দেহে অভিভূত, এ সম্বন্ধে তাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই, আছে শুধু অনুমানের অনুসরণ এবং তারা তাকে নিশ্চিতভাবে হত্যা করতে পারেনি। বরং, আল্লাহ্ তাঁকে নিজের দিকে উন্নীত করেছেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। এবং আহলে কিতাব (ইহুদী ও খ্রিস্টান)-দের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে নিজ মৃত্যুর পূর্বে তাতে বিশ্বাস না রাখে, অথচ কিয়ামতের দিনে সে (ঈসা) তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবেন।"* (সূরা নিসা, ১৫৭-১৫৯ আয়াত)।

প্রকৃতপক্ষে, ইহুদী ও খ্রিস্টান জাতির সমবেত দাবির বিরুদ্ধে পবিত্র কোরআন দৃঢ় ও স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করছে,

> "ইহুদী ও খ্রিস্টান জাতি যীশুর অভিশপ্ত মৃত্যু এবং প্রায়শ্চিত্তবাদ সম্বন্ধে যে-সব কল্পকাহিনী প্রচার করে আসছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে, যীশুকে তারা ক্রুশে দিয়ে অথবা অন্য কোনপ্রকারেও হত্যা করতে পারেনি। বরং, আল্লাহ্ তাঁকে স্বীয় পরাক্রম দ্বারা অভিশপ্ত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং নবীসুলভ সম্মানজনক ঊর্ধ্বগতি দান করেছেন। কিন্তু, আহলে কিতাবধারী ইহুদী ও খ্রিস্টানরা যীশুকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই ক্রুশে নিহত কল্পনা করে যে মতভেদ করেছে, তার ভুল কিয়ামতের দিনে তারা বুঝতে পারবে। যেসব ইহুদী যীশুকে অভিশপ্ত কল্পনা করে ইহজগত ত্যাগ করবে তারা নিজে অভিশপ্ত হওয়ার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে নিজ ভুল

বুঝবে এবং যেসব খ্রিস্টান যীশুকে ত্রাণকর্তা মেনে অবাধে সকল পাপ করে গেছে বা করবে তারা নিজ নিজ কর্মের জবাবদিহি ও ফলভোগের মধ্যে নিজ ভুল উপলব্ধি করবে। এভাবে উভয় জাতির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন যীশু সাক্ষী হবেন।

যীশুখ্রিস্টের আগমনের কারণ ঃ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যত নবী-রসূল আল্লাহ্'র তরফ থেকে দুনিয়ায় প্রেরিত হন, তাঁদের প্রত্যেকেরই নবুয়তের মিশন ও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমসাময়িক পরিস্থিতি অনুসারে এক একটি ভৌগোলিক সীমারেখাও নির্ধারিত হয়েছিল।

এভাবে হযরত মুসা (আঃ) এসেছিলেন ইহুদী জাতিকে মিসর-রাজ ফেরাউনের শোচনীয় দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে উদ্ধার করে তাদের পুরানো আবাসভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিতে। কিন্তু হযরত মুসা (আঃ) ও তাঁর সহকারী হযরত হারুন (আঃ) এবং ইস্রায়ীলবংশীয় অন্যান্য নবীদের সাধনা নানাকারণে পূর্ণসিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হয়।

এ অবস্থায়, অজ্ঞাতকারণে এবং নিতান্ত অজ্ঞাত স্থানে হযরত মুসা (আঃ)-এর মৃত্যু হয়। কালক্রমে ইহুদী জাতির নিজ কর্মফলে তাদের জাতীয় জীবন বিভিন্ন পাপে-তাপে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তাঁদের পবিত্র ধর্মস্থান জেরুজালেম পর্যন্ত পরজাতির দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে; পুনঃপুনঃ তাঁদের ধর্মশাস্ত্রগুলো ভস্মীভূত করা হয়। যে কারণে বনি-ইস্রায়ীল জাতি আবার যে গোলামের জাতি, সেই গোলামের জাতিতেই পরিণত হয়ে পড়ে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, হযরত ইয়াকুব (আঃ) বা ইস্রায়ীল (আঃ)-এর বারোজন পুত্র-সন্তান ছিল। এই বারোজন পুত্রের সন্তানেরা বারোটি গোত্রে বিভক্ত হয়ে পরবর্তীকালে 'ইস্রায়ীলের দ্বাদশ গোত্র' নামে পরিচিত হয়। এরা ব্যাবিল-রাজ নাবুকদ্ নাসর (Nebuched-nezzer) কর্তৃক বারবার আক্রান্ত হয়ে অবশেষে খ্রিঃ পূঃ ৫৮৬ সালে বন্দী ও বিতাড়িত হয়ে ব্যাবিলনে আনীত হয় এবং সেখানে তারা নাবুকদ্ নাসর ও তার বংশধরদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয় (২১ বংশাবলী, ৩৬ : ২০)। তারপর সাইরাস (Cyrus) রাজ ব্যাবিলন দখল করলে তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁদের দু'টি গোত্র, ফিলিস্তিনে গিয়ে পুনরায় বসবাস শুরু করে এবং পরে পারস্য-রাজ দারিয়ুস (Darius) ব্যাবিলন দখল করলে এবং তাঁর রাজ্য ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হলে বনি-ইস্রায়ীলের অপরাপর দশটি গোত্র নাসিবিনের পথধরে পারস্যের উপর দিয়ে আফগানিস্তান, লাদ্দাখ, তিব্বত, কাশ্মীর ও মধ্যভারতে চলে আসে এবং সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু

করে। Apocrypha থেকে জানা যায়, তারা কখনো তাদের দেশে প্রত্যাবর্তন করেনি (2 Esdres, 13 : 29-36)। আল্লাহ্‌তা'য়ালা বনি-ইস্রায়ীলের এই হারানো গোত্রগুলোকে একত্র এবং পুনরায় সংহত করার জন্যে এবং তৌরাতের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করার প্রধান উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আঃ) বা যীশুকে প্রেরণ করেন ফিলিস্তিনে—বনি-ইস্রায়ীলের মাত্র দুটো গোত্রের মধ্যে। তাই যীশু বলতেন,

"আমার আরও মেষ আছে, সে সকল এ খোয়াড়ের নয়, তাদেরকে আমার আনতে হবে এবং তারা আমার কথা শুনবে, তাতে এক পাল ও এক পালক হবে (যোহন, ১০ : ১৬)।

তিনি আরও বলতেন, "আমাকে অন্যান্য নগরেও ঈশ্বর-রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে, কারণ সে জন্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।" (লুক, ৪ : ৪৩)।

বাইবেল পাঠান্তে জানা যায়, যীশু কোন নতুন ধর্মমত আনেননি, মোশির বিধি-ব্যবস্থার কোনপ্রকার পরিবর্তন ঘটাতেও তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কেননা, তিনি বলতেন,

"মনে করো না যে, আমি বিধি-ব্যবস্থা অথবা নবীদের আনীত গ্রন্থ বিলুপ্ত করতে এসেছি; আমি তাকে লোপ করতে আসিনি, বরং তাকে পরিপূর্ণ করতে এসেছি।" (মথি, ৫ : ১৭)

যীশু যে বনি-ইস্রায়ীল ছাড়া অন্য কোন জাতির নিকট প্রেরিত হননি, সে সম্বন্ধে বাইবেল বলে—

"আর সে স্থান ছেড়ে যীশু সোর ও সীদোন অঞ্চলে চলে গেলেন। আর সেই অঞ্চলের একজন কেনানীয় মহিলা এসে চিৎকার করে তাঁকে বলল, 'প্রভু, দায়ুদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, আমার কন্যাটি নিদারুণভাবে মন্দ-আত্মা-বিষ্ট হয়েছে'।

কিন্তু, তিনি তাকে কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁর শিষ্যেরা নিকটে এসে তাঁকে অনুরোধ করে বলেন, 'মহিলাটিকে বিদায় করুন, কারণ সে চিৎকার করতে করতে আমাদের পিছু পিছু এসেছে। তিনি উত্তরে বললেন, 'ইস্রায়ীল-কুলের হারানো মেষ ছাড়া আর কারও নিকট আমি প্রেরিত হইনি'। মহিলাটি কিন্তু এসে, তাঁকে প্রাণিপাত করে বলল, 'প্রভু, আমায় সাহায্য করুন'। তিনি উত্তরে বললেন, 'সন্তানদের খাদ্য নিয়ে কুকুরের কাছে ফেলে দেয়া সঙ্গত নয়।" (মথি ১৫ : ২১-২৬)।

অন্য এক কারণে যীশু শিষ্যদেরকে সাবধান করে বললেন,

"পবিত্র বস্তু কুকুরকে দিয়ো না; তোমাদের মুক্তা শুকুরের সামনে ছড়িয়ো না ... ।" (মথি, ৭ : ৬) ।

বাইবেলের এসব সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, মোশির বা অন্যান্য ভাববাদীদের প্রবর্তিত বিধি-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন কিংবা ইহুদী ব্যতীত অন্য কোন লোক-সমাজের কাছে ধর্ম প্রচার করার কোন সংকল্প যীশুর ছিল না । ইস্রায়ীল-বংশের হারানো গোত্র দশটির উদ্ধার করাই ছিল তাঁর নবী-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ।

যিশুর বিরুদ্ধে ইহুদীদের আন্দোলন ঃ ইহুদীরা যখন তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত একজন ত্রাণকর্তা, 'মসীহ্'র অপেক্ষা করছিল, ঠিক তখনই যীশু আবির্ভূত হয়ে ঘোষণা করলেন, বনি-ইস্রায়ীলের হারানো গোত্রগুলোকে একত্রিত ও পুনঃসংহৃত করার প্রধান উদ্দেশ্যে আল্লাহ্তায়ালা তাঁকে মনোনীত করেছেন । কিন্তু, এই ঘোষণায় স্থানীয় ইহুদীদের কয়েকজন লোক ছাড়া কেউ তাঁকে বিশ্বাস করলো না; বরং তাঁর বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হল । কারণ, তাঁরা বিশ্বাস করতো যে, মালাকী নবী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত 'মসীহ্'র আবির্ভাব হবে ইলিয়াস (ইদ্রিস) নবী (আঃ)-এর আগমনের পরে (মালাকী ৪:৫) তাওরাতের বর্ণনানুযায়ী ইলিয়াস নবী (আঃ) রথযোগে জীবিতাবস্থায় আকাশে উড়ে গেছেন (২ রাজাবালী, ২ : ১১) । সুতরাং, আকাশ থেকে যখন তাঁর পুনরাগমন হয়নি, তখন প্রতিশ্রুত মসীহ্ও আসতে পারেন না । কিন্তু, যীশু তাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, আকাশ থেকে নবী নেমে আসা অসম্ভব, এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা । বরং তোমরা যদি গ্রহণ করতে সম্মত হও তবে জানবে যে যোহন বা ইয়াহইয়া নবীই 'এলিয়' (মথি, ১১ : ১৪) কারণ, ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, "তিনি এলিয়'র আধ্যাত্মিকতা ও শক্তি নিয়ে মসীহ্'র পূর্বে আগমন করবেন" (লূক, ১ : ১৭) কিন্তু ইহুদীরা যীশুর এ ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেনি । তাদের ধারণায় 'এলিয়' স্বয়ং আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন, অন্যকোন ব্যক্তি এলিয়ের রূপ ধরে বা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আসবে না । সুতরাং, মরিয়ম-পুত্র একজন প্রতারক এবং ভ্রান্তপথ প্রদর্শনকারী ।

পক্ষান্তরে, যীশু ঐ ব্যাখ্যার সাথে এই বাণীও প্রচার করতে থাকেন যে, স্বর্গ-রাজ্য (Kingdom Of God) প্রতিষ্ঠার জন্যেই তিনি প্রেরিত হন । সেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার সবারই রয়েছে । ফলে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক লোক যীশুর অনুগামী হতে থাকে । আর বিপথগামী বকধর্মীয় দল যীশুর বাণীর অপব্যাখ্যায় মেতে উঠে । পরিশেষে, যীশুর সাথে তর্কে পেরে না উঠে তারা নিজেদের মধ্যে

যীশু-বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। তারা প্রচার করতে থাকে যে, যীশু ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্রগুলোর নিন্দে করেন, জেরুজালেমের ধর্ম-মন্দির ভেঙ্গে তিনদিনে তা পুনঃর্নির্মাণ করে দিতে পারেন; এরূপ উক্তি তিনি করে থাকেন। খোদার পুত্র এবং ইহুদীদের রাজা হওয়ার দাবীও তিনি করে থাকেন, ইত্যাদি।

ইহুদী আলেমরা কিছুকাল ধরে নিজেদের মধ্যে এ আন্দোলন চালানোর পরে প্রথমত নিজেরাই যীশুকে হত্যা করার চেষ্টা করে (যোহন, ৫ : ১৮)। কিন্তু যীশুর সমর্থক ও আইনের ভয়ে যখন তারা তাঁকে হত্যা করতে অসমর্থ হয় (মথি, ২১ : ৪৬) তখন তারা বিভিন্ন ফেরকার আলেমদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করে (মথি, ২৭:১) তারপর আঞ্চলিক শাসনকর্তা পীলাতের কাছে এ ধরনের অভিযোগ পেশ করতে থাকে যে—

(১) যীশু রাজদ্রোহী, নিজেকে তিনি ইহুদীদের রাজা বলে ঘোষণা করেন, রাজকর দিতে লোকদের নিষেধ করেন;

(২) ধর্ম হিসেবে তিনি একজন ফাছক (Corruptor), ইহুদীদের পবিত্র ধর্ম মন্দির সম্বন্ধে অবৈধ আক্রমণ করতে এবং নিজেকে খোদার পুত্র বলে ঘোষণা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না, ইত্যাদি। এসব অপরাধের জন্য তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে নিহত করা হোক। কিন্তু পীলাত যীশুকে গ্রেফতার করার আদেশ না দেয়ায়, একদিন ইহুদী প্রধানরাই অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যীশুর বাসস্থান আক্রমণপূর্বক তাঁকে ধরে নিয়ে পীলাতের আদালতে উপস্থিত করে, যাতে রাজ-দরবারের বিচারে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে নিহত করা যায়।

কিন্তু 'যীশু ক্রুশে নিহত হয়েছিলেন'— রক্ষণশীল খ্রিস্টানচার্চগুলোর এই বুনিয়াদি প্রচারণাটি যে উদ্দেশ্যমূলক এবং কল্পিত উপাখ্যান ব্যতীত আর কিছুই নয় পরবর্তী আলোচনাক্রমে তা জানা যাবে।

বাইবেলের সাক্ষ্য অনুযায়ী যীশু ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেননি ঃ

যাঁরা বাইবেল পাঠ করেছেন তাঁরা অবগত আছেন যে, সুসমাচার রচয়িতারা যীশুর জীবনেতিহাস সংকলনের সময় তাঁর কার্যকলাপের সমর্থনের জন্য মোশির ব্যবস্থা বা পুরাতন নিয়মের অনেক উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এই পুরাতন নিয়মে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে ঃ

"এবং যদি কোন ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য পাপ করে আর তার প্রাণদণ্ড হয়, আর তুমি তাকে গাছে (ক্রুশে) টাঙ্গিয়ে দেও, তবে তার শব রাতে গাছের (ক্রুশের) উপর থাকতে দেবে না, পরন্তু সেদিনই তুমি তাকে কবর দেবে, কেননা যে ব্যক্তিকে (কাষ্ঠে) টাঙ্গানো হয় সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যে ভূমিকে তোমার

উত্তরাধিকার সূত্রে দান করেছেন; তুমি তাকে অশুচি করবে না।"
(দ্বিতীয় বিবরণ, ২১ : ২২-২৩)।

উদ্ধৃত পদ দুটোর অনুবাদে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বেশ কিছুটা কারচুপি করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তাই প্রকৃত তাৎপর্যটি বুঝিয়ে দেবার জন্য বন্ধনীর মধ্যে "ক্রুশ" এবং "কাষ্ঠে" শব্দ দুটো বাড়িয়ে দেয়া হল।

কারণ, আরবি বাইবেলে এ শব্দ দুটো রয়েছে। আরবি অনুবাদে '*খাছীবুহু*' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার আভিধানিক অর্থ, কাষ্ঠনির্মিত কোন পদার্থ। ইস্রায়ীলীদের ধর্মীয় পরিভাষায় এর অর্থ 'ছালীব' বা ক্রুশ-কাষ্ঠ। একজন বিখ্যাত খ্রিস্টান অভিধানকার বলেছেন,

> "যে মহিমান্বিত কাঠের উপর প্রভু যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশে দেয়া হয়, তাকে (আরবিতে) ছালীব বলা হয়, কিন্তু আমাদের পরিভাষায় মাছলুব বলতে প্রভু ঈসা মসীহকে বুঝিয়ে থাকে।" (আকরাবুল-মাওয়ারিদ)।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, ক্রুশ-কাষ্ঠের উপর যাদের মৃত্যু হয়, তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই আল্লাহ্ কর্তৃক অভিশপ্তরূপে পরিগণিত হয়। এমনকি তার মৃতদেহকে এমন অশুচি বলে গণ্য করা হয় যে, তার সংশ্রবে বনি-ইস্রায়ীলের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পবিত্র ভূমিগুলো পর্যন্ত কলুষিত হয়ে যায়। অথচ, খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকরা সমবেতকণ্ঠে ঘোষণা করে আসছেন যে, যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশে দিয়ে নিহত করা হয়েছিল। কারণ, তা না হলে খ্রিস্ট-ধর্মের মূল ভিত্তিটিই স্বতঃসিদ্ধরূপে ও সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ হয়ে যায়। কিন্তু এ রকম তথ্যের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের হয় স্বীকার করতে হবে যে, ক্রুশে মৃত্যু হওয়ায় যীশু আল্লাহ্'র নির্দেশমতে অভিশপ্ত ও অশুচি হয়েছেন; না হয় বলতে হবে যে, যীশু ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করেননি। প্রথমাবস্থায় তাদের বর্ণিত যীশুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য একেবারে নস্যাৎ হয়ে যায়, দ্বিতীয়াবস্থায় বাইবেলের সামগ্রিক বর্ণনাগুলোই মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন হয়।

এখন, যীশু যে আদৌ ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেননি, তার কয়েকটি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে—

১। ধর্মগুরু ও ফরীশীরা যখন যীশুকে তাঁর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ কোন একটি মোজেযার দাবী করেছিল, তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তার ক্ষেত্রে যোনা ভাববাদীর নিদর্শন দেখানো হবে। যেমন, 'ক'জন ধর্মগুরু ও ফরীশী তাঁকে বললেন, গুরু, আমরা আপনার প্রদর্শিত একটি লক্ষণ দেখতে চাই। তিনি উত্তরে তাঁদের বললেন, "এ যুগের দুষ্ট ও ভ্রষ্টচারী লোকেরা লক্ষণের

অন্বেষণ করে, কিন্তু ভাববাদী যোনার লক্ষণ ছাড়া আর কোন লক্ষণ এদের নিকট প্রদর্শিত হবে না। কারণ, 'যোনা যেমন তিনদিন-তিনরাত্রি তিমি মাছের উদরে ছিলেন', মনুষ্যপুত্রও তেমনি তিনদিন-তিনরাত্রি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকবেন।" (মথি, ১২ : ৩৮-৪০)।

লুক লিখিত সুসমাচারেও অনুরূপই বর্ণিত রয়েছে, উপরন্তু সেখানে বলা হয়েছে, "এ যুগের লোকেরা দুষ্ট, এরা লক্ষণের অন্বেষণ করে, কিন্তু যোনার লক্ষণ ছাড়া দৃশ্য কোন লক্ষণই এদের দেয়া যাবে না। কারণ, যোনা যেমন নীনবাসীদের নিকট লক্ষণস্বরূপ হয়েছিলেন, মনুষ্য-পুত্রও এ যুগের লোকদের নিকট সেরূপ হবেন।" (১১ : ২৯-৩০)।

মথি ও লুক লিখিত সুসমাচার এবং বাইবেলে সন্নিবেশিত "যোনা ভাববাদীর পুস্তক" নামে আর একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক থেকে জানা যায় যে,

(১) যোনা ভাববাদী বা ইউনুস (আঃ) নবী তিনদিন-তিনরাত্রি একটি তিমি মাছের উদরে অবস্থান করেছিলেন।

(২) মাছটি তাঁকে তার জীবিতাবস্থায় গ্রাস করেছিল এবং তিনদিন-তিনরাত্রি জীবন্ত ও সম্পূর্ণ সচেতন অবস্থায় তাঁকে তার উদরে রেখেছিল।

(৩) মাছের উদরে অবস্থানকালে যোনা ভাববাদী নিজের মুক্তির জন্য সদাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন এবং সদাপ্রভু তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন।

(৪) অবশেষে মাছটি তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্ববলাবস্থায় সমুদ্রের কিনারায় উগড়ে দিয়েছিল। অতঃপর তিনি নিজের নবুওয়াতের মিশন সম্পূর্ণ করার জন্য নি'নিবা অঞ্চলে যান এবং তাঁর দীর্ঘকালের সাধনা ও প্রার্থনার ফলে ঐ জনপদটি ও তার অধিবাসীরা আশু বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং তাদের মধ্যে সত্যিকারের ধর্মীয় জীবন ফিরে আসে।

তাই বলা যায়, যোনা ভাববাদী যেমন তাঁর পরীক্ষাকালে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং কখনও প্রাণত্যাগ করেননি,

তেমনি যীশুও তাঁর পরীক্ষাকালে বেঁচেছিলেন এবং একমুহূর্তের জন্যও প্রাণত্যাগ করেননি। তাছাড়া, যোনা ভাববাদীকে যেরূপ চিহ্ন দেয়া হয়েছিল, মনুষ্য-পুত্র যীশুকে সেরূপ চিহ্ন দেয়া হবে। এছাড়া, আর কোন চিহ্নই দেয়া হবে না বলে যীশু নিজেই দৃঢ়তার সাথে ধর্মগুরু ও ফরীশীদের কাছে প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করেন। সুতরাং, বাইবেলে বর্ণিত যীশুর ঘোষণানুসারে তাঁর ক্রুশে নিহত হওয়ার বিবরণটি মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে।

২। বাইবেলের বর্ণনানুসারে জানা যায়, ইহুদী প্রধানরা যীশুর বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছিল এবং তাঁর প্রাণবধ করাই ছিল এই ষড়যন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ষড়যন্ত্র ক্রমশ সফলতার দিকে এগিয়ে চলছে দেখে যীশু অত্যন্ত বিচলিত হতে থাকেন। যীশুর এই চঞ্চলতাকে অনেকেই তাঁর স্বাভাবিক মানবীয় দুর্বলতা বলে বর্ণনা করেছেন। 'মনুষ্য-পুত্রের'র মধ্যে সাধারণত অনেকসময় মানবীয় দুর্বলতা সঞ্চারিত হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। যদিও আল্লাহ্'র নবীদের কথা আলাদা। যীশু বিচলিত হয়ে পড়ে, বাইবেলের সাক্ষ্যানুসারে এটা সত্য কথা।

কিন্তু আল্লাহ্'র তরফ থেকে নবুওয়াতের ভারপ্রাপ্ত রসূলের মনে এমন বিব্রতকর অবস্থায় অথবা অন্যকোন মহৎ কারণেও এ ধরনের একটি হতাশার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যীশু দেখছিলেন ঃ

(১) অচিরেই তাঁর পার্থিব জীবনের অবসান হতে যাচ্ছে, অথচ তাঁর নবুওয়াতের মিশন এখনও সম্পূর্ণভাবে অসমাপ্ত রয়ে গেছে; ইস্রায়ীলের হারিয়ে যাওয়া বাকী গোত্রগুলো সম্পর্কে কোনপ্রকার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা তখনও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি; কারণ, তাঁর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল বনি-ইস্রায়ীলের হারিয়ে যাওয়া গোত্রগুলোকে খুঁজে বের করা; অথচ,

(২) ক্রুশে নিহত করে ইহুদীরা তাঁকে অভিশপ্ত বলে প্রমাণ করতে চাচ্ছে। মনে হয়, এ দুটো কারণেই যীশুর মনে এই চাঞ্চল্যের উদ্রেক হয়েছিল।

যাহোক, চরম বিপদের সম্মুখীন হয়ে যোনা ভাববাদী যেমনই কাতরকণ্ঠে সদাপ্রভুকে উদ্ধারের জন্য ডেকেছিলেন, যীশুও তেমনি বিপদ-মুক্তির জন্য সদাপ্রভুকে আকুলকণ্ঠে ডাকলেন— তাঁর হুজুরে প্রার্থনা জানালেন ঃ

"প্রার্থনা কর, তোমাদের দেয়া হবে; অন্বেষণ কর, পাবে, দ্বারে করাঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলে দেয়া হবে। কারণ, যে কেউ প্রার্থনা করে সে গ্রহণ করে; যে অন্বেষণ করে সে পায়; যে দ্বারে করাঘাত করে তার জন্য দ্বার খুলে যায়।" (মথি, ৭ : ৭-৮)।

পরে কিছুদূর এগিয়ে তিনি ভূমিতে পড়ে প্রার্থনা করলেন ঃ যদি সম্ভব হয়, তবে যেন সেই মুহূর্ত তাঁর নিকট থেকে দূরে চলে যায়। তিনি বললেন, আব্বা, পিতঃ, তোমার পক্ষে সবই সম্ভব। এ পান পাত্র আমার নিকট থেকে দূর কর, কিন্তু আমার ইচ্ছানুসারে নয়, তোমার ইচ্ছানুসারে হোক।" (মার্ক, ১৪ : ৩৫-৩৬)।

"তিনি আবার দ্বিতীয়বার গিয়ে প্রার্থনা করলেন, পিতা আমার, আমি পান না করলে যদি ইহা দূর না হতে পারে, তবে তোমার যা ইচ্ছা তাই হোক।" (মথি, ২৬ : ৪২)।

যেকোন কারণেই হোক, নিজের প্রাণরক্ষার জন্য যীশু বারবার আল্লাহ্'র দরবারে কাতরকণ্ঠে আবেদন জানাতে থাকেন। "তখন স্বর্গ থেকে এক দূত দেখা দিয়ে তাকে সবল করলেন। মর্মান্তিক যন্ত্রণায়, তিনি আরও একান্তভাবে প্রার্থনা করলেন; তাঁর ঘাম রক্তের ফোঁটার মত হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল।" (লুক, ২২ : ৪৩-৪৪)।

সুসমাচার রচয়িতার বর্ণনানুসারে, যীশুর অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় যে, *"তাঁর ঘাম রক্তের ফোঁটার মত মাটিতে ঝরতে লাগল।"* যীশুর মৃত্যুভয় ও তাঁর অতিমাত্রার চাঞ্চল্য সম্বন্ধে সুসমাচার রচয়িতাদের কিছু অতিরঞ্জন থাকুক-বা-না-থাকুক, তাঁদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আল্লাহ্র নেক বান্দাদের মত যীশুও এক সর্বশক্তিমান ও সর্বমঙ্গলময় সদাপ্রভু-পরোয়ারদিগারে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন এবং তিনি যে তাঁর সকল প্রার্থনা গ্রহণ করেন এ বিশ্বাস তিনি দৃঢ়তার সাথে পোষণ করতেন, আর শিষ্যদের কাছেও তিনি তা প্রকাশ করতেন। একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি সদাপ্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলছেন ঃ

"পিতা, তুমি আমার কথা শুনেছ বলে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি; তুমি সর্বদা আমার কথা শুনে থাক, এটা আমি জানতে পেরেছি।" (যোহন, ১১ : ৪১-৪২)।

পূর্বোক্ত ঘটনাক্রম থেকে জানা যাচ্ছে যে, যীশু ক্রুশের লাঞ্ছিত মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য সদাপ্রভুর নিকট কাতর হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন এবং বাইবেল বলে তাঁর সেই প্রার্থনা সদাপ্রভু ঈশ্বর গ্রহণ করেছিলেন (হিব্রু ৫ : ৭)।

এমতাবস্থায়, যদি স্বীকার করা হয় যে, ক্রুশ-ঘটনার সাথে সাথে যীশুর জীবনেরও অবসান ঘটেছিল, তবে ন্যায়ের অনুরোধে যুগপৎভাবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর নবী-জীবনটি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। কারণ, বাইবেলের বর্ণনানুসারে এই কর্তব্য পালনের বহুআগেই ক্রুশে তাঁর মৃত্যু হয়। এ অবস্থায় হয় স্বীকার করতে হবে, ক্রুশে যীশুর প্রাণদানের কথা মিথ্যে, না হয় স্বীকার করতে হবে বনি-ইস্রায়ীলের হারানো গোত্রগুলোর উদ্ধারের জন্য তাঁর আগমন হয়নি।

ক্রুশ কাহিনীর গোপন-রহস্য ঃ যীশুর ইহুদীদের সাথে সম্পত্তি নিয়ে বা ব্যক্তিগতভাবে কোন ঝগড়া ছিল না, যে-জন্য তাঁকে তারা হত্যা করতে চাইত; বরং বায়েত গ্রহণকারী, দীক্ষাদাতা যোহন (John The Baptist) বা ইয়াহইয়া নবী (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মূলে যীশুর মিথ্যেবাদী হওয়া সম্বন্ধে ইহুদীদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যীশুর অনুসারীদের নিকট তা প্রমাণ করতে এবং তাঁকে মানার দায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাওরাতের শাস্তি (দ্বিতীয় বিবরণ, ২১ : ২৩) অনুযায়ী তাঁকে তারা ক্রুশে বধ করে মিথ্যেবাদী ও লাঞ্ছিত প্রমাণ করতে চেয়েছিল।

আর এ জন্য তারা যুগপৎভাবে যীশু-বিরোধী আন্দোলন চালানোর পর আঞ্চলিক শাসনকর্তা পীলাতের বরাবরে এই অভিযোগ পেশ করতে থাকল যে, যীশু রাজদ্রোহী নিজেকে তিনি ইহুদীদের রাজা বলে ঘোষণা করেন; লোকদের রাজকর দিতে নিষেধ করেন; ইহুদীদের পবিত্র ধর্মমন্দির সম্বন্ধে অবৈধ আক্রমণ করতে এবং নিজেকে খোদার পুত্র বলে ঘোষণা করতেও কুণ্ঠিত হন না, প্রভৃতি। এসব অপরাধের জন্য তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে নিহত করা হোক। এই ছিল ইহুদীদের দাবী। কিন্তু, প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনানুসারে রাজ-দরবারের বিচারে ইহুদীদের দাবী সত্য বলে সাব্যস্ত হলে প্রমাণিত হবে যে যীশুকে ক্রুশে দিয়ে নিহত করা হয়েছিল, অন্যথায় প্রমাণিত হবে যে তাঁকে ক্রুশে দিয়ে নিহত করা হয়নি।

জোয়েল কারমাইকেল (Joel Carmichael) বলেছেন, *'যীশু মন্দির আক্রমণ করেছিলেন'* কথাটি ঠিক নয়, বরং বিষয়টি ছিল রাজনৈতিক। কারণ, ইহুদীদের ধর্মজীবন নিয়ে রোম কখনও মাথা ঘামায়নি, কিন্তু এ কথা প্রমাণিত যে, তা কোন গণউত্থান কিম্বা গণবিদ্রোহ অথবা রোমের বিরুদ্ধে বিপ্লবের কোন ঘটনা নয়। তা যদি হত তবে তাদের ইতিহাসে সে কথা ফলাও করে লেখা থাকত। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে মারাত্মক কিছু ছিল না। তবে, এ কথা প্রমাণিত সত্য যে, শিষ্যবর্গসমেত যীশুকে হঠাৎ গা ঢাকা দিতে হয়েছিল। কিন্তু কারণ?

'উপদেশাবলী' বলে, যীশু জানতেন, তাঁর জীবন বিপন্ন; তাই তিনি সশিষ্য পালিয়ে গিয়েছিলেন জেরুজালেমের উপকণ্ঠে কামরান উপত্যকার পূর্বে ত্রিশৃঙ্গ জয়তুন পর্বতে। তারপর নতুন নিয়মের সেই নাটকীয় বিবরণ সবারই জানা। যীশুকে হস্ত চুম্বন করে শত্রুদের নিকট ধরিয়ে দিয়েছিল তারই এক শিষ্য ঈস্কারিয়োতীয় যীহূদা।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কি কারণে যিহূদা ইস্কারিয়োত যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল? যীশু তো ছিলেন শান্তশিষ্ট ভদ্র, সবাই তো তাঁকে ভালবাসতো। লোকের মঙ্গল বৈ মন্দ কখনও তিনি চাননি। তিনি যা করেছেন, খোলাখুলিভাবে সবার চোখের সামনেই তা করেছেন। সাধারণ মানুষ, সমাজপতি, ধর্মগুরু, দখলদার রোম-সেনা, সবাই তাকে ভালো করেই চিনতো, জানতো। শাসককুল তাঁকে গ্রেফতার করতে পারতো যে কোনদিন, ডেকেও আনতে পারতো জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে। তবে এমন সর্বজনপরিচিত মানুষটিকে হাতে চুম্বন করে যীহূতা ইস্কারিয়োত-এর সনাক্ত করার দরকার হল কেন? 'উপদেশাবলী' বলে, পুরোহিত এবং সমাজপতিদের নাকি যীহূদা ইস্কারিয়োত বলেছিল, 'যাকে আমি চুম্বন করব, জানবে সেই যীশু'। এইভাবে চিনিয়ে দেয়া থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যীশু ছদ্মবেশে ছিলেন। তাছাড়া, সুসমাচারের বিবরণ থেকে এটাও প্রমাণিত যে, পিতর ইত্যাদি 'শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ সম্পূর্ণ সশস্ত্র অবস্থায় ছিল, যেমন, 'পিতরের নিকট তখন তরবারী থাকাতে তিনি তা খুলে মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। সে দাসের নাম 'মল্ক' (যোহন, ১৮ : ১০)। কিন্তু যীশু বুঝতে পেরেছিলেন, সেখানে বাধাদানের চেষ্টা বৃথা, তাই তিনি বললেন, '*তরবারী কোষবদ্ধ কর*'। অতএব, যীশুকে তারা ধরে নিয়ে গেল। আর তাঁর শিষ্যরা ডামাডোলের মধ্যে অন্ধকারে ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে গা-ঢাকা দিল।

'যীশুকে দণ্ড দেয়া হয়েছিল অকারণে' এই বিষয়ে সুসমাচারে লেখকগণ একমত। বিচারসভা এবং মহাযাজকেরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দাঁড় করেছে, বিরুদ্ধ সাক্ষ্য অন্বেষণ করেছে, কিন্তু যীশুকে দোষীসাব্যস্ত করতে পারেনি। তবে, জানা যায়নি কি অপরাধের সংবাদ বিশ্বাসঘাতক যিহূদা ইস্কারিয়োত তাদেরকে দিয়েছিল। বিচারকালের কোন প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি, শুনানীর সময়ও কখনো তাঁকে দেখা যায়নি।

একটি কথা অবশ্য জানা যায়, প্রধান পুরোহিতগণ তাঁকে ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন দিয়েছিলেন? দিয়েছিলেন, যেন মানুষটিকে সারা

নগরের লোক চেনে, তাঁকেই সনাক্ত করতে। কিন্তু সনাক্তকরণ চুম্বন ব্যতীত যদি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের নিশ্চিদ্র কোন প্রমাণ সে দিতে পারত তবে কি কর্তারা অমন অসহায়বোধ করতেন। তাই তখন থেকেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া, মাত্র ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার জন্য যিহূদা অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকতা করেননি। বস্তুতঃ কারণ নিশ্চয় অন্য কিছু ছিল, যা যিহূদার আত্মহত্যার কারণে কোনদিন আর প্রকাশ পায়নি।

যাহোক, ইহুদিদের দাবি ছিল, তাদের এক ব্যবস্থা আছে, সে ব্যবস্থানুসারে যীশুর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। কেননা, সে নিজেকে খোদার পুত্র করে তুলেছে। কিন্তু এসবকথা নিয়ে রোমানরা মাথা ঘামাবে কেন? ধর্মীয় ঝগড়ায় তাদের উৎসাহ ছিল না। তবুও, যোহন বলছেন ঃ

"পীলাত যখন একথা শুনলেন, তিনি আরও ভীত হলেন' (১৯ : ৮)।

কিসের ভয়? তাঁর হাতে তো পুলিশ ছিল, তাছাড়া, সৈন্য-সামন্ত এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা। নীরব যীশুকে তিনি বলছেন ঃ

'তুমি কি জান যে, তোমাকে ক্রুশে দেয়ার ক্ষমতা আমার আছে এবং তোমাকে ছেড়ে দেয়ার ক্ষমতাও আমার আছে' (১৯ : ১০)। তাহলে পীলাতের ভয়টা কিসের? শাসক হিসেবে পীলাত এমনই অত্যাচারী এবং ইহুদী-বিদ্বেষী ছিল যে রোম তাঁকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল। যাহোক, শেষপর্যন্ত যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। রাজনৈতিক কারণ একটি নিশ্চয় ছিল, আর এ তো অজানা কথা নয় যে, রাজনৈতিক কারণের উল্লেখ নথিপত্রে বড় একটা থাকে না।

"তখনই প্রধান-পুরোহিতেরা ও ইহুদীদের প্রাচীনবর্গ কাইয়াফা নামক মহাপুরোহিতের প্রাঙ্গণে একত্র হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিল, 'ছলে-বলে যীশুকে হত্যা করতে হবে। তবে, এটা পর্বের সময় নয়, পিছে লোকদের মধ্যে গোলমাল হতে পারে'। (মথি ২৬ : ১-৫)।

তখন বারোজনের একজন, যাকে যিহূদা ঈস্কারিয়োতলা হয়, সে প্রধান পুরোহিতদের কাছে গিয়ে বলল ঃ

"আপনারা আমাকে কি দিতে চান, আমি তাঁকে আপনাদের হাতে তুলে দেব? তখন তারা তার হাতে ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রা দিল এবং সেই সময় থেকেই সে যীশুকে তাঁদের হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল।" (মথি, ২৬ : ১৪-১৬)।

যদিও আগেই বলা হয়েছে, মাত্র ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার জন্য যিহূদা নিশ্চয় এ কাজটি করেননি। কারণ ছিল অন্যকিছু।

এ সম্পর্কে মনস্তত্ত্ববিদদের অনেকেই মনে করেন, যিহূদার এ কাজটি ছিল সাইকোলজিক্যাল। তার মনস্তাত্ত্বিক মনের একটি বিচিত্র খেলা। তিনি ছিলেন শিক্ষিত লোক, সবকথা তার যাচাই করে নেবার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। যীশুর অন্য শিষ্যদের মতো যা দেখছেন, যা শুনছেন, সবই নির্বিচারে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেয়াটা বোধহয় তার ধাতে ছিল না। *'লেখাপড়া জানার অভিশাপ'* মনে সন্দেহ জাগা, মনে মনে তর্কবিতর্ক করা, বাছবিচার করা, যাচাতে যাওয়া ইত্যাদি; যা তারও উপর বর্তেছিল। তাই, যিহূদা যীশুকে ইহুদীশাস্ত্রে লেখা মেশায়া বলে নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারেননি। যদিও, যীশুর অন্য শিষ্যদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে মেশায়া বলে ধরতে পারেননি, যদিও তাঁরা ইহুদীদের রাজা মেশায়া বলে মেনে নিতে একটুও দ্বিধাসংকোচ করেননি। যিহূদা দেখলেন, তিনি ইহুদী পুরাণে মেশায়ার যে বর্ণনা পড়েছেন, যীশুর সঙ্গে তার কোথাও কোন মিল নেই। যীশু নম্র, ক্ষমাশীল, করুণাময়। তাঁর ব্যবহারও তো রাজার মত উগ্র দাম্ভিক নয়। তিনি মানুষকে বিনীত হতে, নিরভিমান হতে, মারমুখো না হতে শিক্ষাদান করেন। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে কখনও একটি কথাও বলেন না। তিনি কি করে ইহুদীদের রোমানদের কবল থেকে উদ্ধার করে তাদের দুর্গতি নাশ

করবেন? খুব সম্ভব, এরকম নানা চিন্তা-বিচিন্তা যিহূদাকে একেবারে অস্থির করে তুলেছিল।

মূলত, ভুল হয় মেশায়া কথাটার অর্থ নিয়ে, সকল ইহুদীর মত যিহূদার কাছেও 'মেশায়া' হচ্ছেন : পার্থিব দুর্গতি থেকে ইহুদীদের উদ্ধারকর্তা, রাজা। যীশুর কাছে মেশায়ার অর্থ মোক্ষদাতা, যিনি অমৃতলোকের সন্ধান দেন, অনন্ত জীবনের পথ দেখান, পাপতাপ, দুঃখ-শোক, বিবাদ-বিসংবাদ হরণ করে নিয়ে জগতকে শান্তিতে ভরে দেন। যিহূদা সেই মেশায়াকে একেবারেই বুঝে উঠতে পারেননি। তাছাড়া, যীশু যে এখন অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে চলাফেরা করছেন, আত্মগোপন করে রয়েছেন, যিহূদার সেটা কোনভাবেই মনঃপুত হচ্ছে না। পুরাণে তো আছে, মেশায়াকে কেউ কিছু করে উঠতে পারবে না। ধরতে ছুঁতেই পারবে না তো মেরে ফেলা! দেখা যাক্, যীশুকে ধরিয়ে দিলে পুরোহিতেরা তাঁকে বাঁধতে পারবেন কিনা? ভোজপর্বে যীশুর কথায় তাঁর মনে হল যে, দীর্ঘকাল ধরেই তাদের এই অজ্ঞাতবাস চলতে থাকবে। তখনই যিহূদার মনস্থির হয়ে গেল। সুসমাচার রচয়িতা লুকের ভাষায় ঃ

> 'তখন শয়তান এসে ঈষ্কারিয়োতীয় নামক যিহূদার মনে প্রবিষ্ট হল' (২২ : ৩)।
>
> পথে যেতে যেতে যিহূদা নিশ্চয় ভাবলেন যে, যীশু যদি সত্যিই মেশায়া হন তো ঋত্বিক-পুরোহিত-আচার্য্য-উপাধ্যায় সবাই মিলে তাঁদের সমগ্র বলপ্রয়োগ করে তাঁর কেশাগ্রেরও কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। শাস্ত্র কখনও মিথ্যা হতে পারে না। কিন্তু যদি যীশু মেশায়া না হন...? যাক্‌গে সে কথা ... দূর হোক সে-চিন্তা ... ।

যিহূদা সর্বপ্রধান যাজক যোসেফ কাইয়াফার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং যীশুর গোপন আস্তানার সন্ধান বলে দিতে রাজী হলেন। কিন্তু মাত্র ত্রিশটি রৌপ্যমুদ্রার লোভে নয়, মনের এক নিদারুণ সংশয় নিরসনের জন্য। যাহোক, যিহূদার সাহায্যে জনসাধারণের অজান্তে গোপনেই যীশুকে ধরে ফেলার সুযোগ আছে বুঝে পুরোহিতেরা তাদের পূর্বপরিকল্পনা বদলে ফেলে নিস্তারপর্ব শুরু হওয়ার আগেই সবকিছু শেষ করে ফেলার আয়োজন করল।

শত্রুর সম্মুখীন যীশু ঃ

> "যখন তিনি কথা বলছেন, তখন যিহূদা, সেই বারোজনের একজন এল, এবং তার সাথে প্রধান পুরোহিতদের ও ইহুদীদের প্রাচীনবর্গের নিকট হতে বিস্তর লোক খড়গ ও লাঠি নিয়ে এল। যে তাঁকে সমর্পণ করল, সে তাদের এই বলে সংকেত দিয়েছিল, আমি যাঁকে চুম্বন করব,

তিনিই সেই ব্যক্তি। তোমরা তাঁকে ধরো। সে তখনই যীশুর কাছে গিয়ে বলল, গুরু, মঙ্গল হোক, আর তাঁকে চুম্বন করল। যীশু তাকে বললেন, বন্ধু, যা করতে এসেছ, কর। তখন তারা কাছে এসে যীশুর উপরে হস্তক্ষেপণ করে তাঁকে ধরল।" (মথি, ২৬ : ৪৭-৫০)।

যীশুর বিচার মহাপুরোহিতের সামনে ঃ

"যারা যীশুকে ধরেছিল, তারা তাঁকে মহা-পুরোহিত কাইয়াফার নিকট নিয়ে যায়। সেই স্থানে ধর্মগুরুরা ও প্রাচীনবর্গও সমবেত হয়। (মথি, ২৬ ঃ ৫৭)। প্রধান পুরোহিতেরা ও সমস্ত মহাসভা যীশুকে প্রাণদণ্ড দেবার জন্য তাঁর বিপক্ষে মিথ্যেসাক্ষ্য অন্বেষণ করল, কিন্তু অনেক মিথ্যেসাক্ষী উপস্থিত হলেও তেমন সাক্ষ্য পাওয়া গেল না। শেষে দু'জন উপস্থিত হল; তারা বলল, এ বলেছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভেঙ্গে ফেলতে পারি আর তিনদিন পরে তা নির্মাণ করতে পারি। তখন মহা-পুরোহিত দাঁড়িয়ে তাঁকে বলল, তুমি কি কোন উত্তর দেবে না? এরা তোমার বিপক্ষে কেন সাক্ষ্য দিচ্ছে'? কিন্তু যীশু নীরব, তাতে মহাপুরোহিত তাঁকে বলল, 'আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, আমাদের বল, তুমি সেই ঈশ্বরের পুত্র কিনা'। যীশু তাঁকে বললেন, 'আপনিই বললেন।... এতে মহা-পুরোহিত আপনার বস্ত্র ছিঁড়ে বলল, 'এ ঈশ্বর-নিন্দা করল, আমাদের সাক্ষীতে আর দরকার কি? তোমরা ঈশ্বর-নিন্দা শুনলে; তোমাদের কি তাই মনে হয়? তারা উত্তরে বলল, 'সে মৃত্যুর যোগ্য'।" (মথি, ২৬ : ৫৯-৬৬)।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহাপুরোহিতের সামনে যীশুর বিচার-প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্য সংগ্রহ করে প্রাথমিক বিচারে তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করা। তবে মহাপুরোহিত কাইয়াফা এ কথা ভালভাবেই জানতেন, যীশু এমন কোন কাজ করেননি, যা সত্যিই ইহুদী ধর্মের বিরুদ্ধে যায়, যার জন্য ইহুদী অনুশাসন অনুসারে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেয়া যায়। আর ইহুদী বিচার-সভা কারও প্রাণদণ্ড দিলেও তা কার্যকর করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমান শাসনকর্তা ঐ দণ্ড মঞ্জুর করেন। এ কারণে তিনি যীশুকে দেশাধ্যক্ষ পীলাতের নিকট সমর্পণ করার নির্দেশ দেন।

সুসমাচার রচয়িতা মথি বলেন ঃ

"আর প্রভাত হলে প্রধান পুরোহিতেরা ও ইহুদীদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুর বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করল, যেন তাঁর প্রাণদণ্ড দিতে পারে; আর তাঁকে

বেঁধে নিয়ে গিয়ে দেশাধ্যক্ষ পীলাতের হাতে সমর্পণ করল।" (মথি, ২৭ : ১-২)।

তখন রোমান শাসনকর্তা পীলাত ইহুদীদের নিস্তার-পর্ব উপলক্ষে জেরুজালেমেই ছিলেন। তিনি মূলত ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী হেরোদ-১ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নুন নগরী সিজারিয়াতে বাস করতেন। শুধু ইহুদীদের বড় বড় তিনটি পর্বের সময়ই জেরুজালেমে এসে থাকতেন। ইহুদীদের সবচেয়ে বড় উৎসব নিস্তার-পর্বের সময়ে দিক-বিদিকের ইহুদীরা জেরুজালেমে এসে উপস্থিত হত। আর বহুলোক একত্র হলে ছোট কি বড় একটা-না--একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধেই যেত। তাই তখন তিনি কিছুদিন জেরুজালেমে অবস্থান করে রোমান সৈন্যদের পাহারায় বসিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার চেষ্টা করতেন।

পীলাতের আদালতে যীশুর বিচার ঃ

"... লোকেরা যীশুকে কাইয়াফার কাছ থেকে দেশাধ্যক্ষের প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে ... তারা যেন কলুষিত না হয়ে নিস্তার-পর্বের ভোজ আহার করতে পারে, সেজন্য তারা নিজেরা প্রাসাদে প্রবেশ করল না। অতএব, পীলাত বাইরে এসে তাদের কাছে বললেন, তোমরা এই লোকের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ এনেছ? তারা উত্তরে তাঁকে বলল, এ যদি অপরাধী না হ'ত আমরা আপনার হাতে এঁকে সমর্পণ করতাম না।" — (যোহন, ১৮ : ২৮-৩০)।

"পীলাত বিচারাসনে বসলে, তাঁর স্ত্রী (প্রাকুলা, দূত মারফত) পত্র পাঠালেন, সেই ধার্মিকের সাথে তোমার কোন সংস্রব না হোক, কারণ আমি আজ রাতে স্বপ্নে তাঁর জন্য অনেক দুঃখভোগ করেছি।" (মথি, ২৭ : ১৯)। পীলাত এতে ভীত হলেন এবং যীশুর ধার্মিকতায় বিশ্বাসী হয়ে তাঁকে কৌশলে মুক্তি দেবার পথ খুঁজতে লাগলেন। যেহেতু, "তারা যে হিংসাবশতঃ তাঁকে সমর্পণ করেছে, তা তিনি জানতেন।" (মথি, ২৭ : ১৮)।

"পর্বের সময় দেশাধ্যক্ষের এই রীতি ছিল যে, লোকেরা যাকে দাবী করত এমন একজন বন্দীকে তিনি মুক্ত করে দিতেন। তখন যীশু বরাব্বা নামক তাদের একজন বিশেষ বন্দী ছিল। অতএব, তারা একত্র হলে, পীলাত তাদের বললেন, তোমরা কি চাও, আমি কাকে মুক্ত করে

দেব, যীশু বরাব্বাকে না যাঁকে খ্রিস্ট বলে সেই যীশুকে?" (মথি, ২৭ : ১৫-১৭)।

"প্রধান পুরোহিত ও প্রাচীনবর্গ লোকদের প্ররোচিত করল যেন তারা বরাব্বাকে চেয়ে নেয় এবং যীশুকে নাশ করে। সুতরাং, দেশাধ্যক্ষ যখন তাদের পুনর্বার বললেন, 'তোমরা কি চাও, এ দু'জনের মধ্যে কাকে মুক্ত করে তোমাদের দেব? তখন তারা বলল, বরাব্বাকে। পীলাত তাদের বললেন, তবে যীশু, যাঁকে খ্রিস্ট বলে, তাঁর বিষয়ে কি করব? তারা সবাই বলল, তাঁকে ক্রুশে দেয়া হোক। দেশাধ্যক্ষ তাদের বললেন, কেন, সে কি অপরাধ করেছে? কিন্তু তারা আরও বেশি চিৎকার করে বলল, তাঁকে ক্রুশে দেয়া হোক।" (মথি, ২৭ : ২০-২৩)।

বাইবেলের পূর্বোক্ত বর্ণনায়, যীশুর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্বন্ধে জানা যায়, তাদের অভিযোগগুলোর মূলে কোন সত্য ছিল না। ইহুদীরা বিশেষতঃ ইহুদী পণ্ডিত-পুরোহিত ও সমাজপতিরা যীশুর শিক্ষার ফলে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তির এবং শাসন-শোষণের সুযোগ-সুবিধের ক্ষতি হচ্ছে দেখে, হিংসেবশতঃ তাঁর বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। পীলাতও যে এ ধরনের বিশ্বাস করতেন, মথির প্রদত্ত বিবরণ থেকে তাও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

ইহুদীরা যখন যীশুকে ক্রুশে আবদ্ধ করার জন্য চরম হৈ-হল্লা শুরু করে দিল, পীলাত তখন বললেন, "কেন, সে কি অপরাধ করেছে?"

মূলত, পীলাত যে যীশুকে একজন ধার্মিক ও নিরপরাধ ব্যক্তি বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই। তাঁর স্ত্রীর স্বপ্ন থেকেও বুঝা যাচ্ছে, যীশুর প্রাণরক্ষার জন্য বিশেষভাবে ব্যাকুল হয়ে পড়াই ছিল তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। মার্কের পনেরো অধ্যায়েও অনুরূপ বর্ণনাই লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং, লুক রচিত সুসমাচার থেকে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা হল:

"আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করলো, আমরা জেনেছি যে এই লোকটি আমাদের জাতিকে বিপথগামী করছে, কৈসরকে কর দিতে নিষেধ করেছে, আমি খ্রিস্ট, রাজা। (লূক, ২৩ : ২)। পীলাত আবার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং যীশুকে ডেকে বললেন, 'তুমি কি ইহুদীদের রাজা?' যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন, 'আপনি কি নিজ থেকে এটা বলছেন, না অন্যেরা আমার বিষয়ে এ কথা আপনাকে বলে দিল'? পীলাত উত্তর দিলেন, 'আমি কি ইহুদী? তোমার স্বজাতীয়েরা ও প্রধান

পুরোহিতেরা আমার হাতে তোমাকে সমর্পণ করেছে; তুমি কি করেছ; যীশু উত্তর দিলেন আমার রাজ্য এ জগতের নয়, আমার রাজ্য যদি এ জগতের হত, তবে যাতে আমি ইহুদীদের হাতে সমর্পিত না হই, সেজন্য আমার অনুচরেরা প্রাণপণে সংগ্রাম করত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার রাজ্য এ স্থানের নয়। পীলাত তাঁকে বললেন, তবে কি তুমি ইহুদীদের রাজা? যীশুর উত্তর, আপনিই বলছেন, আমি রাজা। সত্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্যই আমি জন্মগ্রহণ করেছি এবং জগতে এসেছি; যে-কেউ সত্যের অনুগত সে আমার কথা শুনে। পীলাত তাঁকে বললেন, 'সত্য কি? এই বলে তিনি আবার বাইরে ইহুদীদের নিকট গেলেন ও তাদের বললেন, "আমি এর কোনই দোষ পাচ্ছিনে।" (যোহন, ১৮ : ৩৩-৩৮)। কিন্তু ইহুদীরা পীলাতের মুখে যীশুর নির্দোষিতার ঘোষণা বারবার শুনে তারা তাঁর বিরুদ্ধে নতুনভাবে অভিযোগ উপস্থিত করল, "তারা আরও জিদ করে বলতে লাগল, এই ব্যক্তি সমগ্র যিহূদীয়ায় এবং গালীল থেকে শুরু করে এই স্থান পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে প্রজাবৃন্দকে উত্তেজিত করে তুলেছে। পীলাত গালীলের কথা শুনে লোকটি গালীলীয় কিনা জিজ্ঞেস করলেন, আর যীশু হেরোদের অধিনস্থ লোক, তা জানতে পেরে তিনি তাঁকে হেরোদের নিকট পাঠালেন; তখন হেরোদও জেরুজালেমে ছিলেন। (লূক, ২৩ : ৫-৭)।

বর্ণিত রয়েছে যে, 'পীলাত যীশুকে হেরোদের কাছে পাঠিয়েছিলেন'— এই হেরোদ হচ্ছেন গালিলী প্রদেশ ও জর্ডনের পূর্বপারের দক্ষিণ অঞ্চল পেরিয়া প্রদেশের রাজা অ্যান্টিপাস হেরোদ। তিনি রাজা হেরোদের তৃতীয় পুত্র। রাজা হেরোদ সাঁইত্রিশ বছর রাজত্ব করে সত্তুর বছর বয়সে দারুণ অশান্তি ভোগ করতে করতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়েই তিনি এক উইল করে তাঁর বিস্তৃত রাজ্য তাঁর তিন জীবিত পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। বড় ছেলে আরকেলস পান জুডিয়া, স্যামেরিয়া আর ইডুমিয়া। দ্বিতীয় পুত্র ফিলিপ পান জর্ডন নদীর পূর্ব পারের সমস্ত উত্তর অঞ্চল। পরবর্তীকালে সিজেরিয়া ফিলিপাই এ অঞ্চলের রাজধানী ছিল। তৃতীয় পুত্র অ্যান্টিপাস পান গালিলী প্রদেশ ও জর্ডনের পূর্ব পারের দক্ষিণ অঞ্চল পেরিয়া প্রদেশ। এভাবে বিস্তৃত রাজ্য ভাগ করে দিলেও হেরোদ তার উইলের এগজিকিউটর করে যান সম্রাট অগাস্টাসকে। এরপর রাজা হেরোদ মারা যেতে না যেতেই সারা প্যালেস্টাইন জুড়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। এই বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে আরকেলস

তিন হাজার ইহুদীকে হত্যা করে ফেলে। এরপর ব্যাপারটা চরম আকার ধারণ করলে আরকেলস তাঁর বন্ধু সিরিয়ার রোমান গভর্নরের উপর তার রাজ্যভার চাপিয়ে দিয়ে স্বয়ং সম্রাটের সাথে দেখা করতে যান রোমে। এক দল মাতব্বর ইহুদীও তখনই সম্রাটের কাছে দরবার করতে যান, যেন হেরোদ-পুত্রদের কেউ রাজত্ব করতে না পারে। বরং, সম্রাট যেন নিজেই সমগ্র প্যালেস্টাইনের শাসনভার গ্রহণ করেন। তারা ভেবেছিলেন, পুরাকালে পারস্য সম্রাটের অধীনে তাঁরা যেমন আনন্দে ছিলেন, রোম সম্রাটের হাতে পড়লে ঠিক তেমনটিই সুখে থাকবেন। কিন্তু সম্রাট ইহুদী মাতব্বরদের কথায় কান না দিয়ে মোটামুটি হেরোদের উইলের শর্তগুলো বজায় রাখলেন। তবে তিনি আরকেলসকে জুডিয়া বা স্যামেরিয়ার ঠিক রাজা করলেন না এবং রাজা নাম গ্রহণ করারও অধিকার তাঁকে দিলেন না। আর একটু নীচুদরের শাসনকর্তার পদে নামিয়ে তার পদবী দিলেন 'ইহুদীদের কুলপতি'। ফিলিপ আর অ্যান্টিপাস নিজ নিজ অঞ্চলের শাসনকর্তা রয়ে গেলেন। তবে জর্ডন নদীর ওপারের গ্রীক শহরগুলো নিয়ে কোপোলিস বলে যে অঞ্চল গড়ে উঠেছিল, তা সিরিয়ার রোমান বড়লাট (Viceroy)-এর শাসনাধীন হয়ে গেল।

ইহুদীদের কুলপাতিরূপে আরকেলস রোম থেকে ফিরে এসে প্রায় দশ বছর শাসন চালিয়েছিলেন। ওই দশ বছরে তাঁর অত্যাচারের মাত্রা এমনই বেড়ে যায় যে জুডিয়া আর স্যামেরিয়ার মানুষ একজোট হয়ে নিজেদের ক'জন বাছা বাছা প্রধানকে রোমে পাঠালো সম্রাটের কাছে নালিশ জানাতে। সম্রাট সব শুনে একটি বিহিত করার লক্ষ্যে আরকেলসকে তৎক্ষণাৎ রোমে ডেকে পাঠালেন। আরকেলস রোমে আসার সাথে সাথে তাকে ফ্রান্সে নির্বাসিত করে দেয়া হলো। জুডিয়া, স্যামেরিয়া ও ইডুমিয়া সিরিয়ার রোমান বড়লাটের অধীনে চলে গেল। একজন বিচক্ষণ রোমান রাজপুরুষ বড়লাটের নিচে তাঁর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি (Procurator) হিসেবে এসব প্রদেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন। ইনিই নতুন নিয়মের পরিভাষায় 'দেশাধ্যক্ষ' নামে অভিহিত হয়েছেন।

যাহোক, যীশু হেরোদ অ্যান্টিপাসের অধীনস্থ লোক, তা জানতে পেরে পীলাত তাঁকে হেরোদের নিকট পাঠিয়ে দেন।

> "যীশুকে দেখে হেরোদ তো অত্যন্ত আনন্দিত। কারণ, তাঁর বিষয়ে অনেক কথা শুনে তিনি অনেকদিন থেকে তাকে দেখতে ইচ্ছেপোষণ করছিলেন, আর তাঁর সাধিত কোন লক্ষণ দেখার আশা করছিলেন।" (লুক, ২৩ : ৮)। সুতরাং, "তিনি যীশুকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন ... আবার পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।" (লূক, ২৩ : ৯, ১৯)।

ফলে, ইহুদীদের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিপরীত ফল ফলল। মূলতঃ হেরোদ যীশুকে দেখে আনন্দিত হলেন এবং অপেক্ষমাণ প্রধান পুরোহিত ও ধর্মগুরুদের উপেক্ষা করে তিনি তাঁকে অক্ষতদেহে পীলাতের নিকট ফেরৎ পাঠালেন এবং তারপরেই—

"পীলাত সমস্ত প্রধান পুরোহিত ও অধ্যক্ষ সকলকে এবং জাতীর লোককে ডেকে একত্র করলেন ও তাদের বললেন, লোকটি জাতিকে বিপথগামী করছে বলে তোমরা তাঁকে আমার সামনে উপস্থিত করেছ; আর আমি তোমাদের সাক্ষাতে অনুসন্ধান করে, তোমরা এর নামে যে যে দোষারোপ করেছ তার কোনও দোষ এরমধ্যে পাইনি; হেরোদও পাননি, কারণ তিনি তাঁকে আমাদের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছেন, বাস্তবিক প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কাজ এ করেনি; অতএব, আমি তাঁকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।" (লুক, ২৩ : ১৩-১৬)।

সুতরাং, আঞ্চলিক শাসনকর্তা পীলাত যীশুকে নির্দোষ ও নিরপরাধী বলে ঘোষণা করেছেন, ইহুদীয়ার রাজা হেরোদও নিরপরাধী বলে তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দিয়েছেন। তাই স্পষ্টভাবে জানা যায়, এ অবস্থায় ধার্মিক, নিরপরাধ ও নিঃসহায় যীশুকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে হত্যা করার নিষ্ঠুর আদেশ দেয়া বা কোনপ্রকারে তার সহায়তা করা শাসনকর্তাদের কারওপক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব বলে বিবেচিত হতে পারে না।

পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনা ঃ

ইতিপূর্বে জানা গেছে, প্রাদেশিক শাসনকর্তা পীলাত ও রাজা হেরোদ কেউই যীশুকে কোনওপ্রকারে অপরাধী সাব্যস্ত করেননি, তাঁকে ক্রুশে দিয়ে বধ করার দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করেননি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ অবস্থায় তাঁকে এ দণ্ডদানের ব্যবস্থা করার ভার অর্পিত হয়েছিল কার বা কাদের উপর? কেউ কেউ অনুমান করতে পারেন, পীলাত যখন তাঁকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে বধ করতে প্রস্তুত হননি, বরং তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন, অন্যদিকে ইহুদীরা যখন তাঁকে ক্রুশে দিয়ে বধ করার জন্য চরমভাবে উৎসুক হয়ে উঠেছিল, তখন সঙ্গতভাবে অনুমান করা যায়, ইহুদীরাই তাঁকে ক্রুশে দিয়ে নিহত করেছিল। তবে এমন অনুমান করা সঙ্গত হবে না। কারণ, প্রধানত যে বাইবেলকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টানদের মৌলিক বিশ্বাস ও সংস্কারগুলোর বিচার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, তাতে এই অনুমানের বিপরীত প্রমাণই পাচ্ছি। সাধু যোহনের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে— ইহুদীদেরকে কোনপ্রকারে নিরস্ত করতে না পেরে, *"পীলাত তাদেরকে বললেন, তোমরাই একে নিয়ে যাও, নিজেদের ব্যবস্থামতে এর বিচার কর। ইহুদীরা তাঁকে বলল, কারও প্রাণনাশ করা আমাদের পক্ষে বিধেয় নয়।"* (যোহন, ১৮ : ৩১-

৩২) ।— এ থেকে জানা যায়, যীশুকে ক্রুশে দেয়ার ভার ন্যস্ত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে পীলাতের উপর, ইহুদীদের উপর নয়। মথির বর্ণনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, "তখন দেশাধ্যক্ষের সৈন্যেরা যীশুকে ... ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য নিয়ে গেল।" (মথি, ২৭ : ২৭-৩১)

কিছুটা অবান্তর হলেও এখানে পাঠকদেরকে পীলাতের ঘোষণাটি আবার স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত : *"বাস্তবিক প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কাজ এ করেনি। অতএব আমি তাঁকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।"* (লূক, ২৩ : ১৫-১৬)।

পাঠকদের অবগতির জন্য এখানে ঐতিহাসিক একটি প্রতিবেদন পত্রস্থ করাও প্রয়োজন ঃ এই প্রতিবেদনটি যীশুর নির্দোষিতার স্বপক্ষে এবং তাঁকে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে গভর্নর পীলাত মহামান্য তাইবেরিয়াস সিজার-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। চামড়ার উপর লেখা সেই প্রতিবেদনটি এখনও রোমের ভ্যাটিক্যান লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত আছে। আর এর ইংরেজি অনুবাদটি সংরক্ষিত আছে লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, ওয়াশিংটনে। স্প্যানিস দার্শনিক আন্দ্রেজ ফিবার কাইজার-এর পুস্তক থেকে প্রতিবেদনটি গ্রন্থস্থ করা হল ঃ

তাইবেরিয়াস সিজার সমীপে—

"গালীলে ঈশ্বর প্রেরিত এক যুবকের আবির্ভাব ঘটে, যে তাঁর প্রভুর নামে নতুন আইন ঘোষণা করে— আইনটি হলো নম্রত্ব। প্রথম আমি মনে করেছিলাম ঐ যুবকের অভিপ্রায় হল জনসাধারণকে রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা। কিন্তু আমার ধারণা অনতিবিলম্বে ভুল প্রমাণিত হয়। নাসরতীয় যীশু ইহুদীদের চেয়ে রোমানদের প্রতিবেশি ভ্রাতৃত্বসুলভভাবে কথা বলেন।

একদিন আমি লক্ষ্য করলাম, একজন যুবক গাছে ঠেস দিয়ে শান্তভাবে সম্মিলিত কিছু লোকের সাথে কথা বলছেন। ওরা আমাকে বলল, লোকটি যীশু। যেহেতু লোকটিকে আমি বিরক্ত করতে চাইনি; তাই আমি নিজের পথে পা বাড়ালাম; শুধু আমার সচিবকে বললাম, 'ওদের সাথে দাঁড়িয়ে কথা শোন।'

পরে আমার সচিব আমাকে বলল, লোকটির বক্তব্যের সাথে আমার পঠিত দার্শনিক গ্রন্থাবলীর বক্তব্যের কোন মিল নেই। এবং লোকটি জনসাধারণকে উচ্ছন্নে ঠেলে দিচ্ছে না, এমনকি তাদের ক্ষেপিয়েও তুলছে না। *এ জন্যই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যীশুকে রক্ষা করতে হবে।* তাঁর ইচ্ছানুসারে আচরণের কথা বলার ও সভা ডাকার স্বাধীনতা ছিল। এ সীমাহীন স্বাধীনতার জন্য ইহুদীরা ক্ষেপে যায়। কিন্তু দরিদ্রের কোন

ক্ষত হয়নি। আবার ধনী ও ক্ষমতাবানরা এতে অস্বস্তিবোধ করে। পরবর্তীতে যীশুকে একটি পত্র লিখি— ফোরাম (Forum)— এ তাঁর সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করে। তিনি এসেছিলেন। এই অসাধারণ ব্যক্তিটিকে আমি কিছুটা বুঝতে চেষ্টা করি। তাঁর অবয়ব বা চরিত্রে দোষণীয় কিছু ছিল না। তাঁর উপস্থিতিতে আমি গভীর শ্রদ্ধাবোধ করি। তিনি আমাদের সবাইকে তাঁর সারল্য, নম্রতা ও প্রেম দ্বারা প্রভাবিত করেন। হে মহান সম্রাট এ-সবই নাসরতীয় যীশু সম্বন্ধে ভাবনার বিষয়। এবং আমি এ বিষয়ে আপনাকে বিস্তারিত অবগত করলাম। *আমার অভিমত হল যীশু কোন অপরাধমূলক কাজ করেননি।* আমাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, যীশু বাস্তবিকই ঈশ্বর সেবক।

আপনার অনুগত ভৃত্য,
পন্তিয়াস পীলাত"

যাহোক, যীশুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে দেশাধ্যক্ষ পীলাত আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না এবং বিপুল ইহুদী-জনতার সামনে নিজের সেই সংকল্পকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। পক্ষান্তরে, ঐতিহাসিক বিচারালোচনার দ্বারা এ সত্যটিই অনাবিলরূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে যে, যীশুর প্রাণরক্ষার জন্য পীলাত প্রথম থেকেই সচেষ্ট হন এবং এতোদ্দেশ্যে তিনি যীশুর প্রকৃত শিষ্য হাওয়ারীদেরকে প্রথম থেকে সহায়তা করেও আসছিলেন। এ দাবীর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ বাইবেলে রয়েছে। উপস্থিত ইহুদীদের *'কারও প্রাণ নাশ করা আমাদের পক্ষে বিধেয় নয়'*— এই 'সাধুতার' কারণ সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলে যায় :

পীলাতের প্রস্তাবের উত্তরে ইহুদীরা বলছে, "কারও প্রাণনাশ করা আমাদের পক্ষে বিধেয় নয়।" কিন্তু অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, আল্লাহ্'র প্রেরিত নবী-রসূলদেরকে হত্যা করতেও তারা পূর্বে কোনদিনই দ্বিধাবোধ করেনি। তাদের ধর্মীয় ইতিহাসেও এর অনেক নজীর আছে। এ অবস্থায়, বিশেষতঃ যীশুকে হত্যা করার জন্য তাদের এই ব্যাকুল ব্যগ্রতা সত্ত্বেও তারা নিজেদের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে যীশুকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে বধ করতে অসম্মত হন বিশেষ দুটো কারণে। প্রথমত, রাজ-শক্তির বিরূপ মনোভাব, প্রকাশ্যভাবে যীশুর বিরুদ্ধে উত্থান করার মত সৎ-সাহস এই কাপুরুষ জাতির ছিল না। দ্বিতীয়ত, তখন স্বয়ং ইহুদী সমাজে আন্তঃবিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ার প্রবল আশংকা এবং যীশুর প্রকৃত শিষ্য হাওয়ারীদের সুসংহত ও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রবণতা।

যাহোক, পীলাত যখন ঘোষণা করলেন, বাস্তবিক প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কাজ এ করেনি; তাই আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব, তখন তিনি লোকদের বললেন ঃ

"দেখ, আমি এঁকে তোমাদের নিকট বাইরে আনছি যেন তোমরা জানতে পার, আমি এঁর কোন দোষ পাচ্ছি না।" (যোহন, ১৯ : ৪)।

কিন্তু "প্রধান পুরোহিতেরা ও অনুচরেরা চেঁচিয়ে বলল, "ক্রুশে দাও, ক্রুশে দাও।" পীলাত তাদের বললেন, "তোমরা নিজেরা এঁকে নিয়ে গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ কর; কারণ এঁর কোন দোষ আমি পাচ্ছি না।"

ইহুদীরা তাঁকে উত্তর দিল, আমাদের এক বিধি-ব্যবস্থা আছে, আর আমাদের ব্যবস্থানুসারে তাঁর মৃত্যু হওয়া উচিত কারণ এ নিজেকে ঈশ্বর-পুত্র বলে দাবী করেছে। পীলাত এ কথা শুনে অত্যন্ত ভীত হলেন; তিনি আবার রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে যীশুকে বললেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ? কিন্তু যীশু তাঁকে কোন উত্তর দিলেন না। এতে পীলাত তাঁকে বললেন, 'তুমি কি আমার সাথে কথা বলবে না? তুমি কি জান না, তোমাকে মুক্ত করার ক্ষমতা আমার আছে আর তোমাকে ক্রুশবিদ্ধ করার ক্ষমতাও আমার আছে?' যীশু তাকে উত্তর দিলেন, 'উর্ধ্ব থেকে তোমাকে দেয়া না হলে, আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার কোন ক্ষমতাই তোমার থাকত না; এজন্য 'তোমার হাতে যে আমাকে সমর্পণ করেছে, তারই পাপ বরং গুরুতর।" (যোহন, ১৯ :৬-১১)।

"এরপরে পীলাত তাঁকে মুক্তিদান করতে চেষ্টা করলেন (যোহন, ১৯ : ১২)। তিনি আবার বাইরে গিয়ে ইহুদীদের কাছে বললেন, 'আমি এঁর কোনই দোষ পাচ্ছি না; তোমাদের এক রীতি আছে যে, নিস্তার-পর্বের সময় আমি একজনকে মুক্ত করে তোমাদের দিই?' তারা সবাই আবার চেঁচিয়ে বলল, 'এঁকে যদি মুক্তিদান করেন, তবে আপনি কৈসরের বন্ধু নন। যে কেউ আপনাকে রাজা বলে প্রতিপন্ন করে, সে কৈসরের বিরোধী। একথা শুনে পীলাত যীশুকে বাইরে এনে, যে স্থানকে শিলাস্ত রণ বলে (ইব্রীয় নাম 'গাব্বাথা') সেই স্থানে বিচারাসনে বসলেন। সেদিন নিস্তারপর্বের আয়োজনের দিন, বেলা প্রায় ছয় ঘটিকা, পীলাত তাদের বললেন, এই দেখ, তোমাদের রাজা। 'তারা চিৎকার করে বলল, দূর কর, এঁকে ক্রুশে দাও। পীলাত তাদের বললেন, তোমাদের

রাজাকে কি ক্রুশবিদ্ধ করবে? প্রধান পুরোহিতেরা উত্তর দিল, কৈসর ব্যতীত আমাদের রাজা নেই।" (যোহন, ১৯ : ১২-১৫)।

"পীলাত তখন দেখলেন, এতে কোন লাভ হচ্ছে না, বরং আরও গোলমাল হচ্ছে, তখন পানি নিয়ে তিনি লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, এই ধার্মিকের রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ; তোমরাই তা বুঝবে। তাতে সকল লোক উত্তরে বলল, তাঁর রক্তপাতের দায়িত্ব আমাদের ও আমাদের সন্তানদেরই উপরে বর্তুক। তখন তিনি বরাব্বাকে মুক্ত করে তাদের দিলেন এবং যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। (মথি, ২৭ : ২৪-২৬)। তখন দেশাধ্যক্ষের সৈন্যেরা যীশুকে ... ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য নিয়ে গেল।" (মথি, ২৭ অধ্যায়)।
"সৈন্যেরা কাঁটার একটি মুকুট গেথে তাঁর মস্তকে দিল এবং তাঁকে 'বেগুনী' রংয়ের পোশাক পরাল।" (যোহন, ১৯ : ২)। তারা যখন তাকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন কুরীণী নিবাসী শিমোন নামে একটি লোক পল্লীগ্রাম থেকে আসছিল, তাকে ধরে তারা তার কাঁধে ক্রুশ রাখল, যেন সে যীশুর পিছনে পিছনে তা বহন করে।" (লূক, ২৩ : ২৬)।

"আরও দু'জন দুস্কৃতিকারী হত হওয়ার জন্য তাঁর সাথে নীত হল।" (লূক, ২৩ : ৩২)। যোহন বলেছেন, "তিনি নিজের ক্রুশ নিজে বহন করে মাথার খুলির স্থান, যাকে ইব্রীয় ভাষায় গল্‌গথা বলে, এতুদক্ষেত্রে, উপস্থিত হলেন।" (১৯ : ১৭)।

সুতরাং দেখা যায়, ইহুদী পণ্ডিত-পুরোহিতদের ষড়যন্ত্র সার্থক হলে ক্রুশে টাঙ্গানোর জন্য দেশাধ্যক্ষের নির্দেশ প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত হল অর্থাৎ, ইহুদী পণ্ডিত-পুরোহিতেরা যীশুকে আদালতে দোষী সাব্যস্ত করতে না পারলেও এবং পীলাত যীশুকে নির্দোষ জানলেও ইহুদী জনগণ এবং বিশেষ করে পণ্ডিত-পুরোহিতদের চাপে পড়ে যীশুকে ক্রুশের শাস্তি দিতে বাধ্য হলেন।

অতঃপর যীশুকে সৈন্যদের হাতে সমর্পণ করা হলে যথারীতি তাঁর মাথায় কাঁটার তাজ পরান হল, তাঁর পরিহিত বস্ত্র অপহৃত হল এবং নিজের ক্রুশ নিজে বহন করে তিনি গল্‌গথা বদ্ধভূমির পানে এগিয়ে গেলেন দুজন দুস্কৃতপরায়ণ অপরাধীর সহচররূপে।

যীশুর জয়যাত্রা ঃ খ্রিস্টান লেখকদের মতে, এখান থেকে শুরু করে যীশুর জীবন অবসানের শেষ অধ্যায়। কিন্তু, নিরপেক্ষ সংস্কারমুক্ত চিন্তাধারা নিয়ে

আলোচনা করলে জানা যাবে যে, বস্তুতঃ গল্‌গথা থেকে শুরু হয় যীশুর নবী-জীবনের প্রথম বিজয় অভিযান পীলাত ও হাওয়ারীদের সম্মিলিত উদ্যোগ আয়োজনের বাস্তব রূপায়ন।

ইহুদী যাজক, পুরোহিত এবং ইহুদী সমাজের জনসাধারণ বা নিজেদের ষড়যন্ত্রের সাফল্যগর্বে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসেছিল গল্‌গথার বধ্যভূমিতে, যীশুর 'অভিশপ্ত' জীবনের শেষ তামাশা দেখতে। কিন্তু সেখানে এসে তারা দেখতে পেল, ক্রুশের উপর পীলাতের যে 'চার্জ-সীট বা অপরাধ-পত্র,' টাঙ্গানো হয়েছে, তাতে লেখা আছে, 'নাসরতীয় যীশু, ইহুদীদের রাজা।' সুসমাচার রচয়িতাদের বিবরণ থেকে এও জানা যাচ্ছে যে, স্থানীয় জনসাধারণের সবাই যাতে ঐ চার্জ-সীটটি পড়তে ও বুঝতে পারে, সেজন্য তা লেখা হয়েছিল, 'হিব্রু, রোমান ও গ্রীক' ভাষায়। এই সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ইহুদীদের যে কিরূপ দুরবস্থা ঘটেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। তখন তারা দিশেহারা হয়ে পীলাতের নিকট উপস্থিত হল এবং তাঁকে বলল, 'ইহুদীদের রাজা' এই কথা বাদ দিয়ে লিখে দিন, 'এই ব্যক্তি বলত আমি ইহুদীদের রাজা।' এথেকে জানা গেল, পীলাতও বধ্যভূমির নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করছিলেন। সে যাই-হোক, পীলাতের সকল উদ্যোগ আয়োজন তখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই তিনি আর ইহুদী বিদ্রোহের আশংকায় 'ভীত' হলেন না, বরং সুদৃঢ় ভাষায় জানিয়ে দিলেন, "আমি যা লিখেছি, তা লিখেছি।" আরবি সুসমাচারে এখানে 'কাদ্‌' শব্দ থাকাতে পীলাতের উক্তির অনুবাদ হবে, "যা লিখেছি, ঠিক লিখেছি (কাদ কুদিবাতুন) অর্থাৎ, তার আর কোন পরিবর্তন ঘটতে পারবে না। যীশুর অনুকূলে, পীলাতের এই দৃঢ়তা থেকে ভাবী অবস্থার একটি স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। ইহুদীরাও এটা বুঝতে পেরেছিল এবং এজন্য সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করতেও ত্রুটি করেননি। কিন্তু যীশুর শিষ্য হাওয়ারীরাও চুপ করে বসে থাকেননি। তাঁদের দূরদর্শিতা ও কর্মকুশলতার পরিচয় পরবর্তী ঘটনাক্রম থেকে জানা যাবে।

যাহোক, "দিনের তৃতীয় ঘটিকায় তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করল। তাঁর দোষ-পত্রে লেখা হল 'ইহুদীদের রাজা'। তাঁর সাথে তারা দু'জন দস্যুকেও ক্রুশবিদ্ধ করল, একজনকে তাঁর ডানপাশে, আর একজনকে তাঁর বামপাশে দিল (মার্ক, ১৫ : ২৫-২৭; যোহন, ১৯ : ১৮)।

> যীশু উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, 'এলোই, এলোই, লামা শবক্তানী' অর্থাৎ 'প্রভু, প্রভু আবার কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?' (মার্ক, ১৫ : ৩৪; মথি, ২৭ : ৪৬)। তাতে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল ... একথা শুনে তাদের মধ্যে একজন অমনি দৌড়ে গিয়ে একটি স্পঞ্জ নিল, তা

'সিরকা' দিয়ে সিক্ত করল এবং একগাছা নলে লাগিয়ে তা যীশুকে পান করতে দিল' (মার্ক, ১৫ : ৩৬)। সেইস্থানে সিরকাপূর্ণ একটি পান পাত্র ছিল। (যোহন, ১৯ : ২৯)।

"আয়োজনের দিন ছিল বলে, বিশ্রাম-বারে দেহগুলো যাতে ক্রুশের উপর না থাকে— কারণ, সেই বিশ্রাম-বার বিশেষ দিন ছিল— এজন্য ইহুদীরা (রাষ্ট্রীয় বিধান অনুসারে) পীলাতের নিকট অনুরোধ করল যেন পা ভেঙ্গে দিয়ে তাদের সরান হয়। তাতে সৈনিকেরা এসে সেই প্রথম জনের পা ভাঙ্গল এবং যীশুর সাথে ক্রুশবিদ্ধ সেই অন্যজনেরও ভাঙ্গল; তারা যীশুর নিকট এসে, তিনি ইতিমধ্যে মরে গেছেন মনে করে, তাঁর পা ভাঙ্গতে বিরত রইল; কিন্তু সৈন্যদের একজন বর্শা দিয়ে তাঁর পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করল; আর তখনই তরল রক্ত বের হল।" (যোহন, ১৯-৩১-৩৪)।

ইতিপূর্বে দেখা গেছে,

"পীলাত সমস্ত প্রধান পুরোহিত ও অধ্যক্ষ সকলকে এবং জাতির লোককে ডেকে একত্র করলেন ও তাদের বললেন, লোকটি জাতিকে বিপথগামী করছে বলে তোমরা তাঁকে আমার সামনে উপস্থিত করেছ; আর আমি তোমাদের সাক্ষাতে অনুসন্ধান করে, তোমরা এঁর নামে যে যে দোষারোপ করেছ তার কোনও দোষ এঁর মধ্যে পাইনি; হেরোদও পাননি; কারণ তিনি তাঁকে আমাদের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছেন; বাস্তবিক প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোন কাজ এ করেনি; অতএব আমি তাঁকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।" (লূক, ২৩ : ১৩-১৬)।

সুতরাং, বাইবেল থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পীলাত যীশুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে কখনো প্রস্তুত ছিলেন না এবং বিপুল ইহুদী জনতার সামনে নিজের এই সংকল্পকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। যীশুর প্রাণরক্ষার জন্য তিনি বাস্তবে যা করেছিলেন, তাঁর কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

এক. পীলাত যীশুর বিচার উদ্দেশ্যমূলকভাবে শুক্রবারে করেছিল এবং তাঁর রায়কে কার্যকর করার জন্য সে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সেদিনই আদেশ জারী করেছিল, কারণ সে জানত যে পরদিন পবিত্র সা'বাত এবং যীশুকে শুক্রবার সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই ক্রুশ থেকে নামিয়ে নিতে হবে।

দুই. যীশুকে ক্রুশে দেয়ার পূর্বে এবং পরেও সিরকা এবং মদ জাতীয় দ্রব্য পান করতে দেয়া হয়, যাতে তিনি বেহুশ থাকেন এবং তাঁর কষ্ট কম হয়।

তিন. ইহুদীদের ব্যবস্থাশাস্ত্রে নির্দেশিত (দ্বিঃ বিঃ ২১ : ২২-২৩)। মুসার বিধি-ব্যবস্থায় বর্ণিত বিধানের যাতে ব্যতিক্রম করা না হয় সেজন্য ইহুদীদের অনুরোধে পীলাতের নির্দেশে তাঁর সৈনিকেরা যীশুর সাথে ক্রুশবিদ্ধ দু'ব্যক্তির পা ভাঙ্গে, কিন্তু যীশুর পা ভাঙ্গতে বিরত থাকে।

পীলাত যে কেমন সতর্কতার সাথে নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করে আসছিলেন, শেষোক্ত ঘটনাটিই তার উজ্জ্বল প্রমাণ। এর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে খ্রিস্টান লেখকদের কেউ কেউ যে-সব যুক্তি প্রদান করেন, তার সারমর্ম এই যে, রাজকীয় সৈনিকেরা মনে করেছিল যে যীশু ইতিমধ্যে মরে গেছেন, সুতরাং তাঁর পা ভাঙ্গার প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যীশুকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই যে দেশাধ্যক্ষ পীলাতের ইঙ্গিত অনুসারে তাঁর সৈনিকেরা যীশুর পা ভাঙ্গতে বিরত হয়েছিল ক্রুশ কাহিনীর আনুষঙ্গিক বিবরণ থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

"ক্রুশে যীশুর মৃত্যু হয়েছিল, অথচ তাঁর পা ভাঙ্গা হয়নি"— এই পরস্পর বিরোধী উক্তির কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে খ্রিস্টান প্রচারকেরা বাইবেলের নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন :

> *"এসব ঘটল, যেন এই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হয় : তাঁর একখানি অস্থিও ভাঙ্গা হবে না।'* (যোহন, ১৯ : ৩৬)।

কিন্তু যোহন এখানে যে শাস্ত্রীয় বচনের বরাত দিয়েছেন, তার সাথে যীশুর ক্রুশে মৃত্যু বা তাঁর পা না ভাঙ্গার বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ সংস্রব নেই। যীশুর পরবর্তীকালে, অর্থাৎ পৌত্তলিক রোমান ও গ্রীক জাতির সাথে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যে আপোষ-নিষ্পত্তি হয়, তার মর্যাদা রক্ষার জন্য তৎকালীন খ্রিস্টান প্রধানরা নিজেদের শাস্ত্রে ও সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরে যেসব বিকৃতি করেছিল, যোহনের এই বিবরণটি তার একট সুস্পষ্ট নজীর।

বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য যোহনের আলোচ্য উক্তিটি উদ্ধৃত করে দেয়া হল। যীশুর পা ভাঙ্গা প্রসঙ্গে যোহন বলছেন, "এসব ঘটল, যেন এই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হয়— তাঁর একখানি অস্থিও ভাঙ্গা হবে না"— এর মাধ্যমে যোহন বোঝাতে চাচ্ছেন যে, ইহুদী ধর্মশাস্ত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে ক্রুশে যীশুর একখানি অস্থিও ভাঙ্গা হবে না। প্রচলিত বাইবেলগুলোর টীকায় উক্ত ধর্মশাস্ত্রের পরিচয় দেয়ার জন্য তাদের পাঠকবর্গকে যাত্রা পুস্তকের বারো অধ্যায়ের তেতাল্লিশ পদ দেখার উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু যোহনের বর্ণিত ঘটনার সাথে যাত্রা পুস্তকের ঐ বর্ণনার বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ সংস্রব নেই। বনি-

ইস্রায়ীল জাতি দীর্ঘ চারশ' ত্রিশ বছর মিসর রাজের গোলামী-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার পর, যে রাতে হযরত মূসার নেতৃত্বে মিসর থেকে পালিয়ে আসেন, সেই রাতে তারা তাড়িশূন্য পিঠে তৈরি করেছিলেন এবং তা খেয়ে পুনরায় যাত্রা শুরু করেন। এই পবিত্র রাতের স্মৃতি রক্ষার্থে তারা প্রতিবছর ঐ দিনে 'নিস্তার-পর্ব' নামে একটি পর্বোৎসব বা 'ঈদ' পালন করে থাকেন। এই ধর্মীয় উৎসবে যেসব পশুবলি (কোরবানী) দেয়া হবে, তার মাংসাদির ব্যবহার সম্বন্ধে মোশির 'যাত্রা পুস্তকে' কয়েকটি বিধি-নিষেধ প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণভাবে পরবর্তীতে উদ্ধৃত করা হচ্ছে, পাঠক সাধারণ এর মাধ্যমে যোহনের বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত স্বরূপটি অবগত হতে পারবেন। যাত্রা-পুস্তকের আলোচ্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

> *"আর সদাপ্রভু মোশি ও হারুণকে বললেন, নিস্তার-পর্বের বলির বিধি এই— অন্য জাতীয় কোন লোক তা ভোজন করবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তির যে দাস রৌপ্য দ্বারা ক্রীত হয়েছে, সে যদি ছিন্নত্বক হয়, তবে খেতে পাবে; প্রবাসী কিংবা বেতনভোগী তা খেতে পাবে না; তোমরা এক গৃহমধ্যে তা ভোজন করো; সেই মাংসের কিছুই ঘরের বাইরে নিয়ে যেয়ো না; এবং তার একখানি অস্থিও ভেঙ্গো না।"* (যাত্রা পুস্তক, ১২ : ৪৩-৪৬)।

এসব নির্দেশ খ্রিস্টজন্মের তের-চৌদ্দশ' বছর পূর্বে মুসা ও হারুণকে নিস্তার-পর্বের বলি বা কোরবানীকৃত পশুসমূহের অস্থি ও মাংসের ব্যবহার সম্বন্ধে দেয়া হয়। এরমধ্যে কোরবানীকৃত পশুর হাড় ভাঙ্গতে নিষেধ করা হয়েছিল মুসার সমসাময়িক ইহুদীদেরকে। এরসাথে যীশুর ক্রুশে আবদ্ধ হওয়ার বা তাঁর পা না ভাঙ্গার বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ-সংস্রব নেই। আসল কথা এই যে, যীশুর পরবর্তী সুসমাচার লেখকেরা তাদের আবিষ্কৃত অভিনব খ্রিস্টধর্মের সমর্থন-সংগ্রহের আগ্রহাতিশয্যের ফলে, এভাবে নিজেদেরকে বিচারের দৃষ্টিতে হেয় করে ফেলেছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, পীলাতের আদেশ অনুসারে তাঁর সৈন্যেরা অন্য দু'জন অপরাধীর পা ভেঙ্গে দিয়েছিল; কিন্তু যীশুর পা ভাঙ্গতে বিরত হয়েছিল। সে সময়ের পূর্বেই যীশু মরে গেছেন বলে তারা বিরত থাকে— এটা পরবর্তীকালের একটি দুষ্ট কল্পনা। যীশুর সাথী অপরাধীদ্বয় যে তখনও বেঁচেছিল, এটা তারাও স্বীকার করেছেন; আর পীলাতের সতর্কতা ও সহানুভূতি সত্ত্বেও যীশু তাদের পূর্বেই মরে গেলেন, এর কোনই কারণ থাকতে পারে না। কোন ব্যক্তিকে ক্রুশে দিলে সে একদিনে মরত না। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় অনেকে সাতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকত। ক্রুশ শূল নয়, পরন্তু ত্রিশুল কাঠ, যাতে অপরাধী ব্যক্তির হাত,

পা ও স্কন্ধের চামড়া টেনে পেরেক ঠুকে টাঙ্গিয়ে দেয়া হত। যাহোক, যীশুকে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ক্রুশে রাখার পর নামানো হয়। যখন তাঁকে ক্রুশ থেকে নামানো হল তার পূর্বে একজন সৈনিক বর্শা দিয়ে তাঁর পার্শ্বদেশে আঘাত করল, আর সাথে সাথে তরল রক্ত বের হল (যোহন, ১৯ : ৩৪)।

উল্লেখ্য যে, লন্ডনে মুদ্রিত বৃটিশ ও বিদেশী বাইবেল সোসাইটির যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায় ৩৪ পদের এই বর্ণনার অর্থ তখনও যীশু জীবিত ছিলেন। কারণ, কোন মৃতদেহ থেকে রক্ত বের হয় না, বরং কোন দেহে রক্তের বর্তমান তা জীবনের অভ্রান্ত লক্ষণ।

একটু দৃষ্টিপাত করলেই স্পষ্ট হয়, নিস্তার-পর্বের বলিকৃত পশুর অস্থির ভাঙ্গার নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল যীশু-জন্মের তের-চৌদ্দশ' বছর পূর্বে হযরত মুসার সময়। অধিকন্তু, সে আদেশে বলা হয়েছে ঃ বলিকৃত পশুর একখানি অস্থিও তোমরা ভেঙ্গো না। পক্ষান্তরে, সাধু যোহন খ্রিস্ট-জন্মের তের-চৌদ্দশ' বছর পূর্বের ঐ আদেশের উল্লেখ করেছেন : বলিকৃত পশুর স্থলে আল্লাহ্'র প্রিয় নবী হযরত ঈসার উপর অকর্মক ক্রিয়া হিসেবে 'তার' স্থলে 'তাঁর' বসিয়ে 'নির্দেশের' স্থলে 'সংবাদ' হিসেবে 'তাঁর' একখানি অস্থিও ভাঙ্গা হবে না' বলে।

যাহোক, পীলাত ও হেরোদ উভয়েই যীশুকে নিরপরাধী বলে স্বীকার করেছেন এবং রক্তলোলুপ ইহুদীদের পৈশাচিক কবল থেকে রক্ষা করার জন্য যীশুর প্রকৃত শিষ্য হাওয়ারীদেরকে গোপনে সাহায্য-সহায়তাও করেছিলেন। হাওয়ারী-সমাজ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে ভূমিকা হিসেবে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করা হচ্ছে :

যীশু যখন ইহুদীদের দ্বারা গ্রেফতার হলেন, "তখন শিষ্যরা তাঁকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল" (মথি, ২৬ : ৫৬; মার্ক, ১৪ : ৫০), প্রধানতঃ এরইফলে ক্রুশের ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য-বিবরণ সুসমাচার চতুষ্টয়ের কোন স্থানে দেখা যায় না। পরবর্তী যুগের এই সুসমাচারগুলোতে যেসব বিবরণ পাওয়া যায়, সেসব অনেক পরবর্তী সময়ের সংকলন এবং খ্রিস্টান-প্রধানদের নব আবিষ্কৃত প্রায়শ্চিত্তবাদ বা Atonment theory-কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই মতবাদের আবিষ্কার হয়েছিল।

যীশু যখন গ্রেফতার হলেন, "তখন শিষ্যরা তাঁকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল" বাইবেলের এই বর্ণনাকে সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, যীশুর আবির্ভাবের প্রথম অবস্থা থেকেই 'শক্তগ্রীব', ইহুদী জাতি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে আসছিল। তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বেড়ে চলছে দেখে অবশেষে যীশুকে তারা হত্যা করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। এজন্যই

যীশুকে তারা যুগপৎভাবে রাজদ্রোহী ও ইহুদীদের বিপথগামী করছে বলে সমাজে এবং রাজদরবারে অভিযোগ আনা হয়।

সাধারণ নিয়মানুসারে যীশুর শিষ্যদের মধ্যে একদল ছিল সত্যিকার ধর্ম-পরায়ণ, সত্যিকার বিশ্বাসী ও আত্মসমর্পিত 'মুসলিম'। আর একদল ছিল লঘুচেতা ও ছদ্মবেশী বিশ্বাসঘাতক। এই শেষোক্তদলের লোকেরাই যীশুর বিপদের সূচনা দেখে পালিয়ে যায় আর তাদের অনেকেই তাঁকে ইহুদীদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। এমনকি, বিপদের চরম অবস্থায় এই ভণ্ডের দল তাঁর প্রতি হীন ব্যবহার করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

পক্ষান্তরে, যীশুর সত্যিকার শিষ্য 'হাওয়ারীদল' ইহুদীদের দূরভিসন্ধি প্রথম থেকেই সতর্কতার সাথে অনুসরণ করে আসে এবং অনতিবিলম্বে যীশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে রোমান আদালতে উপস্থিত করা হবে, তাও তারা অবগত ছিল।

উপরে যাঁদের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হল, তাঁদের অবস্থা সম্বন্ধে সন্ধান নিলে জানা যাবে যে, গ্রীক দর্শন, বিজ্ঞান বিশেষতঃ দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে তারা সুপরিচিত ছিল। পীলাত যদি ইহুদীদের আন্দোলনে ভীত হয়ে পড়েন এবং যীশুকে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে নিহত করার আদেশ দিয়ে বসেন, সে অবস্থায় যীশুকে রক্ষা করার আর কোনই উপায় থাকবে না এটা তাঁরা ভাল করেই বুঝেছিল, পীলাত ও অন্যান্য রাজকীয় কর্মচারীদের সাথে তাঁরা মোটামুটিভাবে একটি ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। এমনকি, ক্রুশে আবদ্ধ করে নিহত করার দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের জন্য তদানীন্তন দণ্ড-বিধিতে 'পা ভেঙ্গে দেয়া' ইত্যাদি যে সমস্ত প্রাথমিক শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, যীশুর প্রতি যাতে সেসবের প্রয়োগ না হতে পারে, তার ব্যবস্থাও তাঁরা পূর্বথেকেই করে রেখেছিল।

ড. মরিস বুকাইলি তাঁর গবেষণা ও পর্যালোচনা শেষে একটি সুস্পষ্ট সত্য বের করে এনেছেন, আর তা হল : এখন আমাদের নিকট আসমানী কিতাব হিসেবে যে-কয়টি ধর্মগ্রন্থ বিদ্যমান, সেসব ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগৎ অথবা পাশ্চাত্য-শিক্ষিত কোনো কোনো মহল যে ধারণা বা মনোভাব পোষণ করেন, তাঁদের সেই ধারণা এবং মনোভাব তাঁদের অজ্ঞতারই প্রকাশ। কারণ, তাঁদের সেই ধারণা ও মনোভাব আদৌ সত্যতো নয়ই, বরং তাঁদের পূর্ণধারণাই ভিত্তিহীন বা অলীক।

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও সুসমাচারসমূহ অর্থাৎ তাওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল প্রভৃতি এবং প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত কোরআন কোন অবস্থায় কিভাবে ও কখন সংগৃহীত ও সংকলিত হয়, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। সেই পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, ওইসব ধর্মগ্রন্থের সংকলন-ব্যবস্থা ও পরিস্থিতি ছিল আলাদা আলাদা— একটা থেকে আরেকটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। *তিনটি ধর্মগ্রন্থের সংকলনের ক্ষেত্রে পার্থক্যপূর্ণ এই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি*, এটাই হল ড. মরিস বুকাইলির গবেষণার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক। কেননা, পরিস্থিতির এই ভিন্নতার উপরেই নির্ভরশীল রয়েছে উল্লিখিত তিন ধর্মগ্রন্থের বাণী ও বিষয়বস্তুর সত্যতা ও সঠিকত্ব।

বাইবেল পুরাতন নিয়মে অর্থাৎ তাওরাত, জবুর ইত্যাদিতে সঙ্কলিত হয়েছে সাহিত্যগুণসম্পন্ন এমনসব রচনা যেগুলো দীর্ঘ নয়শ' বছর ধরে রচিত হয়েছিল। বাইবেলের এই পুরাতন নিয়ম তথা 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' বস্তুতই এমনসব বৈচিত্র্যপূর্ণ কারুকাজসম্পন্ন রচনার সমাহার। যার একটি থেকে আরেকটি বিচ্ছিন্ন তো বটেই, সেইসাথে ওসব রচনার নকশা, রং ও রূপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষের হাতে বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। মূলগ্রন্থের সাথে নতুন নতুন রচনা এমনভাবে মিশিয়ে দেয়া হয় যে,— কোথা থেকে কোনটা এনে কার সাথে কিভাবে জুড়ে দেয়া হয়েছিল, তা এখন নির্ধারণ করা বাস্তবিকই মুশকিল।

নিউ টেস্টামেন্ট বা প্রচলিত ইঞ্জিল শরীফ অর্থাৎ 'বাইবেলের নতুন নিয়ম' বিশেষত সুসমাচারসমূহ সংকলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যীশুখ্রিস্ট বা হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে মানুষের জন্য যেসব বাণী ও বক্তব্য রেখে যান এবং তাঁর বিভিন্ন কাজকর্মের যেসব বিবরণী জানা ছিল, সেগুলো একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, যাঁদের দ্বারা এসব বাণী, বক্তব্য ও বিবরণী সংকলিত হয়েছিল, তাঁরা কেউই সেসব বাণীর ও কর্মের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ও শ্রোতা ছিলেন না। বরং, তখন সমাজে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের (যেমন জুডিও ক্রিশ্চিয়ানিটি) প্রাদুর্ভাব ছিল বেশি। ওইসব সম্প্রদায়ের মধ্যে যীশুখ্রিস্টের জীবনী ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে নানাধরনের কাহিনী প্রচলিত ছিল। বাইবেলের সুসমাচার তথা ইঞ্জিল শরীফের লেখকবৃন্দ ছিলেন তদানীন্তন আমলের এক-একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ। সুতরাং, সেই অবস্থানে থেকেই তাঁরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বা লিখিত কাহিনীসমূহ সংকলন করে যান, কিন্তু ওইসব কাহিনী বা রচনা এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে সঞ্চারিত হওয়ার সময় মধ্যবর্তী যেসব স্তর বা পর্যায় অতিক্রম করে সেসব পর্যায়ের রচনাবলী বিলুপ্ত হয়ে যায় অনেক আগেই। শুধু তাই নয়, সেই সাথে বিলুপ্ত হয় সেই আদি কাহিনী বা মূল রচনাগুলোও। সুতরাং, এখন বাইবেলের নতুন নিয়ম তথা ইঞ্জিল শরীফ বলে যে কিতাবটা পাওয়া যায়, তা মূল আসমানী কিতাব ইঞ্জিলের সাথে যে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ, তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই।

অতএব, এখন যদি নিরপেক্ষভাবে বিচার করতেই হয়, তবে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় গ্রন্থ তথা বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের অর্থাৎ তাওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলের বিচার-পর্যালোচনা করতে হবে সেই পরিস্থিতির আলোকেই। শুধু তাই নয়, সেই বিচার-পর্যালোচনাকে যদি নিরপেক্ষ রূপ দিতে হয় তবে বাইবেল-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত পণ্ডিত পুরোহিত ধর্মতত্ত্ববিদগণ কে কি বললেন বা না বললেন, তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করাও চলবে না।

প্রকৃতপক্ষে, বাইবেলের মধ্যে রয়েছে নানাবিধ স্ববিরোধিতা ও বৈপরিত্য। কারণ, এসব কাহিনী ও রচনা গ্রহণ করা হয়েছে নানাভাবে, নানা উৎস থেকে। এই গ্রন্থে যে ধরনের স্ববিরোধিতা ও বৈপরিত্যের ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। ফ্রান্সের মধ্যযুগের গাথা-কবিতার লেখকগণ তাঁদের বর্ণনাকে যেভাবে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে পরিবেশন করতেন, বাইবেলের সুসমাচার-লেখকগণও যীশুর

কথা বলতে গিয়ে ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন ঘটনাকে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে তুলে ধরেছেন। এর কারণ, লেখকবৃন্দ নিজ নিজ অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ঘটনাগুলো উপস্থাপন করেছেন। তাই অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁদের বর্ণিত কোনো কোনো ঘটনা এত অস্পষ্ট যে, সেসবের সত্যতা ও সঠিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়। আর এ কারণেই ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ তথা গোটা বাইবেলের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণে সতর্কতা অপরিহার্য।

এ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে নানা তথ্যজ্ঞানের আলোকে যেসব আলোচনা ও পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট হয় বাইবেলের বর্ণনার মধ্যে কেন এতটা বৈপরিত্য, কেন সেখানে এতরকম অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ এবং কেনই বা বাইবেলের প্রতিটি বর্ণনার পরতে-পরতে এতটা অসঙ্গতি। কোনো সচেতন খ্রিস্টান যখন এসব উপলব্ধি করেন, তখন তিনি বিস্ময়ে অবাক না হয়ে পারেন না। এ কারণেই ধর্মীয় দিকদিয়ে স্বীকৃত ভাষ্যকারবৃন্দ বাইবেল-সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণার ফলাফল ধামাচাপা দেয়ার জন্য গোড়া থেকেই এত প্রয়াস-প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এজন্য তাঁরা নানা বাগাড়ম্বরে কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে কখনো বা ইনিয়ে-বিনিয়ে অত্যন্ত চালাকির সাথে একযোগে আত্মপক্ষ সমর্থনের এমন একখানা আবহাওয়া সৃষ্টি করেন যে, মূলবিষয় থেকে দৃষ্টি সহজেই অন্যদিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। মথি ও লুকের সুসমাচারে বর্ণিত যীশুখ্রিস্টের বংশাবলীপত্র এ বিষয়ের একটি চমৎকার উদাহরণ।

যীশুখ্রিস্টের পরস্পর বিপরীত এই দুই বংশাবলীপত্র বৈজ্ঞানিক বিচারে গ্রহণেরও অযোগ্য। খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদগণের এই রাখঢাকের মনোভাব পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। যোহন-লিখিত সুসমাচারের পর্যালোচনায় বিশেষ মনোযোগ দেয়া হয়েছে। এর কারণ, এই সুসমাচারটি বাদবাকি তিনটি সুসমাচার থেকে বিশেষভাবে আলাদা। যেমন— 'ইউকেরিস্ট' বা 'প্রভুর ভোজস্থাপন' পর্বটির কথা। যোহনের সুসমাচারে (বাংলা ইঞ্জিল শরীফের ইউহোন্না অধ্যায়) এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খ্রিস্টীয়-অনুষ্ঠান সম্পর্কে আদৌ কোনো বর্ণনা যে নেই, তা অনেক খ্রিস্টানই জানেন না।

ঐশীগ্রন্থ হিসেবে কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার যে ইতিহাস, তার সাথে অপর দুই ধর্মগ্রন্থের অর্থাৎ, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও বাইবেলের নতুন নিয়ম-এর রচনা ও সংকলন-ইতিহাসের পার্থক্য একদম মৌলিক। কোরআন প্রায় সুদীর্ঘ বিশবছর ধরে অবতীর্ণ হয়েছে; এবং যে মুহূর্তে কোরআনের যে অংশ প্রধান

ফিরিশতা জিবরাঈলের মাধ্যমে মোহাম্মদের (দঃ) নিকট পৌঁছানো হয়েছে, সেই মুহূর্তেই ঈমানদার মুসলমানগণ তা কণ্ঠস্থ করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মোহাম্মদের (দঃ) জীবদ্দশাতেই কোরআনের অবতীর্ণ বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরইভিত্তিতে কোরআনের সর্বশেষ সংকলনের কাজ শুরু হয়— মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পরেপরেই এবং খলিফা উসমানের (রাঃ)-এর আমলে দীর্ঘ বারো বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর চব্বিশ বছরের মধ্যে কোরআনের চূড়ান্ত সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয়। মোহাম্মদের (দঃ)-এর আমলের লিপিবদ্ধ কোরআন তো ছিলই; তাছাড়াও ঈমানদার মুসলমান হাফেজগণের সহায়তায় সংকলিত কোরআনের প্রতিটি আয়াত ও পাঠ যাচাই-বাছাই করে নেয়া হয়। এইসব হাফেজ কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ই তা মুখস্থ করে নেন। উল্লেখ্য, এভাবে সেই গোড়া থেকেই কোরআন হেফ্‌জ করার এবং তা অব্যাহতভাবে তেলাওয়াত করার ধারা জারি হয়ে গেছে। সেই থেকে কোরআনের প্রতিটি আয়াত সর্বাধিক যত্ন ও সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করে আসা হচ্ছে। এ কারণে কোরআনের অকৃত্রিমত্ব এবং সঠিকত্ব নিয়ে কখনোই কোনো সমস্যা হয়নি।

কোরআন গোটা বাইবেলের অর্থাৎ তাওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলের পর আসমানী কিতাব হিসেবে অবতীর্ণ হয়। কোরআনের বাণীসমূহ স্ববিরোধিতা ও বৈপরিত্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। শুধু তাই নয়, বাইবেলের বাণীগুলোতে যেখানে মানুষের হস্তক্ষেপের অনেক অনেক নজির বিদ্যমান; সেখানে কোরআনের কোনো বাণীতে মানুষের হস্তক্ষেপের কোনো প্রমাণ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও আধুনিক জ্ঞানের আলোকে কেউ যদি কোরআনের বাণীসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেন, দেখতে পাবেন, বিভিন্ন বিষয়ে বর্ণনার সঠিকত্বের দিকথেকে কোরআন অনন্য। তদুপরি, কোরআনে এমনসব বাণী ও বক্তব্য রয়েছে যেসব বাণী ও বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট। এখানেই যে কথাটা সবচেয়ে বড় হয়ে ধরা পড়ে, তাহলো, আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের আবিষ্কার, বিশ্লেষণ ও গবেষণার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত এতসব বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট এই যে কোরআন, তা মোহাম্মদের (দঃ) দ্বারা কিংবা তাঁর সময়ের কোনো মানুষের দ্বারা রচিত হয়েছিল— সেকথা কিভাবেই বা চিন্তা করা যায়? বস্তুত, কোরআনে এমনসব আয়াত রয়েছে,— এতকাল যাবত সেসব আয়াতের অর্থ কিংবা ব্যাখ্যা আদৌ সম্ভব ছিল না। একান্ত আধুনিক যুগে এসে, শুধু অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক

গবেষণা, আবিষ্কার ও তথ্যজ্ঞানের আলোকেই ওইসব আয়াতের অর্থ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে।

তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণে আরো দেখা যায়, কোনো কোনো বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনার সাথে কোরআনের বর্ণনার পার্থক্য একান্ত মৌলিক। বাইবেলের বর্ণনা যেখানে বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে, সেখানে একইধারার বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, কোরআনের বর্ণনা আধুনিক তথ্যজ্ঞানের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ : সৃষ্টিতত্ত্ব ও মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত এই গবেষণা-পর্যালোচনায় এই সত্যই ধরা পড়েছে যে, ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনাবলীর পর্যালোচনায় দেখা গেছে, কোরআনের বর্ণনা সেখানে উল্লেখযোগ্যভাবে বাইবেলের বর্ণনার সম্পূরক। শুধু তাই নয়, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় হযরত মুসার আমলের যেসব নির্দশন আবিষ্কৃত হয়েছে, সেসবের ব্যাপারে উভয় ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায় মিল রয়েছে প্রচুর। এছাড়া, অন্যসব বিষয়ে বাইবেল ও কোরআনের বর্ণনায় পার্থক্য বিরাট। মূলতঃ উভয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বর্ণনার এই যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য, তা শুধু একটি সত্যকেই প্রমাণ করে। আর তা হলো :

> "বিনাপ্রমাণে যাঁরা অভিযোগ আনেন এবং বিশ্বাসও করেন যে, 'মোহাম্মদ (দঃ) বাইবেল থেকে নকল করে কোরআনের বাণী রচনা করেছিলেন'— তাঁদের সেই অভিযোগ ও বিশ্বাস পুরোপুরিভাবে অসার, অসত্য ও ভিত্তিহীন।"

অন্যদিকে, কোরআন ও হাদীসের বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বাণীর মধ্যে যখন তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তখন দেখা যায়, কোরআনের বর্ণনার সাথে হাদীসের বর্ণনার পার্থক্য দুস্তর। অথচ, হাদীস হচ্ছে মোহাম্মদেরই (দঃ) বাণী। কোনো কোনো হাদীসের বাণীতে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের যথার্থতা ও প্রামাণিকতা খুবই অস্পষ্ট যদিও সেসব বাণীতে সে আমলের ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, কোরআনের বিজ্ঞান-বিষয়ক বর্ণনা সুস্পষ্ট এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচারেও সেসব বর্ণনা সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং, কোরআন ও হাদীসের বাণীর মধ্যে বিরাজমান স্বাভাবিক এই পার্থক্যের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হাদীস মোহাম্মদের (দঃ) ব্যক্তিগত বাণী ও বক্তব্য হলেও— কোরআন আদৌ মোহাম্মদের (দঃ) নিজস্ব ও ব্যক্তিগত বাণী নয় : এ বাণী নিঃসন্দেহে ঐশীবাণী। অন্যকথায় : কোরআন ও হাদীস

মোহাম্মদের (দঃ) নিজস্ব রচনা অর্থাৎ উভয়ের উৎস এক ও অভিন্ন, এই ধারণা ও প্রচারণা আদৌ ধোপে টেকে না।

মোহাম্মদের (দঃ) আমলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতটা উৎকর্ষ সাধিত হয় তার নিরিখে বিচার করলেও দেখা যায়, কোরআনের বাণীতে বিজ্ঞান-বিষয়ক যেসব বক্তব্য ও বর্ণনা বিদ্যমান— সেসব বৈজ্ঞানিক বিষয় আদৌ সে সময়কার কোনো মানুষের রচনা হতে পারে না। সুতরাং, তথ্যগত যুক্তির বিচারে এই সত্য স্বীকার করে নিতে আপত্তির কোনো কারণ থাকে না যে, কোরআন অবতীর্ণ এক আসমানী কিতাব ছাড়া আর কিছুই নয়।

একদিকে, কোরআন তার সঠিকত্বের প্রামাণিকতায় অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে যেমন একক, তেমনি অন্যদিকে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত ও প্রামাণিক বিষয়ের বর্ণনায়ও কোরআনের বৈশিষ্ট্য অনন্য। এখন যখন আমরা কোরআনের এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা হচ্ছে এবং সেই সাথে তার বৈজ্ঞানিক বাণী ও বক্তব্যের উপরে চলছে গবেষণা ও বিশ্লেষণ, তখন একটা সত্য-চ্যালেঞ্জ হিসেবে ফুটে না ওঠে পারে না। আর সেই সত্যটা হল : "কোরআনের কোনো মানবিক ব্যাখ্যা অসম্ভব"। অর্থাৎ কোরআন কোনো মানুষের রচনা নয়; বরং এই কোরআন সত্যসত্যই অবতীর্ণ এক আসমানী কিতাব।

তুলনামূলক আলোচনা
কোরআন ও বাইবেল

এমন অনেক বিষয়ের বর্ণনা বাইবেলে রয়েছে যেসবের বিবরণ কোরআনেও দেখা যায়। উভয় ধর্মগ্রন্থে যেসব নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাঁদেরমধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় হযরত নূহ্, ইবরাহীম, ইউসূফ, ইলিয়াস, ইউনুস, আইয়ুব ও হযরত মুসার (আঃ) কথা।

যেসব রাজা-বাদশাহ্র কাহিনী উভয় ধর্মগ্রন্থে রয়েছে তন্মধ্যে সৌল, দাউদ ও সোলায়মানের নাম উল্লেখযোগ্য। উভয় ধর্মগ্রন্থের নানাবর্ণনায় এঁদের নাম ঘুরেফিরে এসেছে। এছাড়াও বিশেষ এমন কতকগুলো ঘটনার বর্ণনা উভয় ধর্মগ্রন্থে বিদ্যমান— যেসব ঘটনা অলৌকিক প্রভাবের ফল। যেমন : পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টি, মহাপ্লাবন এবং একসোডাস বা ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনা প্রভৃতি। পরিশেষে, বাইবেলের নতুন নিয়মে (ইঞ্জিল) হযরত ঈসা ও তাঁর মা মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এঁদের সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে কোরআনেও।

এই দুই ধর্মগ্রন্থে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো যখন আধুনিক জ্ঞানের আলোকে, বিশেষত সেকুলার তথ্যজ্ঞানের নিরিখে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তখন কোন্ চিত্র পাওয়া যায়?

কোরআন, ইঞ্জিল ও আধুনিক বিজ্ঞান

কোরআনের সাথে বাইবেলের নতুন নিয়মের সুসমাচারসমূহের (ইঞ্জিলের প্রথম থেকে চতুর্থ খণ্ড) তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। সেই কথাটি হল : সুসমাচারসমূহের যেসব অসঙ্গতিপূর্ণ বিষয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যজ্ঞানের বিচারে সমালোচনাযোগ্য।

কোরআনে বহুবারই হযরত ঈসার কথা (যীশুখ্রিস্ট) উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— পিতৃগৃহে হযরত মরিয়মের জন্ম, হযরত মরিয়মের মধ্যে অলৌকিকত্বের আভাস, উচ্চ পর্যায়ের নবী হিসেবে হযরত ইসার মর্যাদা, মসীহ্ বা ত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকা, তাঁর উপরে অবতীর্ণ ওহীর মাধ্যমে

মানবসমাজে তাওরাতের সত্যতার ঘোষণা ও তার সংস্কার সাধন, তাঁর ধর্মপ্রচার, তাঁর প্রেরিত ও শিষ্যবৃন্দ, তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপ, আল্লাহ্‌র নিকট তাঁর উঠে যাওয়া, শেষ বিচারদিনে তাঁর ভূমিকা প্রভৃতি নানাবিষয়ের বর্ণনা কোরআনে বিদ্যমান।

কোরআনের ৩ নং সূরা ও ১৯ নং সূরার (এই ১৯ নং সূরাটি সূরা মরিয়ম নামে পরিচিত) বেশকিছু দীর্ঘ আয়াত হযরত ঈসার পরিবার স্বজন তথা মাতৃকুল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এসব আয়াতে হযরত মরিয়মের জন্ম, তাঁর যৌবনকাল এবং অলৌকিক উপায়ে তাঁর মাতৃত্বলাভের বর্ণনাও স্থান পেয়েছে। কোরআনে হযরত ঈসাকে সবসময়ই "মরিয়ম-পুত্র" বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং হযরত ইসার পূর্বপুরুষদের তালিকার বর্ণনায় স্থান পেয়েছে তাঁর মাতৃকূল। যেহেতু যীশুখ্রিস্ট অর্থাৎ হযরত ঈসার দৈহিক দিক থেকে কোনো পিতা ছিলেন না,— সেহেতু তাঁর বংশাবলীর ক্ষেত্রে তাঁর মাতৃকূলের বংশপরিচয়-সংক্রান্ত কোরআনের এই বক্তব্য ও বর্ণনা একান্ত যুক্তিসঙ্গত। এখানে মথি ও লুক-লিখিত সুসমাচারের (বাইবেল/ইঞ্জিল) সাথে কোরআনের বর্ণনার পার্থক্য সুস্পষ্ট। মথি ও লুক— একান্ত অযৌক্তিক হওয়া সত্ত্বেও হযরত ঈসার তথাকথিত পিতৃকুলের বংশলতিকা তুলে ধরেছেন; এবং সেখানেও এই দুই লেখকের মধ্যে বর্ণনার গরমিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

কোরআনে হযরত ইসার মাতৃকুলের বংশলতিকা টানা হয়েছে— হযরত নূহ্ ও হযরত ইবরাহীম হয়ে হযরত মরিয়মের পিতা (কোরআনে তাঁকে বলা হয়েছে ইমরান) পর্যন্ত।

> "আল্লাহ্ বাছিয়া নিয়াছেন আদম, নূহ্ ও ইবরাহীমের পরিবার এবং ইমরানের পরিবারকে তাঁহার সমস্ত সৃষ্টির উপরে— তাহারা একজন হইতে আরেকজন।"– সূরা ৩ ঃ আয়াত ৩৩ ও ৩৪।

অর্থাৎ, হযরত ঈসা তাঁর মা হযরত মরিয়ম এবং মরিয়মের পিতা ইমরানের মাধ্যমে হযরত নূহ্ এবং হযরত ইবরাহীমের বংশধর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাইবেলের নতুন নিয়মের সুসমাচারসমূহে অর্থাৎ ইঞ্জিল 'যীশুর পূর্বপুরুষবর্গের' নাম-তালিকা প্রণয়নে যে ভুল করা হয়েছে, কোরআনে সেরকম কোনো ভুল নেই। শুধু তাই নয়, বাইবেলে পুরাতন নিয়মে অর্থাৎ তওরাতে হযরত ইবরাহীমের বংশ-তালিকায় তাঁর পূর্বপুরুষগণের যে অবাস্তব তালিকা তুলে ধরা হয়েছে,— কোরআন সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত।

সকলকে এই সত্য স্বীকার করে নিতেই হবে, 'মোহাম্মদ (দঃ) নিজে কোরআন রচনা করেছিলেন' বলে যে ধারণা করা হয়, তা আগাগোড়াই ভুল।

শুধু তাই নয়, পূর্বোক্ত বিচার-বিশ্লেষণ থেকে 'মোহাম্মদ (দঃ) কোরআন রচনা করেছিলেন বাইবেল নকল করে' সেই ধারণাও সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। বিচার-বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে-আসা এই যে সত্য, তার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা, ওইসব ধারণা সত্য হলে, প্রশ্ন জাগে যে, মোহাম্মদ (দঃ) যদি বাইবেল থেকে কোরআন নকল করে থাকেন তাহলে বাইবেলে বর্ণিত যীশুর পূর্বপুরুষগণের নাম-তালিকা কেন, কি কারণে তিনি হুবহু নকল করলেন না? কে তাঁকে তা নকল করতে বাধা দিয়েছিল?

যদিও এখানেই প্রশ্নের শেষ নয়, বরং সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, এই পর্যায়ে মোহাম্মদকে (দঃ) বাইবেলের অশুদ্ধ ও অবাস্তব তালিকা শুধু করতে এবং সেই শুদ্ধ তালিকা কোরআনে বর্ণনায় স্থান দিতে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল কে এবং কোরআনে বর্ণিত যীশুর (হযরত ইসার) পূর্বপুরুষগণের পরিচয় সর্বাধুনিক তথ্যজ্ঞানের নিরিখে এখন সকলরকম সমালোচনার ঊর্ধ্বে বিরাজ করছে। পক্ষান্তরে, বাইবেলে বর্ণিত যীশুর বংশাবলীপত্র কোরআনের বর্ণনার বিপরীত, এবং আধুনিক তথ্যজ্ঞানের নিরিখেও অগ্রহণযোগ্য।

মোদ্দাকথা, 'কোরআন মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক রচিত হওয়ার' অবাস্তব বক্তব্য এবং 'বাইবেল থেকে তাঁর কোরআন নকল করার' অবান্তর দাবি এই একটিমাত্র পর্যালোচনায় সম্পূর্ণভাবেই নাকচ হয়।

ইতিমধ্যে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের এবং নতুন নিয়মের সাথে বেশকিছু বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এই পুস্তকে বাইবেল পুরাতন নিয়মের বিশ্বসৃষ্টির বর্ণনার উপর যে গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে, তা উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, একইবিষয়ে কোরআনে যে বর্ণনা রয়েছে, তাও যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লিখিত দুই বিচার-বিশ্লেষণের ফলাফল সম্পর্কে এই পর্যায়ে নতুন করে আলোচ্য আর কিছু নেই।

বাইবেলে বর্ণিত রাজা-বাদশাদের কাহিনীর পর্যালোচনায় এবারে আসা যাক। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এক্ষেত্রে আধুনিক ঐতিহাসিক জ্ঞান যেমন অস্পষ্ট, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য-উপাত্তও তেমনি অপ্রতুল। এই অবস্থায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে কোরআন ও বাইবেলে বর্ণিত রাজা-বাদশাহদের কাহিনীর উপরে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ সত্যি দুরূহ।

নবীগণের কাহিনী সম্পর্কেও একই কথা বলা চলে ওই দুই ধর্মগ্রন্থে পাশাপাশিভাবে যেসব নবীর কাহিনী ও ঘটনা বর্ণিত রয়েছে, সে-সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞান-গবেষণা এখনো তেমন বেশিকিছু জানাতে পারছে না। সুতরাং, এক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচার-পর্যালোচনা যথার্থ হওয়া অসম্ভব।

যাহোক, পূর্বোক্ত দুটি বিষয় ছাড়াও আরো কয়েকটি বিষয় কোরআন ও বাইবেলে বর্ণিত রয়েছে, যা মনোযোগ আকর্ষণ করে। এখন যে তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, তার আলোকে উক্ত দুটি বিষয়ের উপর অনায়াসেই বিচার-বিশ্লেষণ চালানো যায়। বিষয় দুটি :

মহাপ্লাবন; এবং

ইহুদীদের মিসরত্যাগ।

প্রথম, মহাপ্লাবনের ব্যাপারটি সার্বিকভাবে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তেমন কোনো স্বাক্ষর রেখে যায়নি। যেমনটি বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে। ফলে, বাইবেলের বর্ণনায় বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবনের যে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে আধুনিক তথ্যজ্ঞানের আলোকে তা অসমর্থনযোগ্য। পক্ষান্তরে, একই মহাপ্লাবনের কাহিনী কোরআনেও বর্ণিত রয়েছে। যা আধুনিক প্রতিষ্ঠিত তথ্যজ্ঞানের আলোকে মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত কোরআনের সেই বর্ণনার কোনো বিরূপ সমালোচনা করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, ইহুদীদের মিসরত্যাগের ব্যাপারে বাইবেল ও কোরআনের বর্ণনা প্রমাণভিত্তিক এবং বৃহত্তর পরিধিতে তা একে অপরের পরিপূরক। তাছাড়া, আধুনিক গবেষণা ও তথ্যজ্ঞানও উভয় ধর্মগ্রন্থের এতদসংক্রান্ত বর্ণনার প্রতি উল্লেখযোগ্যভাবেই ঐতিহাসিক সমর্থন দিচ্ছে।

বাইবেলের (পুরাতন নিয়ম) মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত বর্ণনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায় :

বাইবেলে মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত বর্ণনা দু'টি এবং দু'টি বর্ণনা রচিত হয় দু'টি ভিন্ন সময়ে;

খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত বাইবেলের জেহোভিস্ট পাঠের বর্ণনার রচনাকাল; এবং

সেকেরডোটাল পাঠে বর্ণিত মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত বিবরণ রচিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সেকেরডোটাল পুরোহিতদের রচিত বলেই বাইবেলের এই পাঠের এই নামকরণ।

এ দুটো পাঠের বর্ণনা আলাদা নয়; বরং একটার সাথে আরেকটা এমনভাবে গেঁথে রয়েছে যে, দুটো পাঠ-ই ওতপ্রোতভাবে জুড়ে রয়েছে। অন্যকথায়, একটা অনুচ্ছেদ থেকে একটা পাঠের কিছু অংশ মুছে দিয়ে আরেকটা পাঠের কিছু অংশ এনে সে জায়গটা পূরণ করা হয়েছে। জেরুজালেমের বাইবেল শিক্ষায়তনের অধ্যাপক ফাদার ডি. ভক্স তাঁর বাইবেলের আদিপুস্তকের অনুবাদের ভাষ্যে স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন, বাইবেলের বর্ণনায় কিভাবে উল্লিখিত দু'টি পাঠ ব্যবহার করা হয়েছে ঃ যেমন, কোনো বর্ণনা সম্ভবত জেহোভিস্ট পাঠ দিয়ে শুরু ও শেষ

হয়েছে। কিন্তু এর মাঝখানেই ভরে দেয়া হয়েছে সেকেরডোটাল পাঠ। এ ধরনের জেহোভিষ্ট পাঠ দিয়ে শুরু ও শেষ এমন অনুচ্ছেদ শুধু আদিপুস্তকেই (বাইবেল) পাওয়া গেছে দশটি (অনুরূপ সেকেরডোটাল অনুচ্ছেদের সংখ্যা হচ্ছে নয়টি)। কোনো একটা ঘটনা জানার জন্য এ ধরনের জোড়াতালি দেয়া বর্ণনায় অবশ্য তেমন কোনো অসংলগ্নতা নেই মনে হয়। কিন্তু একটু গভীর বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায়,— এই দুই পাঠের মধ্যে স্ববিরোধিতা বিদ্যমান মারাত্মক ধরনের।

উদাহরণস্বরূপ মহাপ্লাবনের কথা উল্লেখ করা যায় সেই ভিন্নদৃষ্টির গভীরতর বিচার-বিশ্লেষণে ফাদার ডি. ভক্স বাইবেলের মহাপ্লাবনের বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন, "বাইবেরে মহাপ্লাবনের দু'টি বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। এই মহাপ্লাবনের যে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে— এই বর্ণনামতে তার কারণ ছিল ভিন্ন। দুই বর্ণনায় মহাপ্লাবন কতকাল স্থায়ী হয়েছিল, সেই সময়কালও ভিন্ন। তাছাড়া, হযরত নূহ্ (আঃ) তাঁর নৌকায় কতটি জন্তু-জানোয়ার তুলে নিয়েছিলেন সে বিষয়ে ওই দুই বর্ণনার মধ্যে রয়েছে পার্থক্য।"

আধুনিক তথ্যজ্ঞানের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণে বাইবেলের মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত এই বর্ণনা সম্পূর্ণভাবেই অগ্রহণযোগ্য। যথা :

(ক) বাইবেলের পুরাতন নিয়মে, এই মহাপ্লাবন সংঘটিত হয় গোটা বিশ্বব্যাপী এবং এরফলে গোটা বিশ্বে মারাত্মক ধ্বংসলীলা সাধিত হয়।

(খ) বাইবেলের জেহোভিস্ট পাঠের বর্ণনায়, মহাপ্লাবন সংঘটিত হওয়ার কোনো সময়কাল উল্লেখ নেই। কিন্তু সেকেরডোটাল পাঠে এই মহাপ্লাবন তথা বিশ্বব্যাপী এই ধ্বংসলীলা বিশেষ একটা সময়কালে সংঘটিত হয়েছিল বলা হয়েছে। অথচ, উক্ত সময়কালে বিশ্বব্যাপী ওই ধরনের কোনো ধ্বংসলীলা সংঘটিত হওয়ার কোনো প্রমাণ নেই।

এই অভিমতের সমর্থনে ও সপক্ষে যুক্তি হচ্ছে সেকেরডোটাল পাঠে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে, এই মহাপ্লাবন যখন সংঘটিত হয় তখন হযরত নূহের বয়স ছিল ৬০০ বছর। এদিকে বাইবেলের আদিপুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ের বংশাবলীপত্রে (এটি সেকেরডোটাল পাঠ থেকে গৃহীত এবং এই পুস্তকে বলে দেয়া হয়েছে যে, হযরত আদমের ১৬৫৬ বছর পরে এই মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়। অন্যদিকে, বাইবেলের আদিপুস্তকের সেকেরডোটাল পাঠেরই বর্ণনায় (১১, ১০-৩২) রয়েছে হযরত ইবরাহীমের বংশাবলীপত্র। আর সেই বংশাবলীপত্রের হিসেব থেকে দেখা যায়, হযরত ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেছেন মহাপ্লাবনের ২৯২ বছর পর। বাইবেলের বর্ণনা থেকে জানা গেছে যে, হযরত ইবরাহীম মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ১৮৫০ সালের দিকে জীবিত ছিলেন। তাহলে মহাপ্লাবন

সংঘটনের সময়কাল দাঁড়ায় খ্রিস্টপূর্ব একুশ বা বাইশ শতাব্দীর দিকে। বাইবেলের বংশাবলীপত্রে বর্ণিত সময়ের গণনা যে আদৌ সঠিক নয়, সে সম্বন্ধে আধুনিক মানুষের হাতে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠিত তথ্য, প্রমাণ ও হিসেব এসে গেছে। সুতরাং, বাইবেলের সেকেরডোটাল পাঠের লেখকদের ওইসব মনগড়া হিসেব এখন আর কারো নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা নয়। মজার ব্যাপার, আধুনিক যুগে প্রকাশিত বাইবেলের কোনো সংস্করণেই এখন আর ওইসব হিসেব আগের মত কাহিনীর শুরুতে দেখা যায় না; ওইসব হিসেব একেবারেই বাতিল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাইবেলের মূল বর্ণনায় বংশাবলীপত্রের নামে এখনো ওইসব হিসেব চালু রয়েছে এবং বাইবেলের আধুনিক কোনো ভাষ্যকার ভুলেও সে ভুলের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না। অথচ, তাঁদের সেই ভাষ্যগুলো নাকি রচিত হয়েছে সাধারণ পাঠকদের জন্যই! অতীতের পুরাতন সংস্করণের বাইবেলগুলোতে কাহিনী শুরুর প্রথমেই বেশ গুরুত্ব দিয়ে সময়কালের এইসব হিসেব প্রকাশ করা হত। সেই হিসেব অনুসারেই এই সময়কালের হিসেব গণনা করা হয়েছে। তবে, যেকালে ওই ধরনের হিসেব-সম্বলিত বাইবেল প্রকাশিত হত, সেকালে মানুষদের নাগালের মধ্যে আজকের যুগের মত এতসব তথ্য-পরিসংখ্যান ছিল না। সুতরাং, বাইবেলে বর্ণিত ওইসব বংশাবলীপত্র তথা হিসেব কতটা সঠিক, তা নির্ণয় করা তখনকার কোনো মানুষের পক্ষে কঠিন ছিল বৈকি। ফলে, ওই ধরনের ভিত্তিহীন হিসেব-সম্বলিত বাইবেলের যাবতীয় বক্তব্য বিনাদ্বিধায় গ্রহণ করতে সেকালের মানুষদের কোনো অসুবিধা হতো না।

মহাপ্লাবনের যেকথা বাইবেলে বর্ণিত তা আধুনিক তথ্যজ্ঞানের তুলনামূলক বিচারে এখন একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, এইমাত্র খ্রিস্টপূর্ব একুশ বা বাইশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী ওইরকম এক মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল; এবং সেই মহাপ্লাবনে সারা দুনিয়ার সবকিছু অর্থাৎ, জমিনের উপরের সমস্তকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল শুধু রক্ষা পেয়েছিল নূহের নৌকার লোকজন ও জন্তু-জানোয়ার। ইতিহাস জানিয়ে দিচ্ছে, খ্রিস্টপূর্ব ওই একুশ ও বাইশ শতাব্দীর দিকে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় নানা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এবং সেসব সভ্যতার নানা নির্দশন এখন পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, এখনো সেসব নিদর্শন বিরাজ করছে একটি উদাহরণে বিষয়টি আরো পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। আধুনিক ইতিহাসের গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি, ওই সময়টাতে মিসরে পুরাতন রাজত্বের অবসান ও মধ্যবর্তী রাজত্বের সূচনা ঘটে। এদিকে, ওই সময়কার মিসরীয় সভ্যতার বহুকিছু ইতিহাস ও নিদর্শনাবলী এখনো বিরাজমান। সুতরাং, ওই এলাকার ওই সময়ের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্পর্কে এতকিছু জানার

ও প্রত্যক্ষ করার পর— একথা এখন আর কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না যে, তখন সংঘটিত ওই মহাপ্লাবনে বিশ্বব্যাপী মানুষের সব সভ্যতাই সমূলে ধ্বংস হয়েছিল।

অতএব, ঐতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণে এটা স্বীকার না করে উপায় থাকে না যে, বাইবেলে মহাপ্লাবন সংক্রান্ত যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ রয়েছে, তা আধুনিক তথ্যজ্ঞানের নিরিখে বাস্তব প্রমাণের বিপরীত। মূলত, বাইবেলের বিভিন্ন রচনায় মানুষের হস্তক্ষেপের যে প্রমাণ ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে, মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত এই দুটি পাঠের বর্ণনার মধ্যেও তার পরিচয় সুস্পষ্ট।

মহাপ্লাবন সম্পর্কে কোরআনে যে বর্ণনা রয়েছে, তা বাইবেলের বিবরণ থেকে শুধু পৃথকই নয়, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের বিচারেও মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত কোরআনের এই বর্ণনার বিরোধিতা ও সমালোচনা করার ক্ষেত্র এবং অবকাশ নেই।

কোরআনে মহাপ্লাবনের ধারাবাহিক কোনো বিবরণ নেই। বিভিন্ন সূরায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এই মহাপ্লাবনের মাধ্যমে নূহের জাতির উপর গজব নেমে এসেছিল। এ বিষয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা পাওয়া যায় কোরআনের ১১ নং সূরার ২৫ থেকে ৪৯ নং আয়াতে। কোরআনের ৭১ নং যে সূরাটি 'সূরা নূহ্' নামে পরিচিত, তাতে হযরত নূহের ধর্মপ্রচারের কথাই বেশি করে বয়ান করা হয়েছে। ২৬ নং সূরার ১০৫ থেকে ১১৫ নং আয়াতের বর্ণনাও একইধরনের। যাহোক, কোরআনের বর্ণনানুসারে সেই মহাপ্লাবনে কি ঘটেছিল, সে আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রথমেই বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন, কি কারণে এই মহাপ্লাবন হয়েছিল। কোরআনের মতে, যখন কোনো জাতি বা সম্প্রদায় আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করে নিদারুণভাবে পাপাচারে লিপ্ত হয় তখন সে জাতির উপর আল্লাহ্র গজব নেমে আসে।

বাইবেলে বলা হচ্ছে, ধর্মীয় দিক থেকে অধঃপতিত 'গোটা মানবজাতিকে' শাস্তিপ্রদানের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী এক মহাপ্লাবন হয়েছিল। কোরআনে সে বক্তব্যের বরং বিরোধিতাই করা হচ্ছে। কোরআনের মতে, বিশেষ বিশেষ সময় নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক জাতির উপরই নেমে এসেছিল বিভিন্ন ধরনের গজবঃ এমনি ধরনের এক গজব ছিল এই মহপ্লাবন। কোরআনের ২৫ নং সূরার ৩৫ থেকে ৩৯ নং আয়াতে সে কথাটিই বলা হয়েছে এভাবে ঃ

> "আমরা দিয়েছিলাম মুসাকে কিতাব এবং নিয়োগ করেছিলাম তার ভাই হারুনকে তাহার উজির বা সাহায্যকারী। আমরা বলেছিলাম ঃ যাও সেইসব লোকদের নিকট—যাহারা অস্বীকার করেছে আমাদের নিদর্শনাবলী। আমরা ধ্বংস করেছিলাম তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে। যখন নূহের জাতি নবীদের অস্বীকার করিল, আমরা তাদের ডুবাইয়া

দিয়েছিলাম, তাদের বানিয়ে দিয়েছিলাম নিদর্শন মানবজাতির জন্য। আদ, সামুদ ও রাস-এর সঙ্গীদের এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেকের (সম্প্রদায়গুলোকে আমরা ধ্বংস করেছিলাম)। আমরা সতর্ক করেছিলাম তাদেরকে নিদর্শনাবলীর দ্বারা এবং আমরা নির্মূল করেছি তাদের সম্পূর্ণরূপে।"

এমনিইভাবে ৭ নং সূরার ৫৯ থেকে ৯৩ নং আয়াতেও কিভাবে নূহের জাতি, এবং আদ্, সামুদ, লুত (সডোম) ও মাদিয়ান সম্প্রদায়ের উপর গজব নেমে এসেছিল তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।

এভাবেই কোরআন জানিয়ে দেয় যে, মহাপ্লাবনের যে ধ্বংসলীলা গজবের আকারে নেমে এসেছিল, তা বিশেষভাবে নির্ধারিত ছিল নূহের জাতির জন্য ঃ বাইবেলের বিবরণের সাথে কোরআনের বর্ণনার মৌল পার্থক্য এখানেই।

দ্বিতীয় বুনিয়াদী তফাতটা হল, বাইবেলে যেখানে মহাপ্লাবনের সময়, তারিখ ও মেয়াদকাল উল্লেখ রয়েছে, সেখানে কোরআন এ সম্পর্কে কিছুই বলছে না, না মহাপ্লাবনের কোনো দিন-তারিখ, না তার স্থায়িত্বকাল।

মহাপ্লাবনের কার্যকারণ সম্পর্কে উভয় ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা মোটামুটিভাবে একইরকম। বাইবেলের সেকেরডোটাল বর্ণনায় (আদিপুস্তক ৭, ১১) মহাপ্লাবনের দুটি কারণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এই কার্যকারণ দুটি একইসঙ্গে ঘটেছিল ঃ "ওইদিন মহাজলধির সমস্ত উনুই ভাঙিয়া গেল এবং আকাশের বাতায়ন সকল মুক্ত হইল।" কোরআনে এ সম্পর্কে ৫৪ নং সূরার ১১ ও ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"আমরা খুলিয়া দিলাম আসমানের দরওয়াজাসমূহ অতিবর্ষণের সহিত এবং মাটিতে তীব্র প্রস্রবণ সৃষ্টি করিলাম— যেন পানি একত্রিত হইয়া হুকুম অনুযায়ী তাহা সমাধা করে —যা নির্ধারিত।"

নূহের নৌকায় যা-কিছু ছিল, সে সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। আল্লাহ্ হযরত নূহকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করেছিলেন। যেমন :

"(নৌকায়) প্রত্যেক জিনিসের এক জোড়া তুলিয়া নাও; তোমার পরিবারবর্গকে এই একজন বাদে—যাহার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র নির্দেশ জারি হইয়া গিয়াছে,—এবং যাহারা বিশ্বাসী। তবে, অল্পসংখ্যক লোকজনই তাহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল।"

যে ব্যক্তিটি হযরত নূহের পরিবার থেকে বাদ গিয়েছিল সে ছিল হযরত নূহেরই পথভ্রষ্ট সন্তান। আমরা জানি (সূরা ১১, আয়াত ৪৫ ও ৪৬), কিভাবে তার সম্পর্কে হযরত নূহের আরজি ব্যর্থ হয়েছিল ঃ আল্লাহ্ নিজের হুকুম রদ

করেননি। নূহের পরিবারবর্গ ছাড়া (অবশ্য ওই গোমরাহ্ ছেলেটি বাদ দিয়ে) আর মাত্র সামান্য কয়েকজনই ওই নৌকায় আরোহী ছিলেন, এঁরা ছিলেন আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী।

পক্ষান্তরে, বাইবেলের বর্ণনায়, ওই নৌকার মধ্যে বিশ্বাসীগণ ছিলেন কি না সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। আসলে, নৌকার আরোহীদের ব্যাপারে বাইবেলে মোট তিন ধরনের আলাদা আলাদা বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা ঃ

বাইবেলের জেহোভিস্ট বর্ণনায় 'পবিত্র' পশু ও পাখি এবং 'অপবিত্র' পশু পাখির মধ্যে একটি পার্থক্য টানা হয়েছে (সাত জোড়া করে অর্থাৎ প্রতিটি 'পবিত্র প্রজাতির মধ্য থেকে সাতটি পুরুষ ও সাতটি নারী প্রজাতি নৌকায় গ্রহণ করা হয়েছিল পবিত্র-অপবিত্র নির্বিশেষে প্রতিটি প্রজাতির মাত্র এক জোড়া করে। এখানে 'সাত' শব্দের দ্বারা নিশ্চিতভাবেই 'বহু' বোঝানো হয়েছে, কেননা সেকালে সেমিটিক ভাষায় অনেক সময় 'বহু' বোঝাতে 'সাত' উল্লেখ করা হত)।

সংশোধিত জেহোভিস্ট বর্ণনানুসারে (আদিপুস্তক ৭,৮) নৌকায় গ্রহণ করা হয়েছিল পবিত্র-অপবিত্র নির্বিশেষে প্রতিটি প্রজাতির মাত্র এক জোড়া করে।

পক্ষান্তরে, বাইবেলেরই সেকেরডোটাল বর্ণনায় রয়েছে, নৌকায় ছিলেন হযরত নূহ্ ও তাঁর পরিবারবর্গ (কেউ বাদ যায়নি)। আর সেই নৌকায় গ্রহণ করা হয়েছিল প্রত্যেক প্রজাতি থেকে এক জোড়া করে।

মহাপ্লাবনের ধারণা কি ছিল— সে সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে কোরআনের ১১ নং সূরার ২৫ থেকে ৪৯ নং এবং ২৩ থেকে ৩০ নং আয়াতে। কোরআনের এই বর্ণনার সাথে বাইবেলের মহাপ্লাবনের ধরন-সংক্রান্ত বর্ণনার তেমন কোনো পার্থক্য নেই —যা উল্লেখ করার মত।

বাইবেলের বর্ণনামতে, হযরত নূহের নৌকা আরারাত পর্বতমালায় গিয়ে ঠেকেছিল (আদিপুস্তক ৮, ৪) আর কোরআনে বলা হয়েছে, পর্বতটি হচ্ছে 'জুদি' (সূরা ১১, আয়াত ৪৪)। উল্লেখ্য যে, এই জুদি পর্বত হচ্ছে আরমেনিয়াস্থ আরারাত পর্বতমালার মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে, দুই ধর্মগ্রন্থের বর্ণনার সাথে সঙ্গতি রাখার বাসনায়-পরবর্তীকালের লোকেরা যে ওই পর্বতমালা ও পর্বতটির নাম বদলে দেয়নি, সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। আর ব্লাশার রচনাতেও একথার প্রমাণ মেলে। তাঁর মতে, আরব দেশেও 'জুদি' নামে একটি পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে। নামের এই মিল দেখে ধারণা করা হয়, আরবের পর্বতশৃঙ্গের ওই নামটি পরে প্রদত্ত।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, এই মহাপ্লাবনের ব্যাপারে বাইবেল ও কোরআনের বর্ণনায় কি ধরনের প্রধান প্রধান পার্থক্য বিদ্যমান, তা স্পষ্ট করে বলে দেয়া সম্ভব। যদিও এখনপর্যন্ত কোনো কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য-প্রমাণ না পাওয়ার

কারণে এই পার্থক্যের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ সম্ভবত অসম্ভব। তবে, ইতিমধ্যে যেসব প্রতিষ্ঠিত তথ্য ও প্রমাণ আমাদের নাগালের মধ্যে রয়েছে এবং বিভিন্ন আবিষ্কার আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছে, তার আলোকে বলা যায় যে, বাইবেলের বর্ণনা বিশেষত মহাপ্লাবনের সময়কাল ও তার ভৌগোলিক ব্যাপ্তি-সম্পর্কিত বক্তব্য আদৌ সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পক্ষান্তরে, মহাপ্লাবন সম্পর্কিত কোরআনের বর্ণনায় এমনকিছু নেই যা নিরপেক্ষ বিচারে বিরোধিতা বা সমালোচনার যোগ্য।

যদিও, এখানে একটি প্রশ্ন ওঠতে পারে, মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত বাইবেলের বিবরণের প্রচারকাল ও কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালের মধ্যে ব্যবধান যখন প্রচুর, তখন এমনো তো হতে পারে যে, সে সময়ের মধ্যে মানুষ বেশ কিছু প্রমাণ ও তথ্যজ্ঞান আহরণ করেছিল এবং সেইসব তথ্য ও প্রমাণ মহাপ্লাবনের ঘটনার উপরে নতুন করে আলোকসম্পাত করেছিল। (আর সেই আলোকেই রচিত হয়েছিল কোরআনের মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত কাহিনী)। এ প্রশ্নের জবাব একটিই, আর তা হল, 'না'। কেননা, বাইবেলের পুরাতন নিয়মের কাল থেকে কোরআন অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত যে সময়টা, সে মুদ্দতে মহাপ্লাবনের এই সুপ্রাচীন কাহিনীর সত্যতার ব্যাপারে মানবজাতির নিকট শুধু একটি দলিলই প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান ছিল, আর তা হল, খোদ এই বাইবেলটি।

সুতরাং, একদিকে মহাপ্লাবন-সংক্রান্ত আধুনিক তথ্যজ্ঞানের সাথে কোরআনের বর্ণনায় এই যে সামঞ্জস্য এবং অন্যদিকে সেই সামঞ্জস্য-বিধানের ব্যাপারে মানুষের হস্তক্ষেপ বা ভূমিকার কোনো প্রমাণ না-থাকায় মহাপ্লাবনের প্রশ্নে কোরআনের সেই বক্তব্যের সঠিকত্বের ব্যাপারে অপর ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করতেই হয়। বলা অনাবশ্যক যে, সেই অপর ব্যাখ্যাটি হল এই : "একদা বাইবেল ছিল প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত আসমানী কিতাব। কিন্তু সময়ে বাইবেলের বাণীসমূহ মানুষের হস্তক্ষেপে বিকৃত হয়ে পড়ে। তারপর অবতীর্ণ হয় আরেকটি প্রত্যাদেশপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ : কোরআন।"

ইহুদীদের মিসরত্যাগ

হযরত মুসা এবং তাঁর অনুসারীদের মিসরত্যাগের ঘটনাটি ঐতিহাসিক যেকোনো বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। প্রথমপর্যায়ে তাঁরা গিয়েছিলেন কেনানে। ঘটনাটি ঐতিহাসিক এবং এ ঘটনা কমবেশি সবার জানা। যদিও এ ঘটনা নিয়ে মাঝেমধ্যে অভিযোগ উঠতে দেখা যায়, 'ইতিহাসের চেয়ে এ ঘটনায় উপকথার ভাগই বেশি।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বর্ণনায় দেখা যায়, ইহুদীদের মিসরত্যাগের এই ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে পেন্টাটেক বা তাওরাতের দ্বিতীয় পুস্তকখানি। এতে আরো স্থান পেয়েছে— ইহুদীদের নিরুদ্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়ানোর কাহিনী ও তাদের নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্র-সংঘ গঠন (চুক্তি) কাহিনী। এবং এই কাহিনী শেষ হয়েছে সিনাই পর্বতে হযরত মুসা কর্তৃক আল্লাহ্‌র দিদার বা দর্শনপ্রাপ্তির বর্ণনার মাধ্যমে।

স্বাভাবিককারণেই এই ঐতিহাসিক বিষয়টি নিয়ে কোরআনেও বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। ফেরাউনের সাথে হযরত মুসা ও তাঁর ভাই হযরত হারুনের আলোচনা এবং ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনাবলী নিয়ে দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে কোরআনের দশটিরও বেশি সূরায় : তন্মধ্যে ৭, ১০, ২০ ও ২৬ নং সূরা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপরাপর সূরার মধ্যে কোনোটিতে রয়েছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। আর কোনো কোনোটাতে এই ঘটনাগুলো শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মিসরীয়দের পক্ষে এই ঘটনায় যিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁর উপাধি ছিল ফেরাউন : এই নামটি (যতদূর সম্ভব ড. মরিস বুকাইলির জানামতে) কোরআনের ২৭টি সূরায় চুয়াত্তর বার উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনাটি সম্পর্কে বাইবেল ও কোরআনের যে বর্ণনা, তার তুলনামূলক আলোচনা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। উদাহরণস্বরূপ, শুধু মাহপ্লাবনের বর্ণনায় এই দুই ধর্মগ্রন্থের গরমিল যে কত বেশি, তা ইতিমধ্যে জানা হয়েছে। অথচ, ইহুদীদের মিসরত্যাগের কাহিনীতে উভয় ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায় বহুবিষয়ে মিল দেখা যায়, গরমিল যে একেবারে নেই তা নয়। তবে, এটা একক্ষেত্রেই দেখা যায়,

বাইবেলের বর্ণনার মধ্যেও রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। উল্লেখ্য যে, বাইবেলের বর্ণনা থেকেই আমরা ফেরাউনের বরং বলা চলে দু'জন ফেরাউনের পরিচয় লাভ করেছি। এই যে দু'জন ফেরাউনের অস্তিত্ব, এ ধারণার সূচনা ঘটেছে বাইবেলের বর্ণনা থেকেই। আর কোরআনে বর্ণিত তথ্যের আলোকে সে ধারণা মোটামুটিভাবে সাব্যস্তও হয়ে যাচ্ছে। এদিকে, হালে আবিস্কৃত নানা আধুনিক তথ্য ও প্রমাণ এই দুই ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত এই ঘটনার উপর নতুন করে আলোকসম্পাত করতেও সক্ষম হয়েছে। আর এভাবেই বাইবেল, কোরআন ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্মিলিত অবদানে ধর্মীয় গ্রন্থে বর্ণিত একটি কাহিনীকে আজ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড় করানো সম্ভব।

বাইবেলের বর্ণনা ঃ বাইবেলে ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনার বর্ণনা শুরু হয়েছে হযরত ইয়াকুবের মিসরে প্রবেশের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। হযরত ইয়াকুব সেখানে হযরত ইউসুফের সাথে মিলিত হন। এরপর বাইবেলের যাত্রাপুস্তকের ১, ৮-এর বর্ণনা অনুসারে ঃ

> "পরে মিসরের উপরে এক নতুন রাজা উঠিলেন, যিনি যোসেফকে (হযরত ইউসুফ) জানিতেন না।"

এরপর চলল, নির্যাতনের পালা। ফেরাউন ইহুদীদের দুটি নগরী পিথম ও রামিষেষ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। বাইবেলে এই দুটি নগরীর এই নামই রয়েছে। [যাত্রপুস্তক ১, ১১] ইহুদীদের বংশবৃদ্ধি ঠেকানোর উদ্দেশ্যে ফেরাউন নির্দেশ দিলেন যে, তাদের প্রতিটি নবজাতক পুত্রসন্তানকে নদীতে নিক্ষেপ করতে হবে। এতদ্‌সত্ত্বেও, হযরত মুসাকে তাঁর মা মাস তিনেক লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। পরে উপায়ান্তর না দেখে তিনি শিশু মুসাকে একটি নলখাগড়ার ঝুড়িতে ভরে নদীর কিনারে রেখে এলেন। ফেরাউনের কন্যা সেখানে ওই শিশুকে দেখতে পেলেন। সেখান থেকে শিশু মুসাকে নিয়ে এসে এক ধাত্রীর কাছে রাখতে দেয়া হল : সে ধাত্রী অন্য কেউ নয়, শিশু মুসার নিজের মা। এটা এই কারণে সম্ভব হয়েছিল যে, নদীর তীরে রাখা শিশুটির ভাগ্যে শেষপর্যন্ত কি ঘটে, তা গোপনে হযরত মুসার বোন দেখছিলেন। ফেরাউনের কন্যা যখন শিশু মুসাকে উদ্ধার করেন, তখন সেই বোন শিশুটিকে না চেনার ভান করে রাজকন্যাকে এক ধাত্রীর সন্ধান দেন, যিনি আসলে হযরত মুসার মা। সেই থেকে হযরত মুসা ফেরাউনের সন্তান হিসেবেই বেড়ে উঠতে থাকেন। তাঁর নাম রাখা হয় মুসা (ইংরেজি বাইবেলে মোজেস, বাংলা বাইবেলে মোশি)।

যৌবনে হযরত মুসা অন্য এক দেশে চলে যান, দেশটির নাম মাদিয়ান (বাইবেলে মিদিয়ন)। সেখানে তিনি বিবাহ করেন এবং দীর্ঘকাল অবস্থান

করেন। বাইবেলে এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এরপর, যাত্রাপুস্তকে বলা হয়েছে (২, ২৩) ঃ "অনেক দিন পরে মিসররাজের মৃত্যু হইল।

তখনই আল্লাহ্ হযরত মুসাকে ফেরাউনের কাছে যাওয়ার এবং তাঁর ভাইদের (ইহুদীদের) মিসর থেকে বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন, (এই নির্দেশদানের ঘটনাটি ঘটে 'প্রজ্বলিত ঝোপের' ঘটনার মধ্যে)। আল্লাহ্র সেই নির্দেশ এ কাজে হযরত মুসাকে তাঁর ভাই হযরত হারুনের সাহায্য করার কথা ছিল। সে কারণে হযরত মুসা মিসরে ফিরেই তাঁর ভাইকে সাথে নিয়ে ফেরাউনের কাছে গেলেন। এই ফেরাউন ছিলেন সাবেক সেই ফেরাউনের স্থলাভিষিক্ত, যে ফেরাউনের সময় হযরত মুসা জন্মগ্রহণ করেন।

ফেরাউন ইহুদীদের মুসার সাথে মিসর ত্যাগ করতে দিতে রাজি হলেন না। আল্লাহ্ পুনরায় হযরত মুসাকে দেখা দিলেন এবং মুসাকে নির্দেশ দিলেন হযরত মুসা যেন আবারও ফেরাউনকে অনুরোধ জানায়। বাইবেলের মতে, তখন হযরত মুসার বয়স ছিল আশি বছর। অলৌকিক কার্যকলাপের মাধ্যমে হযরত মুসা ফেরাউনকে জানিয়ে দেন যে, তিনি অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ না হওয়ায় আল্লাহ্ মিসরের উপর প্লেগের গজব নাজিল করেন। সমস্ত নদীর পানি রক্তে পরিণত হয়। এরপর প্রাদুর্ভাব ঘটে ব্যাঙ, পতঙ্গ ও ডাঁশ মাছির। গবাদিপশুগুলো মারা যেতে থাকে; মারাত্মক ধরনের ফোঁড়া দেখা দেয়, মানুষজন ও জন্তু-জানোয়ারের দেহে। অবিরাম শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। দেখা দেয়, পঙ্গপালের আক্রমণ। অন্ধকার নেমে আসে গোটা মিসরের বুকে। প্রতিটি পরিবারের প্রথম সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হতে শুরু করে। কিন্তু এতকিছুর পরেও ফেরাউন ইহুদীদের মিসর ত্যাগ করতে দিতে রাজি হলেন না।

এরপর ইহুদীরা 'রামিষেষ নগরী' থেকে জোট বেঁধে একযোগে বেরিয়ে পড়ে (যাত্রাপুস্তক ১২, ৩৭)। "মহিলা ও শিশুদের ছাড়াই" তাদের সংখ্যা ছিল ৬,০০,০০০। এই পর্যায়ে ফেরাউন "আপন রথ প্রস্তুত করাইলেন ও আপন লোকদের সঙ্গে লইলেন। ... মিসররাজ ফেরাউন ... ইস্রায়েল সন্তানদের পিছু পিছু ধাবমান হইলেন, তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা ঊর্ধ্বহস্তে বহির্গমন করিতেছিল।" (যাত্রাপুস্তক ১৪, ৬ এবং ৮)।

মিসরীয়রা সমুদ্রের পাড়ে হযরত মুসার লোকজনদেরকে ধরে ফেলার উপক্রম করল। হযরত মুসা তাঁর লাঠি তুলে ধরে নির্দেশ দিলেন সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে গেল। তাঁর অনুসারীরা হেঁটে সমুদ্র অতিক্রম করল। তাদের পা পর্যন্ত ভিজল না।

"পরে মিস্রীয়েরা, ফেরাউনের সকল অশ্ব ও রথ, এবং অশ্বারূঢ়গণ ধাবমান হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবেশ করিল।" (যাত্রাপুস্তক ১৪, ২৩)

"জল ফিরিয়া আসিল ও তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল। তাহাতে ফেরাউনের সে-সকল সৈন্য তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না। কিন্তু ইস্রায়েল-সন্তানেরা শুষ্ক পথে সমুদ্রের মধ্য দিয়া চলিল, এবং তাহাদের দক্ষিণে ও বামে জল প্রাচীরস্বরূপ হইল।" (যাত্রাপুস্তক ১৪, ২৮-২৯)

যাত্রাপুস্তকের এই বর্ণনা খুবই স্পষ্ট : যারা ইহুদীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাহাদের পুরোভাগে ছিল স্বয়ং ফেরাউন। সুতরাং, এই ধ্বংসলীলায় ফেরাউনও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যাত্রাপুস্তকে বলা হয়েছে, "তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না।" বাইবেলের গীত-সংহিতায় (সাম) এই ঘটনা পুনরায় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। যথা ঃ গীত-সংহিতা ১০৬, বাণী ১১; ১৩৬ বাণী ১৩ ও ১৫। এগুলো হচ্ছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে শোকরিয়া-জ্ঞাপনের গীত :

"তিনি সুফ সাগরকে (হিব্রু ভাষায়— ইয়াম সুফ, ইংরেজিতে রাশ, বাংলায় নলখাগড়া) দ্বিভাগ করিলেন... এবং তাহার মধ্যেদিয়ে ইস্রায়েলকে পার করিলেন... কিন্তু ফেরাউন ও তাহার বাহিনীকে সুফ সাগরে ঠেলিয়া দিলেন।"

সুতরাং, বাইবেলের মতে, ইহুদীদের পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউন যে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু, পরে ফেরাউনের লাশের কি হল, বাইবেলে সে সম্পর্কে কিছু নেই।

কোরআনের বর্ণনা ঃ ইহুদীদের মিসরত্যাগ-সংক্রান্ত কোরআনের বর্ণনা বৃহত্তর পরিসরে বাইবেলের অনুরূপ। তবে, কোরআনের বর্ণনাগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে নিতে হয়, কেননা, সেসব বর্ণনা গোটা কিতাবে রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

বাইবেলের মত কোরআনেও মিসররাজ ফেরাউনের এমন কোনো নাম উল্লেখ নেই যা দিয়ে ইহুদীদের মিসরতাগের প্রাক্কালে কোন ফেরাউন মিসরে রাজত্ব করতেন, তা নির্দিষ্ট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। কোরআনের বর্ণনা থেকে শুধু এতটুকু জানা যাচ্ছে, তৎকালীন ফেরাউনের 'হামান' নামে একজন উপদেষ্টা ছিলেন। কোরআনে এই হামানের নাম ছয়বার উল্লেখ করা হয়েছে। (১৮ নং সূরার ৬, ৮ ও ৩৮ নং আয়াত, ২৯ নং সূরার ৩৯ নং আয়াত এবং ৪০ নং সূরার ২৪ ও ৩৬ নং আয়াতে)।

কোরআনের মতে, ফেরাউন ছিলেন ইহুদী-উৎপীড়ক :

"যখন মুসা তাঁহার লোকজনদের বললেন : স্মরণ কর, আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহ— তোমাদের প্রতি। এই অনুগ্রহ তিনি দিয়েছিলেন ফেরাউনের লোকজনের হাত থেকে তোমাদের মুক্ত করতে। তারা তোমাদের উপর নিদারুণ নিপীড়ন চালাতো; তোমাদের পুত্রসন্তানদের হত্যা করতো এবং জীবিত রাখতো তোমাদের মহিলাদের।"— সূরা ১৪, আয়াত ৬।

একই ভাষায় এই ফেরাউনী নিপীড়নের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে ৭ নং সূরার ১৪১ নং আয়াতে। কোরআনে অবশ্য বাইবেলের মত বন্দী ইহুদীদের দ্বারা দু'টি শহর নির্মাণের কথা নেই।

শিশু মুসা নবীকে যখন নদীর তীরে রেখে আসা হয়েছিল, সে কাহিনী কোরআনের ২০ নং সূরার ৩৯-৪০ নং আয়াতে এবং ২৮ নং সূরার ৭ থেকে ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত আছে। কোরআনের বর্ণনামতে, শিশুনবী মুসাকে গ্রহণ করেছিলেন ফেরাউনের পরিবার। এ বিষয়ে ২৯ নং সূরার ৮ ও ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

> "ফেরাউনের পরিবার তাহাকে তুলিয়া লইল। (ইহাই ছিল অভিপ্রায়) যে (মুসা) তাহাদের বিরুদ্ধবাদী হইবে এবং তাহাদিগকে আজাবে ফেলিবে। ফেরাউন, হামান এবং তাহাদের লোকজনেরা ছিল পাপাচারী। ফেরাউনের স্ত্রী কহিলেন, (সে হইবে) চোখের আনন্দ আমার ও তোমার জন্য। তাহাকে হত্যা করিও না। সে আমাদের কাজে লাগিতে পারে; অথবা আমরা তাহাকে পুত্র হিসেবেও গ্রহণ করিতে পারি। তাহারা ধারণা করিতে পারে নাই (সামনে কি হইবে)।"

মুসলিম সমাজে প্রচলিত কাহিনী থেকে জানা যায়, ফেরাউনের স্ত্রী বিবি আছিয়া শিশুনবী মুসাকে লালন-পালন করেছিলেন। কোরআনের মতে, ফেরাউনের পরিবারের লোকজন মুসা নবীকে কুড়িয়ে পেয়েছিল।

হযরত মুসার যৌবনকাল, মাদিয়ানে তাঁর অবস্থান এবং তাঁর বিবাহ-সংক্রান্ত বর্ণনা রয়েছে কোরআনের ২৮ নং সূরার ১৩ থেকে ২৮ নং আয়াতে। বিশেষত 'প্রজ্বলিত ঝোপ'-সংক্রান্ত বর্ণনা দেখা যায় ২০ নং সূরার প্রথম রুকুতে এবং ২৮ নং সুরার ৩০ থেকে ৩৫ নং আয়াতে। যদিও কোরআনে বাইবেলের মত দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে বলা হয়নি যে, আল্লাহ্র গজব হিসেবে মিসরে দশ ধরনের প্লেগ নাজিল হয়েছিল। কোরআনে সংক্ষিপ্তাকারে মাত্র পাঁচ ধরনের প্লেগের কথা বর্ণিত হয়েছে। (সূরা ৭, আয়াত ১৩৩) যথা ঃ বন্যা, পতঙ্গ, উকুন, ব্যাঙ এবং রক্ত।

কোরআনেও মিসর থেকে ইহুদীদের পালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেমনটি বাইবেলে রয়েছে। তাদের পলায়নপথের কোনো বিবরণ সেখানে নেই কিংবা নেই পলায়নপর ইহুদীদের সংখ্যাও। এটা ধারণা করা সত্যি মুশকিল যে, কিভাবে ৬ লক্ষ মানুষ এবং তাদের পরিবারবর্গ এত দীর্ঘসময় ধরে মরুভূমিতে অবস্থান করছিল। অথচ, বাইবেল সেকথাই বিশ্বাস করতে বলছে। ইহুদীদের পশ্চাদ্ধাবনকারী ফেরাউনের মৃত্যু কিভাবে ঘটেছিল, কোরআনে তার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

"ফেরাউন তাহাদের ধাওয়া করিতেছিল নিজের লোকলশকরসহ এবং সমুদ্র তাহাদের ঢাকিয়া ফেলিল।"—সূরা ২০, আয়াত ৭৮।

এভাবে ইহুদীরা রক্ষা পেল, ধ্বংস হয়ে গেল ফেরাউন। কিন্তু তার মৃতদেহটা পাওয়া গেল : অতি গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনার কোনো বর্ণনা কিন্তু বাইবেলে নেই।

"আমরা পার করাইয়া নিলাম বনী ইসরাইলকে সমুদ্রের মধ্যদিয়া। ফেরাউন ও তাহার লোকলশকর তাহাদিগকে ধাওয়া করিতেছিল— বিদ্রোহ ও আক্রোশবশত— শেষপর্যন্ত যখন সে ডুবিয়া যাইতে বসিল, বলিল : আমি ঈমান আনিলাম আর কোনো মাবুদ নাই সেই আল্লাহ্ ছাড়া— যাঁহার উপরে বনী ইসরাইল বিশ্বাসী। আমিও তাহাদের শামিল— যাহারা তাঁহার প্রতি আত্মসমর্পণকারী।' — সূরা ১০, আয়াত ৯০ থেকে ৯২।

"আল্লাহ্ বলিলেন, কি? তুমি বিদ্রোহ করিয়াছ, নীতিভ্রষ্টতার কারণ হইয়াছ। এখন আমরা তোমাকে টিকাইয়া রাখিব তোমার লাশের মাধ্যমে। যাহাতে তুমি নিদর্শন হইতে পার তাহাদের জন্য— যাহারা তোমার পরে আসিবে। তবে, নিশ্চয় মানবজাতির অনেকেই আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফেল।"

এই বক্তব্যের দুইটি বিষয় ব্যাখ্যার দাবিদার :

(ক) ফেরাউনের বিদ্রোহ ও শত্রুতার যে কথাটা এখানে বলা হয়েছে, তা বুঝতে হবে হযরত মুসা কর্তৃক ফেরাউনকে সৎপথে ফেরাবার প্রয়াস-প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে; এবং

(খ) ফেরাউনকে উদ্ধার করা বা টিকিয়ে রাখার কথাটির দ্বারা বুঝতে হবে তার লাশের সংরক্ষণ। কেননা, কোরআনে (১১ নং সূরার ৯৮ নং আয়াতে) স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরাউন ও তার সঙ্গীদের চরম পরিণতি হবে জাহান্নাম।

"কেয়ামতের দিন (ফেরাউন) তাহার লোকজনের পুরোভাগে থাকিয়া অগ্রসর হইবে; এবং দোজখে যাওয়ারকালে তাদের নেতৃত্ব দিবে।"—সূরা ১১, আয়াত ৯৮।

এতক্ষণ যেসব ঘটনা ও কাহিনীর উল্লেখ করা হল, এবারে আধুনিক যুগের আবিস্কৃত ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যজ্ঞানের আলোকে সেসবের সত্যাসত্য নির্ণয় করা যেতে পারে। সে বিচারে প্রথমেই ধরা পড়ে—ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনা সম্পর্কে কোরআন ও বাইবেলের বর্ণনার পার্থক্য। ওই পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ

— হযরত মুসার অনুসারী ইহুদীদের দ্বারা যে দু'টি নগরী নির্মিত হয়েছিল, কোরআনে সে দু'টি নগরী নির্মাণের কিংবা নগরী দু'টির নামের কোনো উল্লেখ নেই। যেমনই, উল্লেখ নেই ইহুদীরা কোন পথে মিসর ত্যাগ করেছিল।

— হযরত মুসা যখন মাদিয়ানে অবস্থান করছিলেন, তখন যে একজন ফেরাউন (তৎকালীন মিসরের শাসকবর্গের উপাধি ছিল : ফেরাউন) মারা যান, কোরআনে তারও কোনো উল্লেখ নেই।

— হযরত মুসা কত বছর বয়সে ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে সৎপথে ফিরবার এবং ইহুদীদের মিসরত্যাগের অনুমতিপ্রদানের আবেদন জানিয়েছিলেন, —তাও কোরআনে অনুল্লিখিত।

— কোরআনে হযরত মুসার অনুসারীদের কোনো উল্লেখ করা হয়নি। ওদিকে বাইবেলে এই সংখ্যাকে অবিশ্বাস্যভাবে বেশি করে দেখানো হয়েছে (বলা হয়েছে, পুরুষ ছিল ৬,০০,০০০ জন এবং তাদের পরিবারবর্গ মিলে মোট ইহুদীদের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষাধিক)।

— সমুদ্রে ডুবে মারা যাওয়ার পর ফেরাউনের লাশ যে উদ্ধার করা হয়েছিল, বাইবেলে সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

আলোচ্য ঘটনার বিশ্লেষণের বেলায় উল্লিখিত পার্থক্যগুলো অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে। কেননা, পার্থক্যের পাশাপাশি— এই বিষয়ে উভয় ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায় কিছু কিছু মিলও রয়েছে। যেমন :

— ফেরাউন যে হযরত মুসার অনুসারী ইহূদীদের উপর উৎপীড়ন চালাত, কোরআন তা সমর্থন করছে।

— উভয় ধর্মগ্রন্থে তৎকালীন কোনো মিসরীয় শাসকের অর্থাৎ ফেরাউনের আসল নামের কোনো উল্লেখ নেই।

— ইহুদীদের মিসরত্যাগের সময় যে ফেরাউন ডুবে মারা গিয়েছিল, কোরআনের বর্ণনায় তার সমর্থন রয়েছে।

বাইবেল এবং কোরআনে ইহুদীরা মিসরে যেভাবে দিন গুজরান করত এবং যে পথে তারা মিসর ত্যাগ করেছিল সে বিষয়ে যে তথ্যাবলী পাওয়া যাচ্ছে, তার সাথে আধুনিক যুগে প্রাপ্ত তথ্যজ্ঞানের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ হতে পারে। তবে, একদিকের এই বিচার-বিশ্লেষণ বড় বেশি সমস্যার কারণ হিসেবে দেখা দেয়; আবার কোনো কোনো তথ্য এত গুরুত্বহীন যে, সে সম্পর্কে কোনো আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বিষয়ের বিশ্লেষণ

মিসরে ইহুদীরা ঃ প্রকৃতপক্ষে, ভুলের তেমন কোনো ঝুঁকি না নিয়েই বলা যেতে পারে যে, ইহুদীরা মিসরে বসবাস করেছিল মোটামুটিভাবে ৪০০ অথবা ৪৩০ বছর। এটাই বাইবেলের বর্ণনা (আদিপুস্তক ১৫, ১৩ এবং যাত্রাপুস্তক ১২. ৪০)। এ বিষয়ে আদিপুস্তক ও যাত্রাপুস্তকে সময়ের যে পার্থক্য তা তেমন ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। ইহুদীদের মিসরে বসবাসের সূচনা ঘটে হযরত ইবরাহীমের অনেক পরে, যখন হযরত ইয়াকুবের পুত্র হযরত ইউসুফ ভাইদের সাথে নিয়ে মিসর গিয়েছিলেন সেই সময় থেকে। কোরআনে ইহুদীদের মিসরে যাওয়ার কথাই শুধু উল্লেখ রয়েছে; তবে সেখানে তারা কত বছর বসবাস করেছিল, সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই। বাইবেলে প্রদত্ত সময়ের উদ্ধৃত করা হয়েছে। তদুপরি, তেমন কোনো আর তথ্য-পরিসংখ্যান নেই যার মাধ্যমে এ বিষয়ে আরো কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে।

গবেষকগণ মনে করেন, হযরত ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মিসর যাওয়া এবং হাইকসস্ রাজবংশের মিসর অধিকারের ঘটনা খুব সম্ভব একই সময়ের। কেননা,

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তদশ শতকে একজন হাইকসস্ নরপতি সম্ভবত হযরত ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের নীল-বদ্বীপের আভারিস নামক স্থানে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

সন্দেহ নেই যে, উপর্যুক্ত ভাষ্যকারদের এই ধারণা বাইবেলের বর্ণনার বিপরীত। কেননা, বাইবেলে বলা হয়েছে (রাজাবলি ঃ ১, ৬, ১) ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল হায়কলে সোলায়মান (খ্রিস্টপূর্ব ৯৭১ সালের দিকে) নির্মাণের ৪৮০ বছর আগে। এ হিসেব থেকে পাওয়া যায়, ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ১৪৫০ অব্দে। হিসেব অনুসারে ইহুদীদের মিসরে বসবাস শুরুর সময়টা দাঁড়ায় খ্রিস্টপূর্ব ১৮৮০ থেকে ১৮৫০ অব্দের দিকে। পক্ষান্তরে, ধারণা করে আসা হচ্ছে যে, তখন হযরত ইবরাহীম জীবিত ছিলেন।

বাইবেলের অন্য বর্ণনা থেকে অবশ্য জানা যাচ্ছে যে, হযরত ইউসুফ থেকে হযরত ইবরাহীমের সময়ের ব্যবধান ছিল ২৫০ বছর। এই পরবর্তী হিসেব যদি সত্য হয়, তাহলে সময়ানুক্রমের বিচারে বাইবেলেরই রাজাবলি—১ অধ্যায়ে বর্ণিত হিসেব অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে।

দেখা যায়, রাজাবলি—১-এর তথ্য কিভাবে বাইবেলের অন্যস্থানে বর্ণিত তথ্যকে নাকচ করে দিচ্ছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, এই আলোচনার উদ্দেশ্য বাস্তবে বাধাগ্রস্ত করছে— অন্যকিছু নয়, বরং বাইবেলে বর্ণিত এমনিধারার এলোমেলো ও অসঠিক সময়-গণনার হিসেব।

ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিবরণ ছাড়া ইহুদীদের মিসরে অবস্থানের আর তেমন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ নেই। অবশ্য, সাংকেতিক চিত্রলিখন পদ্ধতিতে (হাইয়ারোগ্লিফিক) রচিত এমনকিছু দলিলপত্র পাওয়া যাচ্ছে— যাতে দেখা যায়, এককালে মিসরে এমন একধরনের শ্রমিক ছিল যাদের বলা হত— আপিরু, হাপিরু অথবা হাবিরু। এই শ্রমিক শ্রেণীকেই (ভুল অথবা শুদ্ধ যেভাবেই হোক) হিব্রু বা ইহুদী হিসেবে সনাক্ত করা হয়। সাধারণত, এই শ্রেণীর শ্রমিক রাজমিস্ত্রি, কৃষক-মজুর অথবা ফসল কাটার কামলা হিসেবে কাজ করত। কিন্তু, এরা এলো কোত্থেকে? এর জবাব পাওয়া খুবই মুশকিল। এ বিষয়ে ফাদার ডি ভক্স-এর বক্তব্য হচ্ছে : এরা স্থানীয় লোক ছিল না; এরা স্থানীয় সমাজের সাথে একীভূতও হয়নি। তাছাড়া, এরা সকলেই এক পেশার বা সমমর্যাদার লোকও ছিল না।

তৃতীয় টুথমোসিসের আমলের প্যাপিরাসে লিপিবদ্ধ এক রচনা অনুসারে, এরা ছিল 'আস্তাবলের শ্রমিক'। এও জানা যাচ্ছে যে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে,

মিসরের অধিপতি দ্বিতীয় এ্যামেনোফিস— কেনান থেকে এদের প্রায় ৩৬০০ জনকে বন্দী করে এনেছিলেন। ফাদার ডি বক্স-এর মতে, এদের বেশিরভাগই ছিল সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের অধিবাসী। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দের দিকে অধিপতি প্রথম সেথোসের আমলে এই 'আপিরু' লোকেরা দারুণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। কেনানের বেথ-শিন এলাকায়। দ্বিতীয় রামেসিসের আমলে এদের অনেককে ফেরাউনের কাজে যেমন, গ্রেট পাইলন অব রামেসিস মিয়ামনের পাথর খোদাই কিংবা পাথর টানা শ্রমে নিয়োগ করা হয়। বাইবেল থেকে আরো জানা যায়, দ্বিতীয় রামেসিসের আমলে উত্তরাঞ্চলীয় রাজধানী রামেসিস নগরী নির্মাণের কাজে কিভাবে ইহুদীদের লাগানো হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর মিসরীয় রচনাবলীতে পুনরায় 'আপিরুদের' উল্লেখ দেখা যায় এবং এদের সর্বশেষ উল্লেখ রয়েছে, তৃতীয় রামেসিসের কাহিনীতে।

যাহোক, 'আপিরু' শব্দটা যে কেবল মিসরেই ব্যবহৃত হত, তা নয়। সুতরাং, এই শব্দটার দ্বারা শুধু যে হিব্রু তথা ইহুদীদেরই বোঝাবে, সেটাই বা নিশ্চিত করে বলা চলে কিভাবে? বলে রাখা ভালো যে, এই 'আপিরু' শব্দটা প্রথম দিকে "জবরদস্তিমূলকভাবে কাজে ব্যবহৃত সবধরনের শ্রমিক মজুরের" বেলায় ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে, সে শ্রমিকেরা যেখান থেকেই আসুক-না-কেন। এভাবে, পরবর্তীকালে এ শব্দটা এই ধরনের যে-কোনো শ্রমিকের বিশেষণ হিসেবেও প্রচলিত হয়ে থাকতে পারে। এখানে উদাহরণ হিসেবে সুইশে (সুইস) শব্দটার সাদৃশ্য টানতে পারি। ফরাসী ভাষায়, এই শব্দটার বেশ কয়েকটা অর্থ রয়েছে। এর দ্বারা যেমন সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী বোঝায়, তেমনি এর দ্বারা বোঝানো হয় অতীতের ফরাসী রাজাদের সেইসব ভাড়াটে সৈনিককেও, যারা সুইস বংশোদ্ভূত। ভ্যাটিক্যানের পাহারাদার কিংবা খ্রিস্টীয় গির্জার কোনো কোনো চাকুরেকেও 'সুইসে' বলা হয়ে থাকে।

যাহোক, হতে পারে যে, দ্বিতীয় রামেসিসের আমলে এই যে হিব্রু— (ইহুদী,— বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে) অথবা এই যে আপিরু (সাংকেতিক ভাষার রচনামতে), এদের ফেরাউনের নির্দেশ মোতাবেক বড় বড় কাজে লাগানো হয়ে থাকবে। তবে, সেই সাথে এটা বুঝতেও বেগ পেতে হয় না যে, এসব শ্রমিক বলতে গেলে সবাই ছিল 'জবরদস্তির শিকার'। দ্বিতীয় রামেসিস ইহুদী-নিপীড়ক ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাইবেলের যাত্রাপুস্তকে উল্লিখিত 'রামেষিষ' ও 'পিথমনগরী' নীল-বদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত ছিল। অধুনা, তানিস ও কানতির বলে পরস্পর মাইল পনেরো ব্যবধানে যে দু'টি নগরী

মিসরে বিদ্যমান,— উল্লিখিত দুটি প্রাচীন নগরী এই দুই স্থানেই অবস্থিত ছিল। আর এই স্থানেই দ্বিতীয় রামেসিস কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল উত্তরাঞ্চলীয় রাজধানী। সুতরাং, দ্বিতীয় রামেসিসই ছিলেন ইহুদী-নিপীড়ক সেই ফেরাউন।

আর এই পরিবেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত মুসা। কিভাবে শিশুকালে তিনি নদীগর্ভ থেকে উদ্ধার পান, সে বর্ণনা অনেকেরই জানা রয়েছে। হযরত মুসার মিসরীয় একটা নামও ছিল। পি. মর্তে তাঁর 'ইজিপ্ট অ্যান্ড দি বাইবেল" পুস্তকে পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন, একাধিক 'মেসও' অথবা 'মেসি' নাম মিঃ র‍্যাঙ্ক কর্তৃক সঙ্কলিত সাংকেতিক ভাষার নাম-অভিধানের তালিকায় রয়েছে। কোরআনে ব্যবহৃত 'মুসা' নামটি এই প্রাচীন মিসরীয় নামেরই অক্ষরান্তর মাত্র।

মিসরে প্লেগ ঃ এই শিরোনামে বাইবেলে মিসরবাসীদের উপরে আল্লাহ্‌র দশটি গজব নাজিল হওয়ার কথা বিশদভাবে বর্ণিত রয়েছে। এ গজবের অনেকগুলো অলৌকিক ধরনের বা চরিত্রের। কোরআনে গজবের সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে মাত্র পাঁচটি এবং সেই পাঁচটি গজবের প্রত্যেকটিতে প্রাকৃতিক ঘটনাই যে বাড়তি বিপর্যয় হিসেবে দেখা দিয়েছিল কোরআনের বর্ণনায় সেটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ওই পাঁচটি গজব হচ্ছে : বানভাসি, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত।

পঙ্গপাল ও ব্যাঙ-এর দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধির কথা বাইবেলেও বর্ণিত রয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে যে, মিসরের সব নদীর পানি রক্তে পরিণত হয়েছিল এবং সেই রক্ত প্লাবন আকারে সারা দেশ ভাসিয়ে দিয়েছিল (!) কোরআনে শুধু রক্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু সে সম্পর্কে আর কোনো বর্ণনা অনুপস্থিত। সুতরাং, রক্ত বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে যে-কেউ যে-কোনো ধারণা করে নিতে পারেন।

বাইবেলে বাড়তি যেসব গজবের কথা বলা হয়েছে (যেমন— ডাঁশ, পতঙ্গ, মাছি, ফোঁড়া, শিলাবৃষ্টি, অন্ধকার, প্রথম সন্তানের মৃত্যু ও গবাদিপশুর মৃত্যু) সেসবের উৎস কিন্তু উপরোল্লিখিত রক্ত-বন্যার মতই বিস্ময়কর। মূলত, যে বিভিন্ন উৎস থেকে রচনা নিয়ে বাইবেল সংকলিত হয়েছিল এ ধরনের বিবরণ এসেছে সেইসব বিভিন্নমুখী রচনা থেকেই।

যে পথে মিসরত্যাগ

ইহুদীরা কোন পথে মিসর ত্যাগ করেছিল, কোরআনে তার কোনো উল্লেখ নেই। পক্ষান্তরে, বাইবেলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

হালে, ফাদার ডি ভক্স এবং পি. মতেঁ নতুন করে এই বিষয়টার উপরে গবেষণা চালিয়েছেন। ইহুদীরা খুব সম্ভব মিসরের তানিস-কানতির এলাকা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। কিন্তু বাইবেলে যা বলা হয়েছে- তার সমর্থনে কোনোরূপ চিহ্ন বা নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া, সমুদ্রের পানি ঠিক কোন স্থানটিতে দু'ভাগ হয়ে হযরত মুসা ও তাঁর সঙ্গীদের পথ করে দিয়েছিল, তাও নির্দিষ্ট করে বলা অসম্ভব।

সমুদ্রের পানির অলৌকিক বিভক্তি ঃ

কোনো কোনো আধুনিক ভাষ্যকার ইহুদীদের মিসরত্যাগের প্রাক্কালে সমুদ্রের পানি অলৌকিকভাবে দু'ভাগ হওয়ার ঘটনাকে ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করে থাকেন। কারো ধারণা, ঘটনাটা জোয়ার-ভাঁটার সাথে জড়িত : ইহুদীরা ভাঁটার সময় সমুদ্র পার হয়েছিল। কেউ মনে করেন, সমুদ্রের পানি নক্ষত্রালোকের কোনো আকর্ষণ-বিকর্ষণে দু'ভাগ হয়ে পড়েছিল। আবার কেউ কেউ মনে করেন, দূরবর্তী কোনো এলাকায় কোনো এক আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড বিস্ফোরণেও সমুদ্রের পানি দুই ভাগ হতে পারে; কারণ যাই হোক, সমুদ্রের পানি যখন হ্রাস পেয়েছিল, ইহুদীরা সেই সুযোগে সমুদ্র পার হয়; আর তাদের যারা পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, সেই মিসরীয়রা উত্তেজনার মুহূর্তে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই সেই পথে অগ্রসর হয়েছিল আর ভেসে গিয়েছিল সমুদ্রের ফিরতি স্রোতের তোড়ে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, উল্লিখিত সব ক'টা কারণই অনুমানভিত্তিক।

বস্তুতপক্ষে, ফেরাউনদের ইতিহাস থেকে ইহুদীদের মিসরত্যাগের সঠিক বিবরণ লাভের সম্ভাবনা সমধিক। একটি ধারণা দীর্ঘকাল যাবত প্রচলিত রয়েছে যে, ইহুদীরা যখন মিসর ত্যাগ করেছিল, তখন যে ফেরাউন মিসরে রাজত্ব করতেন, তাঁর আসল নাম ছিল মারনেপ্‌তাহ্‌। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় রামেসিসের উত্তরাধিকারী। খ্যাতনামা মিসরতত্ত্ববিদ মিঃ মাসপেরো চলতি শতকের গোড়ার দিকে তাঁর *'ভিজিটর্স গাইড টু দি কায়রো মিউজিয়াম'* পুস্তকে (প্রকাশ ১৯০০ খ্রিঃ) বলেন, "আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রচলিত কাহিনী অনুসারে ইহুদীদের মিসরত্যাগকালে যে ফেরাউন মিসরে রাজত্ব করতেন, তিনি হচ্ছেন খুব সম্ভব মারনেপ্‌তাহ্‌। বলা হয়ে থাকে, তিনি ওই ঘটনায় লোহিত সাগরে ডুবে মারা গিয়েছিলেন।" মিঃ মাসপেরো কোন দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে যে এই অভিমত সাব্যস্ত করে গেছেন, অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেও ড. মরিস বুকাইলি তা উদ্ধার করতে পারেননি। কিন্তু, তাঁর মত সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকারের এই অভিমত, এই গবেষণার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বের দাবিদার হয়ে রয়েছে।

পি. মতেঁ ছাড়া খুব কমসংখ্যক মিসরীয়বিদ ও বাইবেল বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, যাঁরা মিঃ মাসপেরোর উল্লিখিত বক্তব্যের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে গবেষণা চালিয়েছেন। এদিকে গত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন গবেষকের মধ্যে ধর্মগ্রন্থের যে-কোনো বক্তব্যকে সত্য বলে সাব্যস্ত করতে গিয়ে বিভিন্ন ধারণা গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে এও লক্ষণীয় যে, ওইসব গবেষক-উদ্ভাবক একইসঙ্গে ধর্মগ্রন্থের অন্যদিক বা ভিন্ন বক্তব্যের ব্যাপারে মোটেও গা-গরজ করেননি। এরফলে, এই দাঁড়াচ্ছে যে, এ ধরনের উদ্ভাবিত একটি ধারণা, উপস্থিতক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের কোনো একটি বক্তব্যকে হয়তো বা সাব্যস্ত করছে কিংবা সমর্থনও দিতে পারছে। কিন্তু কথা হল, ধর্মীয়-গ্রন্থে (এবং শুধু বাইবেলই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ নয়) আরো তো অনেক তথ্য-পরিসংখ্যান রয়েছে। তাছাড়াও, রয়েছে ইতিহাসের তথ্য, স্থাপত্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ইত্যাদি।

যাহোক, এ সম্পর্কে এইরকম অদ্ভুত একটা ধারণা গড়ে তুলেছেন জে. দ্য মিসেলি (১৯৬০)। তাঁর এই নবউদ্ভাবিত তত্ত্ব— তাঁর নিজস্ব ধারণা মোতাবেক,

সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই নাকি প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য মিঃ মিসেলির উদ্ভাবিত এই তত্ত্ব সম্পর্কে এ পর্যন্ত তেমন কোনো আলোচনা হয়নি। মিসেলি দাবি করেছেন, তিনি ইহুদীদের মিসরত্যাগের সঠিক দিন-তারিখ পেয়ে গেছেন; তারিখটা হচ্ছে— খ্রিস্টপূর্ব ১৪৯৫ অব্দের ৯ই এপ্রিল। ক্যালেন্ডার ও দিনপঞ্জির উপর ভিত্তি করেই নাকি মিসেলি এই দিন-তারিখ নির্ণয় করেছেন। তিনি এও দাবি করেছেন যে, মিসরে তখন রাজত্ব করছিলেন দ্বিতীয় টুথমোসিস। সুতরাং, এই দ্বিতীয় টুথমোসিসই হচ্ছেন ইহুদীদের মিসরত্যাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সেই ফেরাউন। উল্লেখ্য, মিঃ মিসেলির এই তত্ত্ব গড়ে উঠেছে মিসর অধিপতি দ্বিতীয় টুথমোসিস-এর মমি পরীক্ষার ফলাফলের উপর। এই মমি-পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, দ্বিতীয় টুথমোসিস-এর চামড়ায় ছিল ক্ষতচিহ্ন। উক্ত ভাষ্যকার (কেন, তার কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই) আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, চামড়ার এই ক্ষতচিহ্নের কারণ হল কুষ্ঠরোগ। ভাষ্যকারের অভিমত, বাইবেলে মিসরবাসীদের উপর ফোঁড়ার যে গজব নাজিল হয়েছিল, তা সেই কুষ্ঠরোগ ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু এই কষ্ট-কল্পনাকালে উক্ত ভাষ্যকার বাইবেলের আর কোনো বর্ণনার প্রতিই তেমন কোনো গুরুত্ব দেননি। অথচ, এই বাইবেলেই রয়েছে ইহুদীদের রামেসিস নগরী নির্মাণের কথা। এর অর্থ একটিই যে, মিসরে তখন বা তার আগে রামেসিস বা রামেসিস নামে কোনো অধিপতি ছিলেন এবং ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনা সেই রামেসিসের রাজত্বের পূর্বের ঘটনা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। অথচ, মিসরে টুথমোসিস বংশের রাজত্বকাল হচ্ছে রামেসিস-এর পূর্ববর্তী।

আর মমির চামড়ার ক্ষতের কথাই যদি বলা হয়, তা হলেও কিন্তু দ্বিতীয় টুথমোসিস ইহুদীদের মিসর ত্যাগকালীন ফেরাউন হতে পারেন না। কেননা, দ্বিতীয় টুথমোসিসের পুত্র তৃতীয় টুথমোসিস এবং পৌত্র দ্বিতীয় আমেনোফিসের মমির চামড়ায়ও একই ধরনের ক্ষতচিহ্ন বিদ্যমান। মিসরের যাদুঘরে এদের তিনজনেরই মমি সংরক্ষিত রয়েছে। সেসব মমি পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, তাঁদের তিনজনের চামড়াতেই রয়েছে ফোঁড়ার দাগ।

ঠিক একই যুক্তিতে এর আগেকার আরেকটি ধারণাও নস্যাৎ হয়ে যায়। এই ধারণা বা অনুমানকারী হচ্ছেন ড্যানিয়েল রপ্‌স্। তাঁর *'দি পিপল অব দি বাইবেল'* (প্যারিস, ১৯৭০) পুস্তকের অভিমত হল, দ্বিতীয় আমেনোফিসই ছিলেন ইহুদীদের মিসরত্যাগের সময়কার ফেরাউন। বলাবাহুল্য, এই ধারণাও পূর্বোক্ত ধারণার মতই ভিত্তিহীন। যাহোক, পূর্বোক্ত পুস্তকে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় আমেনোফিস-এর পিতা (দ্বিতীয় টুথমোসিস) ছিলেন যারপরনাই জাতীয়তাবাদী চেতনাসম্পন্ন শাসক। তিনিই ইহুদীদের উপরে নির্যাতন চালাতেন বলে

ড্যানিয়েল রপস্ দাবি তুলেছিলেন। তিনি আরো বলেছেন, এই আমেনোফিস-এর সৎমা সুপ্রসিদ্ধ রানী হাটশেপসুট। রফস্-এর মতে, এই রানী সৎমা-ই হযরত মুসার সাথে প্রতারণা করেছিলেন কিন্তু কেন? তার উত্তর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

এদিকে, ফাদার ডি ভক্স-এর অভিমত, দ্বিতীয় রামেসিসই ছিলেন ইহুদীদের মিসরত্যাগকালীন ফেরাউন অর্থাৎ মিসরের অধিপতি। তাঁর এই কল্পনার ভিত কিছুটা শক্ত বটে। *'দি এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি অব ইসরাইল'* পুস্তকে (প্যারিস, ১৯৭১) তিনি তাঁর এই অনুমানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যদিও তাঁর এই অনুমান খোদ বাইবেলের বর্ণনার সাথেই মিলে না তবুও দেখা যায়, তিনি অন্তত একটা বিষয়ে স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, দ্বিতীয় রামেসিসের আমলে তাঁর দ্বারাই 'রামোসিস' ও 'পিথম' নগরীদ্বয় নির্মিত হয়েছিল। বাইবেলে এই দুটি নগরী নির্মাণের কথা আছে। এরদ্বারা অবশ্য এ কথাও প্রমাণ হয় যে, দ্বিতীয় রামেসিস-এর আগে এই দুটি নগরী নির্মিত হতে পারে না। এই দুটি নগরীর নির্মাণকাল হচ্ছে— ড্রাইওটন এবং ভ্যানডিয়ারের ক্রনোলজি অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০১ অব্দ; আর রাওটানের বিবরণ অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব ১২৯০ অব্দ। কিন্তু এই দুই ভাষ্যকারের উভয় অনুমান ধোপে টিকছে না শুধু একটি কারণে যে বাইবেলের বর্ণনামতে— দ্বিতীয় রামেসিস ছিলেন সেই ফেরাউন যাঁর রাজত্বকালে মিসরে ইহুদীদের উপর নিদারুণ অত্যাচার চালানো হত।

ফাদার ডি ভক্স মনে করেন, ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল দ্বিতীয় রামেসিস-এর রাজত্বের প্রথম অর্ধভাগে কিংবা মধ্যভাগে। কিন্তু, তা হলেও ইহুদীদের মিসরত্যাগের সময়কালের হিসেব ঠিক থাকছে না। কারণ, তিনি নিজেই যে সময়কালের মধ্যে হযরত মুসা ও তাঁর অনুসারী ইহুদীদের কেনানে বসতিস্থাপনের কথা বলছেন, এই সময়টা পড়ে তারমধ্যেই। দ্বিতীয় রামেসিসের উত্তরাধিকারী ফেরাউন মারনেপতাহ্— যিনি পিতার মৃত্যুর পর সীমান্তে শান্তি কায়েম করেছিলেন বলে মনে করা হয়, তিনি কিন্তু বনী ইসরাইলকে মিসরে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এ কথাটা তাঁর রাজত্বের পঞ্চমবর্ষে উৎকীর্ণ এক শিলালিপির বর্ণনা থেকে জানা যায়।

সুতরাং, ফাদার ডি ভক্স-এর সিদ্ধান্তের সমান্তরালে দু'টি পাল্টা যুক্তি দাঁড় করা যেতে পারে। যথা ঃ—

(ক) বাইবেলে দেখা যাচ্ছে (যাত্রাপুস্তক ২, ২৩) যে, হযরত মুসা যখন মাদিয়ানে তখন মিসররাজ মৃত্যুবরণ করেন। যাত্রাপুস্তকের বর্ণনামতে এই মৃত্যুবরণকারী মিসররাজ হচ্ছেন তিনিই— যিনি জবরদস্তিমূলকভাবে ইহুদী

শ্রমিকদের দিয়ে রামেসিস ও পিথম নগরী দু'টি নির্মাণ করিয়েছিলেন। আর এই ফেরাউন যদি দ্বিতীয় রামেসিস হয়ে থাকেন, তা হলে শুধু তাঁর উত্তরাধিকারীর আমলেই ইহুদীদের মিসরত্যাগ সম্ভব হতে পারে। ফাদার ডি ভক্স অবশ্য দাবি করেছেন যে, বাইবেলের যাত্রাপুস্তকের ২নং অধ্যায়ের ২৩ নং বাণীটি সন্দেহযুক্ত।

(খ) এরচেয়েও বিস্ময়কর ব্যাপার, জেরুজালেমের বাইবেল শিক্ষায়তনের ডিরেক্টর ফাদার ডি ভক্স তাঁর থিওরিতে ইহুদীদের মিসরত্যাগকালীন ঘটনার বর্ণনা-সম্বলিত বাইবেলের দু'টি অনুচ্ছেদ বেমালুম এড়িয়ে গেছেন। ইহুদীদের পশ্চাদ্ধাবনকালে মিসররাজ যে মারা পড়েন— তার সত্যতা বাইবেলের উক্ত দু'টি অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাষায় উল্লেখ রয়েছে। এ থেকেও বোঝা যায়, প্রথম রাজা বা প্রথম ফেরাউনের মৃত্যুর আগে ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনা ঘটতে পারে না। পুনরাবৃত্তি হলেও বলতে হয় যে, ইহুদীদের মিসরত্যাগকালে মিসররাজ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হন এবং মারা যান। বাইবেলের যাত্রাপুস্তকের ১৩ ও ১৪ নং অধ্যায়ে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে : "তখন তিনি আপন রথ প্রস্তুত করাইলেন ও আপন লোকদিগকে (ইংরেজি বাইবেলে আর্মি— সেনাবাহিনী) সঙ্গে লইলেন ... (যাত্রাপুস্তক ১৪, ৬) ... (মিসররাজ ফেরাউন) "ইস্রায়েল সন্তানদের পিছু পিছু ধাবমান হইলেন, তখন ইস্রায়েল-সন্তানেরা উর্ধ্বহস্তে বহির্গমন করিতেছিল।" (১৪, ৮)... "জল ফিরিয়া আসিল ও তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল, তাহাতে ফেরাউনের যে-সকল সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়েছিল তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না।" (যাত্রাপুস্তক ১৪, ২৮ ও ২৯) এইসব বাণী ছাড়াও বাইবেলের গীত-সংহিতা ১৩৬ নং সংগীতেও ফেরাউনের মৃত্যুর ঘটনার সমর্থন রয়েছে। ফেরাউনের মৃত্যুর জন্য বরং ইহুদীরা এখানে প্রশংসা-গান করছে জেহোভার (সদাপ্রভুর) যিনি "ফেরাউন ও তাহার বাহিনীকে সুফ সাগরে ঠেলিয়া দিলেন।" (গীত-সংহিতা ১৩৬, ১৫)

সুতরাং, হযরত মুসার জীবদ্দশাতেই তিনি যখন মাদিয়ানে ছিলেন, তখন এক ফেরাউনের মৃত্যু হয়, এবং অপর ফেরাউন মৃত্যুবরণ করেন ইহুদীদের মিসরত্যাগের সময়। অতএব, একজন নয়, হযরত মুসার আমলে আমরা পাচ্ছি দু'জন ফেরাউন : একজন নির্যাতনের কালের; অন্যজন ইহুদীদের মিসর ত্যাগের সময়কার। সুতরাং, ফাদার ডি ভক্স-এর এক ফেরাউনের (দ্বিতীয় রামেসিস) থিওরি সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হতে পারে না। কেননা, তিনি এতদসংক্রান্ত বর্ণনার সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেননি। এছাড়াও তাঁর থিওরির বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুক্তি পেশ করা যায়।

দ্বিতীয় রামেসিস ও মারনেপতাহ্

ইতিপূর্বে পি. মতেঁ মাসপেরো কর্তৃক বর্ণিত আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রচলিত কাহিনীর উপর পুনরায় নতুন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সন্দেহাতীত যে, টলেমির সেই স্বর্ণযুগে—অতীত ইতিহাসের বহু কিছু আলেকজান্দ্রিয়াতে সংরক্ষিত ছিল। রোমান-বিজয়কালে সেসব ধ্বংস হয়। এ কত বড় ক্ষতি— অধুনা তা গভীরভাবে হৃদয়াঙ্গম করা যাচ্ছে।

পরবর্তী পর্যায়ে, ইসলামী জাহানে প্রচলিত কাহিনীতে যেমন তেমনি খ্রিস্টান জগতের প্রাচীন লোককাহিনীতেও দুই ফেরাউনের কাহিনী পাওয়া যায়। ২০ শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত 'হোলি হিস্টরিজ' এবং ধর্মীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ্যাবে এইচ. লেসেত্রে রচিত ইতিহাসেও ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনা ফেরাউন মারনেপতাহ্‌র আমলে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। যাহোক, পি. মতেঁ তাঁর 'ইজিপ্ট অ্যান্ড দি বাইবেল' পুস্তকে (১৯৫৯) যে থিওরি দিয়েছেন এবং তার সমর্থনে যেসব যুক্তি তুলে ধরেছেন, তা বাস্তবে কোরআনের বর্ণনায় বিদ্যমান। যদিও, এই খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ তাঁর রচনায় কোরআনের কোনো বরাত উল্লেখ করেননি। তবে, কোরআনের সেসব বর্ণনার আলোচনার আগে আবার ফিরে যেতে হচ্ছে বাইবেলের বর্ণনার আলোচনায়।

বাইবেলের যাত্রাপুস্তকে রামেসিস (রামিষেষ) শব্দটার উল্লেখ রয়েছে বটে কিন্তু ফেরাউনের প্রকৃত কোনো নামের উল্লেখ নেই। এই রামেসিস হচ্ছে সেই অন্যতম নগরী যা জবরদস্তিমূলকভাবে ইহুদীদের দ্বারা নির্মাণ করানো হয়েছিল। এখন জানা যায় যে, বাইবেলে উল্লিখিত এই নগরী নীল-অববাহিকার পূর্বাঞ্চলে তানিস-কানতির এলাকায় অবস্থিত ছিল। এই এলাকাতেই দ্বিতীয় রামেসিস তাঁর উত্তরাঞ্চলীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন এই নগরীতে আরো সৌধমালা ছিল। তবে, দ্বিতীয় রামেসিসই এই নগরীকে গুরুত্বপূর্ণ বর্ণাঢ্য নগরীতে পরিণত করেন। গত কয়েকদশক ধরে এই এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে এর বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই নগরী নির্মাণেই 'রামেসিস' কৃতদাসে পরিণত ইহুদীদের কাজে লাগিয়েছিলেন।

এখন যখন কোনো পাঠক বাইবেলে 'রামেসিস' শব্দটি দেখতে পান তখন তাঁর মনে কোনোও ভাবান্তর জাগে না। কেননা, প্রায় ১৫০ বছর আগে সাংকেতিক চিত্রলিখন পদ্ধতির পাঠোদ্ধার আবিষ্কারকালে চ্যাম্পোলিয়ন এই বিশেষ শব্দটির উপর বিশদভাবে আলোকপাত করেছিলেন। ফলে, সেই থেকে শব্দটি একান্ত পরিচিত হয়ে পড়েছে। এখন এই শব্দটি আমরা আর সব শব্দের মতই পড়ছি, উচ্চারণ করছি এবং আমরা ধরেই রেখেছি, এই শব্দটি দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কথা স্মরণ করুন। চিত্রাক্ষর লিখনের পাঠোদ্ধার পদ্ধতি তখন হারিয়ে গেছে; আর এই 'রামেসিস' শব্দটারও বলতে গেলে ঘটে গেছে অবলুপ্তি। তখন শুধু বাইবেলের পৃষ্ঠাতেই এই শব্দটি অবিকৃতভাবে রয়ে গিয়েছিল; যদিও কিছুসংখ্যক গ্রীক ও ল্যাটিন পুস্তকে এই শব্দটি প্রায় অথবা সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছিল। এ কারণেই ট্যাসিটাস তাঁর 'এ্যনালস' পুস্তকে শব্দটিকে 'রাহমসিস' বলে উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু, বাইবেলে এই নামটি নির্ভুলভাবে সংরক্ষিত ছিল এবং এই শব্দটি বাইবেলের পেন্টাটেক বা তাওরাত অধ্যায়ে চার-চারটি জায়গায় উল্লিখিত রয়েছে। (আদিপুস্তক ৪৭, ১১, যাত্রাপুস্তক ১, ১১ ও ১২, ৩৭ এবং গণনাপুস্তক ৩৩, ৩ ও ৩৩, ৫)

হিব্রু ভাষার বাইবেলে 'রামেসিস' শব্দটি দু'ভাবে লিখিত হয়েছিল। যথা— 'রা (ই) মস' এবং রাইআমস [হিব্রু 'ই'-শব্দটি (আরবী) 'আইন'-এর মত]। বাইবেলের গ্রীক অনুবাদ যা 'সেপ্টোজিন্ট' নামে খ্যাত, সেখানে শব্দটি লেখা হয়েছিল 'রামেসে' বলে। বাইবেলের ল্যাটিন সংস্করণে (ভালগেট) শব্দটিকে করা হয় 'রামেষেস'। ফরাসী ভাষায় অনূদিত ক্লেমেন্টাইন বাইবেলেও (১ম সংস্করণ, ১৬২১) রাখা হয় একই উচ্চারণ 'রামেসিস'। চ্যাম্পোলিয়ন যখন চিত্রাক্ষর সাংকেতিক ভাষা নিয়ে গবেষণা করছিলেন তখন এই ফরাসী বাইবেলটি সর্বত্র প্রচলিত ছিল। চ্যাম্পোলিয়ন তাঁর *'সামারি হাইয়ারোগ্লিফিক অব দি এনসিয়েন্ট ইজিপশিয়ানস'* (২য় সংস্করণ, ১৮২৮, পৃষ্ঠা— ২৭৬)-এ বাইবেলে উল্লিখিত এই শব্দটির বানান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

এইভাবে বাইবেলের হিব্রু, গ্রীক ও ল্যাটিন সংস্করণে 'রামেসিস' নামটি সংরক্ষিত থেকে গিয়েছিল। মজার কথা, বাইবেলের পুরাতন সংস্করণগুলোতে দেখা যায়, ভাষ্যকারবৃন্দ এই শব্দটির অর্থ আদৌও অনুধাবন করতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ, ক্লেমেন্টাইন বাইবেলের ফরাসী সংস্করণে (১৬২১) এই 'রামেসিস' শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একদম গাঁজাখুরিভাবেই বলা হয়েছে : *'থান্ডার অব দি ভারমিন'* অর্থাৎ কিনা এক ধরনের স্তন্যপায়ী হিংস্র জন্তুর গর্জন। (কিনা আশ্চর্য!)

যাহোক, পরবর্তিতে লিখিত বিষয়গুলো সাব্যস্ত করার জন্য উপরের আলোচনাই যথেষ্ট :

(ক) (মিসরের দ্বিতীয় অধিপতি) রামেসিসের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে ইহুদীদের মিসরত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না।

(খ) হযরত মুসা এমন এক ফেরাউনের আমলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন— যিনি রামেসিস ও পিথম নগরী নির্মাণ করেন। তিনিই হচ্ছেন দ্বিতীয় রামেসিস।

(গ) হযরত মুসার মাদিয়ানে অবস্থানকালে ক্ষমতাসীন ফেরাউনের অর্থাৎ দ্বিতীয় রামেসিসের মৃত্যু ঘটে এবং হযরত মুসার জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলী সংঘটিত হয় দ্বিতীয় রামেসিসের উত্তরাধিকারী মারনেপতাহর রাজত্বকালে।

এছাড়াও, বাইবেলে আরো গুরুত্বপূর্ণ এমনকিছু তথ্য রয়েছে, যেসব তথ্যের আলোকে ইহুদীদের মিসরত্যাগের সময় মিসরে ক্ষমতাসীন ফেরাউনের সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব। বাইবেলে বলা হয়েছে, হযরত মুসার বয়স যখন ৮০ বছর, তখন তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে ফেরাউনের কবল থেকে ইহুদীদের মুক্তির প্রচেষ্টা চালান : "ফেরাউনের সহিত আলাপ করার সময় মোশির আশি ও হারুনের তিরাশি বৎসর বয়স হইয়াছিল" (যাত্রাপুস্তক ৭, ৭)। বাইবেলের অন্যত্র (যাত্রাপুস্তক ২, ২৩) বলা হয়েছে, হযরত মুসার জন্মকালে যে ফেরাউন মিসরে রাজত্ব করতেন, হযরত মুসা মাদিয়ানে থাকাকালে সেই ফেরাউনের মৃত্যু হয়। অবশ্য, এরপরেও বাইবেলের বর্ণনার ধারা অব্যাহত থেকেছে এবং মিসর-অধিপতি পরিবর্তনের কোনো কথা সেখানে উল্লেখ নেই। এভাবে, হযরত মুসার মিসরে বসবাসের সময় এই দুই ফেরাউনের রাজত্বকাল যে কমপক্ষে আশি বছর হবেই, বাইবেলের বর্ণনা থেকে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়।

জানা যায়, দ্বিতীয় রামেসিস ৬৭ বছর রাজত্ব করেছিলেন। (ড্রাইওটন ও ভ্যান্ডিয়ারের ক্রনোলজি অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব ১৩০১—১২৩৫; এবং রাওটনের অভিমত অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব ১২৯০—১২২৪। তাঁর উত্তরাধিকারী মারনেপতাহ্ কতদিন রাজত্ব করেছিলেন এতদ্বিষয়ে মিসরতত্ত্ববিদগণ নির্দিষ্ট কোনো হিসেব দিতে পারছেন না। তবে, তাঁর রাজত্ব যে কমপক্ষে দশ বছরকাল স্থায়ী হয়েছিল। তা নিশ্চিত বলা চলে। কেননা, ফাদার ডি ভক্স তাঁর গবেষণায় যে দলিলের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেখানে তাঁর রাজত্বের দশম বছরের কথা উল্লেখ রয়েছে। মারনেপতাহ্‌র রাজত্বকাল সম্পর্কে ড্রাইওটন ও ভ্যান্ডিয়ার দুটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন : হয় তাঁর রাজত্বকাল ছিল দশ বছর (খ্রিস্টপূর্ব ১২৩৪—১২২৪) নতুবা বিশ বছর (খ্রিস্টপূর্ব ১২২৪—১২০৪)। মারনেপতাহ্ কিভাবে মারা যান, সে বিষয়েও মিসরতত্ত্ববিদগণ সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলছেন

না। তাঁরা শুধু জানাচ্ছেন, তাঁর মৃত্যুর পর গোটা মিসরে অভ্যন্তরীণ তীব্র গোলযোগ দেখা দেয়; এবং তা প্রায় ২৫ বছরকাল স্থায়ী হয়।

প্রকৃতপক্ষে, মারনেপতাহর রাজত্বকাল সম্পর্কে দিনপঞ্জির ওই হিসেব কতটা সঠিক, বলা মুশকিল। তবে বাইবেলের বর্ণনামতে প্রাপ্ত এই সময়টাতে— অর্থাৎ উক্ত আশি বছরের মুদ্দতে দ্বিতীয় রামেসিস ও মারনেপতাহ্ ছাড়া তৃতীয় নতুন কোনো রাজার সন্ধান পাওয়া যায় না। এই হিসেব মোতাবেক ইহুদীদের মিসরত্যাগের সময় হযরত মুসার বয়স কত ছিল, তা জানতে হলে সবার আগে জানা দরকার দ্বিতীয় রামেসিস ও মারনেপতাহ্ মোট কত বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। এক্ষেত্রে প্রথম সেথোস ও দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্বকাল একুনে আশি বছর গণনা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, সেথোসের রাজত্বকাল ছিল স্বল্পস্থায়ী। হযরত মুসার মাদিয়ানে গমন, যৌবনপ্রাপ্তি এবং সেখানে তাঁর আশি বছর অবস্থানের সাথে সেই স্বল্পমেয়াদের কোনো মিল নেই। পক্ষান্তরে, হযরত মুসার সময়কালে মাত্র দু'জন ফেরাউনকেই পাচ্ছি।

মূলত, এখানে যে থিওরি তুলে ধরা হল, তার সাথে হুবহু মিল রয়েছে কোরআনের বর্ণনার। বাইবেলের একটিমাত্র বর্ণনার সাথে এই থিওরির বিরোধ পরিলক্ষিত হয়— আর তা হল রাজাবলি—১-এর ৬, ১ অধ্যায়ের বর্ণনা উল্লেখ্য যে, এই পুস্তকটি বাইবেলের পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাওরাত খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই পুস্তকখানি নিয়ে বিতর্ক কম নয়; এবং ফাদার ডি ভক্স বাইবেলের পুরাতন নিয়মের এই অধ্যায়ে উল্লিখিত সময়ের হিসেবে একদম নাকচ করে দিতে দ্বিধা করেননি। উল্লেখ্য, এই অধ্যায়ে হায়কলে সোলায়মানী নির্মাণের সাথে সময়ের হিসেব গণনা করে ইহুদীদের মিসরত্যাগের সময়কাল বলে দেয়া হয়েছে। অথচ, এই হিসেব মোটেও সঠিক নয়। সুতরাং, ভুল এই বর্ণনার সন্দেহযুক্ত এই হিসেবের বরাত টেনে ড. মরিস বুকাইলি যে থিওরি তুলে ধরেছেন, তা নাকচ করা অসম্ভব বলেই তাঁর ধারণা।

মারনেপ্‌তাহ্‌র শিলালিপি

মারনেপতাহ্‌র এই শিলালিপিটি আবিষ্কারের সাথে সাথেই সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়। এই শিলালিপিটি মারনেপতাহ্‌র রাজত্বের পঞ্চমবর্ষে উৎকীর্ণ হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, উৎকীর্ণ এই শিলালিপির বক্তব্য তুলে ধরে অনেক সমালোচক উপরে বর্ণিত 'দুই ফেরাউনের থিওরি'র বিরোধিতা করেন।

তাঁরা আরো বলেন, ইহুদীদের মিসরত্যাগের সাথে সাথেই যে মারনেপতাহ্‌র রাজত্বের অবসান ঘটেছিল, তা নয়।

এই শিলালিপিটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এটি সাংকেতিক চিত্রাক্ষরে লিপিবদ্ধ একমাত্র দলিল যেখানে 'ইসরাইল' শব্দটি বিদ্যমান। তাছাড়া, এই শব্দটির পর জাতিবাচক এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা থেকে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, 'ইসরাইল' বলতে একটি দল বা সম্প্রদায়কেই বোঝানো হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, মারনেপতাহ্‌র রাজত্বের পঞ্চমবর্ষে এই শিলালিপিটি উৎকীর্ণ হয়েছিল। এটি আবিষ্কৃত হয় থেবস মন্দিরে—এটি হচ্ছে ফেরাউনদের শেষকৃত্যের স্থান। মারনেপতাহ্‌ কিভাবে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর উপর একের পর এক বিজয় অর্জন করেছেন, এই শিলালিপিতে তার উল্লেখ রয়েছে। বিশেষত, শিলালিপির শেষদিকে উৎকীর্ণ এক বিজয় বিবরণীতে বলা হয়েছে : "ইসরাইলকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয়েছে, তাদের জড়গোষ্ঠী পর্যন্ত নির্মুল ...।" এই বক্তব্য তুলে ধরা সমালোচকেরা বলছেন, এখানে যেহেতু 'ইসরাইল' শব্দটি রয়েছে, সেহেতু ধরে নেয়া যায় যে, মারনেপতাহ্‌র রাজত্বের পাঁচ বছর পূর্তির আগেই ইহুদীরা কেনানে বসতি স্থাপন করেছিল। এরদ্বারা নাকি এটাও বোঝা যায় যে, ইহুদীদের মিসর ত্যাগের ঘটনা ঘটে গিয়েছিল এর আগেই।

কিন্তু সমালোচকবর্গের এই যুক্তি ধোঁপে টেকে না। কেননা, তাঁদের আপত্তিটা গড়েই উঠেছে কল্পিত একটা ধারণাকে কেন্দ্র করে। আর সেই ধারণাটা হল, কোনো ইহুদী কেনানে বসবাস করত না, তাদের বসবাস ছিল শুধু মিসরেই। ফাদার ডি ভক্সকে আমরা জানি, ফেরাউন হিসেবে দ্বিতীয় রামেসিস-এর সমর্থক। তিনি (তাঁর *'দি এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি অব ইসরাইল'* পুস্তকে) বলছেন,

"দক্ষিণ দিকে কাদেশ এলাকায় ইসরাইলীদের বসতিস্থাপনের যে কথাটা বলা হচ্ছে তা অস্পষ্ট। সময়টা ইহুদীদের মিসরত্যাগের আগেই হবে।" এরদ্বারা তিনি সেই সম্ভাবনার কথাই স্বীকার করেছেন যে, হযরত মুসা এবং তাঁর অনুসারীরা মিসরত্যাগের আগেও ইহুদীদের কোনো কোনো দল মিসর ত্যাগ করে যেতে পারে। 'আপিরু' বা 'হাবিরু' যাদের কখনো কখনো হিব্রু বা ইসরাইলী বলে ধরা হয়ে থাকে— তারা দ্বিতীয় রামেসিসের আমলের আগে এবং ইহুদীদের মিসরত্যাগের বহুপূর্ব থেকেই সিরিয়া-ফিলিস্তিন এলাকায় বসবাস করছিল। আমাদের নিকট এমন দলিল রয়েছে যাতে প্রমাণ হয়, জবরদস্তি-মূলকভাবে মিসরে শ্রমিকের কাজ করার জন্য মিসররাজ দ্বিতীয় আমেনোফিস ৩৬০০ জন যুদ্ধবন্দীকে মিসরে ধরে এনেছিলেন। বাদবাকি ইহুদীরা প্রথম সেথোসের আমলেও কেনানে ছিল এবং সেখানে তারা বেথশিন এলাকায় গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল। পি. মর্তে তাঁর *'ইজিপ্ট অ্যান্ড দি বাইবেল'* গ্রন্থে সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেন। সুতরাং, সত্য হিসেবে এটাই ধরে নিতে হয় যে, মারনেপতাহ্ তাঁর রাজ্যের সীমান্তস্থিত এই বিদ্রোহী-ইহুদীদের কঠোরভাবে দমন করেছিলেন। কিন্তু ওদিকে মিসরের অভ্যন্তরে যেসব ইহুদী ছিল, তারা পরে হযরত মুসার নেতৃত্বে মিসরত্যাগের জন্য জোরদার আন্দোলন শুরু করে দেয়। সুতরাং, মারনেপতাহর রাজত্বের পঞ্চমবর্ষে উৎকীর্ণ এই শিলালিপিটি 'দুই ফেরাউন' অথবা 'মারনেপতাহ'র শেষ ফেরাউন হওয়ার তত্ত্ব নস্যাৎ করে দিতে পারে না।

তাছাড়া, শিলালিপিতে শুধু 'ইসরাইল' শব্দটার অস্তিত্ব হযরত মুসা ও তাঁর লোকজনের কেনানে বসতিস্থাপনের দলিল হতে পারে না। ইহুদী জাতির ইতিহাস এ কথাই বলে। শিলালিপিতে উৎকীর্ণ 'ইসরাইল' শব্দটার উপর এমন শব্দ রয়েছে যার দ্বারা নিঃসন্দেহে 'জনগণ' বোঝায়। 'দেশ'-সূচক কোনো শব্দ সেখানে ব্যবহৃত হয়নি। শিলালিপিতে ব্যবহৃত অন্যান্য নামবাচক বিশেষ্যের ক্ষেত্রেও এটি লক্ষণীয়। এটি হল জেরুজালেম বাইবেল শিক্ষায়তনের অধ্যাপক ফাদার ডি কুরিয়ারের অভিমত, এটি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচিত বাইবেলের যাত্রাপুস্তকের ভাষ্যে (প্যারিস, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ১২)। 'ইসরাইল' শব্দটির মূল এরূপঃ

> বাইবেলের আদিপুস্তক অনুসারে 'ইসরাইল' হল হযরত ইয়াকুবের দ্বিতীয় নাম। হযরত ইয়াকুব হযরত ইসহাকের পুত্র এবং হযরত ইবরাহীমের পৌত্র। *'ইকুনেমিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল— ওল্ড টেস্টামেন্ট'*-এর (১৯৭৫) সুবিজ্ঞ লেখকবৃন্দ মনে করেন, ইসরাইল

শব্দের অর্থ সম্ভবত "আল্লাহ নিজ শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন"। যদিও এটি একজন লোকের নাম, তথাপি একজন বিশিষ্ট পূর্ব-পুরুষের স্মরণে তাঁর বংশের লোকদের অথবা তাঁর সম্প্রদায়কে এ নামে অভিহিত করা বা তাঁদের এ নামে বিশেষিত হওয়াটা মোটেও বিচিত্র নয়। কোরআনে ইসরাইলীদের প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বনী ইসরাইল বা ইসরাইলের বংশধর বলা হয়েছে।

সুতরাং, 'ইসরাইল' নামটি হযরত মুসার বহু আগে, আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, কয়েক শতবছর আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। সে কারণে ফেরাউন মারনেপতাহর শিলালিপিতে এই নাম থাকাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। তাছাড়া, ঐ শিলালিপিতে এই নাম থাকায় এটাও বোঝায় না যে, ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনাটা ঘটেছিল মারনেপতাহর রাজত্বের পঞ্চমবর্ষের আগেই।

শিলালিপির ওই শব্দটা বড়জোর এমন এক জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে পারে— যারা 'ইসরাইল' নামে পরিচিত ছিল। তদুপরি মারনেপতাহর শিলালিপির ওই নামের দ্বারা রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত ওই নামের কোনো জনপদ বোঝানোও সম্ভব নয় ...। ওই শব্দের দ্বারা এমন একটি জনগোষ্ঠীকেই বরং বোঝানো হয়ে থাকবে, যারা রাজনৈতিকভাবে ছিল অসংগঠিত।...

ফেরাউনের মৃত্যু : ধর্মীয়-গ্রন্থের আলোকে

ফেরাউনের মৃত্যু বাইবেল ও কোরআনের বর্ণনায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উভয় ধর্মগ্রন্থের বাণীতে এই মৃত্যুর ঘটনাটি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলের পেন্টাটেক বা তাওরাত অধ্যায়ে শুধু নয়, গীত-সংহিতা অধ্যায়েও এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে : ইতিপূর্বে সেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করাও হয়েছে।

বিস্ময়ের ব্যাপার, খ্রিস্টান লেখকবৃন্দ এই বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন। যেমন, ফাদার ডি ভক্স শুধু এই অভিমত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনাটি ঘটেছিল দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্বের প্রথমার্ধে অথবা মাঝামাঝি সময়। কিন্তু ইহুদীদের মিসরত্যাগের সময় ফেরাউন যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, ঘুণাক্ষরেও তিনি সে কথার উল্লেখ কোথাও করেননি। ফেরাউনের মৃত্যু যে তাঁর রাজত্বের অবসানেরও সূচক, তা মেনে নিলে এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার তেমন কোনো অবকাশ আর থাকে না। অথচ জেরুজালেম বাইবেল শিক্ষায়তনের এই বিজ্ঞ বিভাগীয় প্রধান একবারও ভেবে দেখার গরজ অনুভব করেননি যে, তাঁর থিওরি খোদ বাইবেলের তাওরাত ও গীত-সংহিতা অধ্যায়ের বর্ণনার বিরোধী হয়ে পড়েছে।

পি. মতেঁও তাঁর *'ইজিপ্ট অ্যান্ড দি বাইবেল'* পুস্তকে মারনেপতাহর রাজত্বকালে ইহুদীদের মিসর ত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল, শুধু একথার উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। ইহুদীদের পশ্চাদ্ধাবনকারী সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে ওই ফেরাউনও যে তখন ডুবে মরেছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি একটা কথাও বলেননি।

ইহুদীদের মনোভাব কিন্তু খ্রিস্টানদের এই বিস্ময়কর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। গীত-সংহিতার ১৩৬নং গীতের ১৫নং বাণীতে ফেরাউন ও তাঁর লোকলশকরদের নলখাগড়ার সাগরে ডুবিয়ে মারার জন্য বিধাতার প্রশংসা-গীত রয়েছে। ইহুদীরা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে সেই গীতটি মাঝেমধ্যে আবৃত্তি

করে থাকে। ইহুদীরা জানে, এই গীতটির সাথে যাত্রাপুস্তকের বাণীর মিল রয়েছে, (১৪, ২৮-২৯)। সেখানে বলা হয়েছে :

"জল ফিরিয়া অসিল ও তাহাদের রথ ও অশ্বারূঢ়দিগকে আচ্ছাদন করিল, তাহাতে ফেরাউনের যে সকল সৈন্য তাহাদের পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহাদের একজনও অবশিষ্ট রহিল না।"

সুতরাং, সেদিন ফেরাউনও যে ডুবে মারা গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে ইহুদীরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে না। খ্রিস্টানদের বাইবেলের যাত্রাপুস্তকেও কিন্তু এই বাণীটি বিদ্যমান।

এতসব প্রমাণ-দলিলের বিরোধিতা করে, খ্রিস্টান লেখকেরা ইচ্ছাকৃতভাবেই যেন ফেরাউনের মৃত্যুর ঘটনাটাকে এড়িয়ে গেছেন। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো ভাষ্যকার তাঁদের রচনায় কোরআনে বর্ণিত ফেরাউনের মৃত্যু-কাহিনীকে তুলনামূলকভঙ্গিতে এমন এক কারসাজির মাধ্যমে প্রকাশ করে গেছেন যে, তার ফলে সাধারণ পাঠকের মনে কোরআন সম্পর্কে আজগুবি ধারণা গড়ে না ওঠে পারে না। জেরুজালেম বাইবেল স্কুলের তত্ত্বাবধানে অনূদিত বাইবেলের (প্যারিস, ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ৭৩) যাত্রাপুস্তক অধ্যায়ে ফেরাউনের মৃত্যু সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফুটনোটে ফাদার কুরিয়ার মন্তব্য করেছেন ঃ

"কোরআন (ফেরাউনের মৃত্যুর কথা) উল্লেখ করেছে (সূরা ১০, আয়াত ৯০-৯২) এবং বহুলপ্রচলিত কাহিনী এই যে, ফেরাউন তাঁর লোকলশকরসহ সমুদ্রে ডুবে যান। (এ ঘটনার উল্লেখ কিন্তু বাইবেলে নেই) এবং সেখানে সমুদ্রের তলদেশে জীবিত থেকে সমুদ্রের মানুষ অর্থাৎ সীল মাছদের উপরে রাজত্ব করতে থাকেন।"

কোরআন সম্পর্কে যাঁরা কম জানেন, সে ধরনের কোনো পাঠকের পক্ষে এই বক্তব্য থেকে কোরআনের বাণী আর জনপ্রিয় লোককাহিনীর মধ্যে একটা যোগসূত্র না টেনে উপায় থাকে না। কেননা, ভাষ্যকার এখানে বাইবেলের বাণীর বিরোধিতায় তথাকথিত জনপ্রিয় লোককাহিনীটি কোরআনের বাণীর উল্লেখের পর পরেই এমনভাবে গেঁথে দিয়েছেন যে, কোরআনের বাণী আর লোককাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন সে ধরনের পাঠকের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক।

অথচ, ভাষ্যকার এখানে কায়দা-কসরতের মাধ্যমে পাঠকদের মনে যে ধারণা ঢুকিয়ে দেয়ার কারসাজি করেছেন, কোরআনের বক্তব্য সে ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোরআনের ১০ নং সূরার ৯০-৯২ নং আয়াতে বলা হয়েছে : ফেরাউন ও তাঁর লোকলশকর বনী ইসরাইলকে ধাওয়া করেছিল; বনী ইসরাইল

সমুদ্র পার হয়ে গেল আর ফেরাউন সুমদ্রে ডুবে যাওয়ার কালে চিৎকার করে বলে উঠেছিল ঃ "আমি ঈমান আনিলাম— কোনো মাবুদ নাই সেই আল্লাহ ছাড়া— যে আল্লাহ্‌র উপরে বনী ইসরাইল বিশ্বাসী।" আল্লাহ্ জওয়াব দিলেন : "কি? এখন! তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলে, নীতিভ্রষ্টতার কারণ হইয়াছিলে। এখন আমরা শুধু তোমার মৃতদেহকেই রক্ষা করিব; যাহাতে তুমি হইতে পার নিদর্শন— যাহারা তোমার পরে আসিবে, তাহাদের জন্য।"

ফেরাউনের মৃত্যু সম্পর্কে উক্ত সূরায় যা কিছু বলা হয়েছে এটাই তার সবটা। বাইবেলের ভাষ্যকার যে আজগুবি কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সে ধরনের কোনো বর্ণনা এখানে কিংবা কোরআনের অন্যত্র থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কোরআনের বর্ণনায় সুষ্ঠুভাবে বলা হয়েছে, ফেরাউনের মরদেহ বা লাশকে রক্ষা করা হবে। বলা অনাবশ্যক যে, এই তথ্যটিই এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মোহাম্মদ (দঃ) কোরআনের বাণী জনসমক্ষে প্রচার করে গেছেন চৌদ্দশ' বছর আগে। এখন আমরা যেসব ফেরাউনকে ইহুদীদের মিসরত্যাগের সাথে জড়িত বলে মনে করছি (ভুল-শুদ্ধ যাই হোক), তখন তাদের মৃতুদেহগুলো ছিল থেবেসের নেক্রোপলিস কবরখানায়— লোকচক্ষুর অন্তরালে। স্থানটি মিসরের লাকসর এলাকা থেকে নীলনদের সরাসরি ওপারে। তখন ওইসব মৃতদেহ সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও কেউ কিছু জানত না। ওইসব মৃতদেহ তথা 'মমি' আবিস্কৃত হয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এসে। কোরআনে যেভাবে বর্ণিত আছে, বস্তুত ঠিক সেভাবেই ফেরাউনের মৃতদেহটি উদ্ধার পেয়েছিল : থেবেসের কবরখানায় সংরক্ষিত মৃতদেহের কোনো-না-কোনো একটি সেই আসল ফেরাউনের— যে ফেরাউন মারা পড়েছিলেন নীলনদে ডুবে গিয়ে।

অধুনা, যে-কেউ কায়রো গিয়ে সেখানকার মিসরীয় যাদুঘরে রাজকীয় মমির কামরায় সংরক্ষিত ফেরাউনের সেই মৃতদেহ বা মমিটি স্বচক্ষে দর্শন করে আসতে পারেন। সুতরাং, ফাদার কুরিয়ার কোরআনের বাণীর সাথে কারসাজিমূলকভাবে আজগুবি যে উপকথা দিয়েছেন, আসল সত্য তা থেকে সম্পূর্ণ দূরে।

এ পর্যন্ত যেসব প্রমাণপঞ্জি তুলে ধরা হল, তা থেকে একটা বিষয় সাব্যস্ত হয়ে যায়, মিসররাজ দ্বিতীয় রামেসিসের সন্তান মারনেপতাহ্‌-ই ছিলেন সেই ফেরাউন, যিনি হযরত মুসার নেতৃত্বে ইহুদীদের মিসরত্যাগের ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন এবং মারা পড়েছিলেন সমুদ্রে ডুবে। এই ফেরাউন মারনেপতাহর মমিকৃত দেহটি আবিষ্কার করেন মিঃ লরেট ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে থেবেসের রাজকীয় উপত্যকা থেকে। সেখান থেকে মমিটিকে কায়রো নিয়ে আসা হয়। ১৯০৭ সালের ৮ই জুলাই এলিয়ট স্মীথ এই মমিটির আবরণ উন্মোচন করেন : তিনি তাঁর *'রয়্যাল মামিজ'* পুস্তকে (১৯১২) এই আবরণ উন্মোচন এবং মমিটির দেহ-পরীক্ষার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই বিবরণ থেকে জানা যায়, কয়েকটি জায়গায় কিছু কিছু বিকৃতি ঘটলেও মোটের উপর লাশটি সন্তোষ-জনকভাবে সংরক্ষিত ছিল। সেই থেকে কায়রোর যাদুঘরে পর্যটকদের দর্শনের জন্য মমিটিকে রেখে দেয়া হয়েছে। মমিটির মাথা ও ঘাড়টি খোলা, বাদবাকি দেহটা কাপড়ে ঢাকা। প্রদর্শনের এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও মমিটিকে এমন কঠোরভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে যে, কাউকে ওই মমিটির ফটো পর্যন্ত তুলতে দেয়া হয় না। সেই ১৯১২ সালে স্মীথের তোলা ফটোগুলো ছাড়া আর কোনো ফটো যাদুঘর কর্তৃপক্ষের নিকটও যায়নি।

১৯৭৫ সালের জুন মাসে মিসরীয় কর্তৃপক্ষ মেহেরবানী করে ডা. মরিস বুকাইলিকে মমিটির শরীরের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে দেখার অনুমতি দেন। এতদিন যাবত মমিটির দেহের এসব অংশ কাপড়েই ঢাকা পড়ে ছিল। কর্তৃপক্ষ আমাকে মমিটির শরীরের বিভিন্ন অংশের ফটো তোলারও অনুমতি দিয়েছিলেন। ষাট বছরের উপর হয়ে গেছে, মমিটি প্রথম আবিস্কৃত হয়। তখনকার অবস্থার সাথে মমিটির বর্তমান অবস্থার তুলনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, মমিটির অবস্থার অনেক অবনতি ঘটেছে, এবং দেহের বিভিন্ন অংশের বেশকিছু টুকরা খসে পড়েছে বা হারিয়ে গেছে। মমিকৃত লাশটির টিসুগুলোর অবস্থাও নাজুক। এরকমটি হয়েছে কতকটা মানুষের হাতের নাড়াচাড়ায়, আর বাদবাকিটা হয়েছে কালের নির্মম স্বাক্ষরে।

প্রাকৃতিক কারণেই যে মমিটির এই দুরবস্থা তা সহজেই অনুমান করা যায়। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এই মমিটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে এর সংরক্ষণ-ব্যবস্থারও ঘটেছে পরিবর্তন। আগেই বলেছি, মমিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল থেবেসের নেক্রোপলিস কবরখানায়। সেখানে মমিটি শায়িত ছিল তিন হাজার বছরেরও অধিককাল ধরে। অধুনা, মমিটিকে এখন সাধারণ একটি কাঁচের বাক্সে রাখা হয়েছে— যা বাইরের বাতাসের অনুপ্রবেশ ও আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া ঠেকাবার মোটেও উপযোগী নয়। তাছাড়া, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণুকণার আক্রমণ প্রতিহত করাও এই কাঁচের বাক্সের পক্ষে অসম্ভব। এদিকে, তাপমাত্রা ওঠানামা,— আর্দ্র আবহাওয়ার ঋতু পরিবর্তনের ধকল। তিন হাজার বছর আগেকার মমিকৃত কোনো লাশের পক্ষে পরিস্থিতির এই ধকল সামলানো মুশকিল : মমির অবস্থার অবনতিই বরং স্বাভাবিক। এতকাল যাবত মমিটি যে আচ্ছাদনে জড়ানো ছিল— সে আচ্ছাদনও এতদিনে তার সংরক্ষণ-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া, এরআগে মমিটি কবরের বদ্ধ কুঠুরিতে এমন অবস্থায় ছিল যেখানে তাপমাত্রা ছিল বরাবর প্রায় একরকম; তথাকার বায়ুর আর্দ্রতা কায়রোর সময়বিশেষের আর্দ্রতার চেয়ে কম। অবশ্য, একথাও সত্য যে, নেক্রোপলিসে থাকাকালে মমিটিকে প্রায়ই কবর-ডাকাতদের হামলা সহ্য করতে হত (প্রথমদিকে সম্ভবত তাই হয়ে থাকবে)। এছাড়াও, ছিল ইঁদুরসহ বিভিন্ন পোকামাকড়ের উপদ্রব। এসব কারণেই মমিটির অনেক ক্ষতি ইতিমধ্যেই সাধিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, তবুও (মনে হয়) বর্তমানে মমিটি যে পরিস্থিতিতে পড়ে রয়েছে, তারচেয়ে— অতীতের পরিস্থিতিই যেন সংরক্ষণের ব্যাপারে বেশি অনুকূল ছিল।

যাহোক, আমার পরামর্শক্রমে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে মমিটিকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি বিশেষ টীম গঠন করা হয়। ডক্টর এল. মেলিগাই ও ডক্টর র‍্যামসিয়ীস-এর দ্বারা মমিটির উপর চমৎকারভাবে রেডিওগ্রাফিক স্টাডি পরিচালিত হয়। ডক্টর মুস্তফা মানিয়ালভী মমিটির বুকের একটি ফাঁকা জায়গা দিয়ে বুকের ভেতরটাও ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেন। এছাড়াও, মমিটির পেটেও ব্যাপকভাবে পরীক্ষা চালানো হয়। কোনো মমির উদরের অভ্যন্তরে এ ধরনের পরীক্ষা ও তদন্ত পরিচালনা এটাই প্রথম।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ড. মরিস বুকাইলি মমিটির অভ্যন্তরভাগের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিস্তারিতভাবে জানার এবং সেসবের ফটো তোলার সুযোগ পান। অধ্যাপক সেসালডির দ্বারা মমিটির উপরে পরিচালিত হয়েছিল মেডিকো-

লিগ্যাল স্টাডি। মমিটির দেহ থেকে খসে পড়া একটি টুকরো অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই চূড়ান্ত পরীক্ষা ও গবেষণা পরিচালিত হয়।

এইসব পরীক্ষা ও তদন্তের ফলে উপস্থিত যা জানা গেছে, তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেখা গেছে, মমিটির হাড়ে একাধিক ক্ষত বিদ্যমান। সেগুলোতে ফাঁকও রয়েছে বড় বড়। তাদের কোনো-কোনোটা সম্ভবত ক্ষয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তবে যাই হোক, সেগুলো ফেরাউনের মৃত্যুর আগে হয়েছে না পরে হয়েছে এখন তা নির্ণয় অসম্ভব। মমিটি পরীক্ষা করে আরো যা পাওয়া গেছে তাতে বলা যেতে পারে যে, এই ফেরাউনের মৃত্যু ঘটেছে— ধর্মগ্রন্থে যেমনটি বলা হয়েছে— পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে কিংবা পানিতে ডুবে যাওয়ার প্রাক্কালে নিদারুণ কোনো 'শকের' দরুন। আবার এইসঙ্গে সংঘটিত এই দু'টি কারণেও তাঁর মৃত্যু ঘটা বিচিত্র নয়।

উপরে মমিটির দেহে ও অস্থিতে ক্ষতের যে কথা বলা হয়েছে এবং সেই সাথে গোটা মমির অবস্থার অবনতির যে চিত্র তুলে ধরা হল, তাতে ফেরাউনের এই মমিকৃত লাশটি সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য অতিসত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। কেননা, যতই দিন যাবে, সমস্যাটা প্রকট হতে প্রকটতর হবে। এখনো মমিটির যে অবস্থা অবশিষ্ট রয়েছে এবং এখনো যা-কিছু কালের প্রবাহে লুপ্ত হয়নি তা যথাযথভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সত্যিই অপরিসীম। কেননা, একমাত্র এই উপায়ে ইহুদীদের মিসরত্যাগের সাথে সংশ্লিষ্ট এই ফেরাউনের মৃত্যু সত্যি কিভাবে ঘটেছিল, এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তার মরদেহই বা কিভাবে উদ্ধার পেয়েছিল, তার বাস্তব প্রমাণপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব।

ইতিহাসের নিদর্শনাবলীর সংরক্ষণ সবারই কাম্য। কিন্তু এখানে যে মমিটির সংরক্ষণের কথা বলা হচ্ছে, তা শুধু নিছক কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন নয়; এ মমিটির গুরুত্ব তারচেয়েও অনেক বেশি। এটি এমন একজন মানুষের মরদেহ, হযরত মুসার সাথে যার পরিচয় হয়েছিল, যে মানুষটি হযরত মুসার ধর্মীয়-প্রচার প্রতিহত করতে চেয়েছিল, এবং হযরত মুসা যখন ইহুদীদের নিয়ে মিসর থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন এই লোকটিই তাদের পিছনে ধাওয়া করেছিল;— আর ধাওয়া করতে গিয়েই মারা পড়েছিল সমুদ্রের পানিতে ডুবে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই তার মরদেহ ধ্বংস হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে এবং কোরআনের বাণী অনুসারেই ভবিষ্যৎ মানবজাতির জন্য তা নিদর্শন হিসেবে রয়ে গেছে সংরক্ষিত।

এ যুগের অনেকেই আধুনিক তথ্য-প্রমাণের আলোকে ধর্মীয়-গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে চান। তাঁদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন

মেহেরবানী করে কায়রো যান এবং তথাকার মিসরীয় যাদুঘরে 'রয়্যাল মামিজ' উল্লেখ্য, (রামেসিসের মমিটির উপরও ফেরাউন মারনেপতাহ্‌র মমির মতই পরীক্ষা ও তদন্তকার্য পরিচালিত হয়েছে)। এই মমিটির জন্যও অনুরূপ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন।

১৯৭৫ সালে কায়রোতে ফেরাউনের মমির উপরে যে মেডিক্যাল তদন্ত পরিচালিত হয়, তার লিখিত ফলাফল ১৯৭৬ সালের প্রথমদিকে ডঃ মরিস বুকাইলি (ফরাসী উচ্চারণ, মরিস বুকাই) নিজেই তা একাধিক সুধি-সমাবেশে পেশ করেন। উল্লিখিত সুধি-সমাবেশের মধ্যে যেমন একাধিক বিদগ্ধ সমিতির নানা অধিবেশনের কথা বলতে হয়, তেমনি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় ফ্রান্স ন্যাশনাল একাডেমীর অধিবেশনের কথাও। যাহোক, তদন্তের ফলাফলের ভিত্তিতে মিসরীয় কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় রামেসিস-এর মমিটি 'চিকিৎসার' জন্য ফ্রান্সে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে মোতাবেক, ১৯৭৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মমিটি প্যারিসে পৌঁছে। যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা সংরক্ষিত ফেরাউনের এই মমিটি দর্শন করে আসবেন। আর তা হলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, কোরআনের আয়াতে ফেরাউনের মরদেহ সংরক্ষণ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে, তার বাস্তব উদাহরণ কত জাজ্জ্বল্যমান।

হাদীস ও বিজ্ঞান-সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়ে আমরা 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' পুস্তকের মূল লেখক ডঃ মরিস বুকাইলির সাথে সবক্ষেত্রে একমত নই। সহীহ্ হাদীসগ্রন্থগুলোতেও সঠিক ও বিশ্বস্ত হাদীসের পাশাপাশি কিভাবে হযরতের (দঃ) নামে বেশকিছু প্রক্ষিপ্ত— মওজু—দুর্বল—জাল ও মিথ্যা হাদীস স্থানলাভ করেছে, মুসলিম হাদীসবেত্তা— ধর্মতত্ত্ববিদ ও চিন্তাশীল লেখকবৃন্দ সে সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা-পর্যালোচনা করে গেছেন। বলা আবশ্যক যে, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান গ্রন্থে লেখক মরিস বুকাইলি বিজ্ঞান-সংক্রান্ত যেসব হাদীস আলোচনার জন্য গ্রহণ করেছেন, তার অধিকাংশ, কিংবা সবগুলোই ওইরকম জাল, দুর্বল কিংবা মিথ্যা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তবুও মরিস বুকইলির মত পাশ্চাত্য জগতের একজন চিন্তাশীল গবেষক-বিজ্ঞানী তাঁর সাড়া জাগানো এই গ্রন্থটিতে 'হাদীস ও বিজ্ঞান' সম্পর্কে যে আলোচনার অবতারণা করেছেন, চিন্তাশীল গবেষক-বিজ্ঞানীদের এ বিষয়ের প্রতি আশু দৃষ্টি আকর্ষণের স্বার্থে আমরা এই অধ্যায়ের অবতারণা করছি। স্মর্তব্য যে, মরিস বুকাইলি নিজেও তাঁর আলোচনার জন্য গৃহীত এসব হাদীস আদৌ হযরতের (দঃ) বক্তব্য কিনা, অর্থা, 'সন্দেহজনক' বলে উল্লেখ করেছেন। এ ধরনের 'সন্দেহজনক' তথা দুর্বল, জাল ও মিথ্যা হাদীস কিভাবে হাদীসগ্রন্থসমূহে স্থান লাভ করেছে সে বিষয়ে যাঁরা বিস্তারিতভাবে জানতে চান, তাঁরা যেন মেহেরবানী করে মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ রচিত সুবিখ্যাত 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থটির ৪র্থ থেকে ১০ম অধ্যায়ে মনোযোগের সাথে পাঠ করেন।

কোরআন ইসলামের ধর্মীয় নীতি ও বিধি-বিধানের একমাত্র উৎস নয় : মোহাম্মদের (দঃ) জীবদ্দশায় যেমন– তেমন তাঁর মৃত্যুর পরেও ইসলামী আইন তথা শরা-শরীয়তের পরিপূরক বিধি-বিধান তাঁর বক্তব্য ও কাজের মধ্যথেকে খুঁজে নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

যদিও প্রথম থেকেই হাদীস লিপিবদ্ধ আকারে ধরে রাখার ব্যবস্থা ছিল, তথাপি বেশিরভাগ হাদীস এসেছে মৌখিক বর্ণনা থেকে। যাঁরা এসব হাদীস সংকলন আকারে প্রকাশ করে গেছেন, তাঁরা বিশেষ কষ্ট স্বীকার করে ভালভাবে

খোঁজখবর নিয়েই অতীতের সেসব ঘটনা বা বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ ধরনের হাদীস-সংগ্রহে যাঁরা লিপ্ত ছিলেন, তাঁরা জানতেন, নিখুঁতভাবে সঠিক হাদীস সংগ্রহের গুরুত্ব কতখানি। এ কারণে দেখা যায়, সংগৃহীত প্রতিটি হাদীস, এমনকি সে হাদীস যতই নাজুক হোক-না-কেন, কার নিকট থেকে কার মাধ্যমে তা সংগৃহীত হয়েছে, এবং একদম প্রথম পর্যায়ে কে বা কারা সে হাদীস মোহাম্মদের (দঃ) পরিবারের কোন্ সদস্য কিংবা তাঁর কোন্ সাহাবার নিকট থেকে শুনেছিলেন, সংশ্লিষ্ট সেই হাদীসে সেসব তথ্যের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে।

এভাবেই মোহাম্মদের (দঃ) বহুসংখ্যক বক্তব্য ও কর্মের বিবরণী লিপিবদ্ধ হয়ে পরিচিতি লাভ করেছে 'হাদীস' নামে। 'হাদীস' শব্দের অর্থ হল বক্তব্য বা উচ্চারণ। তবে প্রচলিত অর্থে মোহাম্মদের (দঃ) কর্মবিবরণীকেও 'হাদীস' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

সংকলন-গ্রন্থের আকারে কিছু কিছু হাদীস প্রকাশ পায়, মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর কয়েক দশক পরে। এভাবে তাঁর মৃত্যুর প্রায় দু'শ বছরের মধ্যে হাদীসের কয়েকখানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকলন প্রকাশিত হয়। এরমধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ বা সহীহ্ হাদীসগ্রন্থ হিসেবে আল-বুখারী ও মুসলিম সমধিক প্রসিদ্ধ। মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর দু'শ বছর পরে প্রকাশিত এই দু'টি সংকলনে যেসব হাদীস স্থান লাভ করেছে, তা সর্বত্র বিশ্বস্ত বা সঠিক হাদীস হিসেবে সমাদৃত।

সম্প্রতি মদীনার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর মোহাম্মদ মুহসিন খান কর্তৃক সহীহ্ বুখারীর একখানি আরবি/ইংরেজি— দ্বিভাষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (১ম সংস্করণ, ১৯৭১)। সঠিকত্ব ও বিশ্বস্ততার দিকথেকে হাদীস আল-বুখারীর স্থান কোরআনের পরেই। 'ইসলামিক ট্র্যাডিশন্স' নামে ফরাসী ভাষায় আল-বুখারীর অনুবাদ প্রকাশ করেছেন হুডাস ও মারকাইস (১৯০৩-১৯১৪)। সুতরাং, যাঁরা আরবি ভাষা না জানেন, তাঁরাও এখন এসব অনুবাদের মাধ্যমে হাদীস পড়ে দেখতে পারেন। তবে, হাদীসের বিভিন্ন অনুবাদের ব্যাপারে পাঠকদের অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা, ফরাসী ভাষাসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় হাদীসের অনুবাদগুলোতে বড় বেশি ভুল ও অসত্য বক্তব্য ভরে দেয়া হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে, এগুলো প্রকৃতপক্ষে অনুবাদ নয়; বরং ব্যাখ্যা। শুধু তাই নয়, কোনো কোনো অনুবাদে দেখা গেছে, হাদীসের মূল বক্তব্যের রদবদল তো করা হয়েছেই, সেইসাথে হাদীসে যা নাই তাই জুড়ে দেয়া হয়েছে হাদীসের নামে।

মূল বা উৎসের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, মুসলমানদের হাদীস আর খ্রিস্টানদের বাইবেলের সুসমাচারসমূহ (ইঞ্জিলের ১ম চারখণ্ড) অনেকটা একই ধরনের ধর্মীয়-গ্রন্থ। বাইবেলের (ইঞ্জিলের) যেমন, হাদীসেরও তেমনি,

কোনো লেখক বা সংকলনকারী বর্ণিত কোনো ঘটনা বা বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়ে যাওয়ার অনেক পরে সেগুলো সংকলনে স্থান লাভ করেছে। বাইবেলের সুসমাচারগুলোর ব্যাপারে যেমন, হাদীসের ব্যাপারেও তেমনি সেসবের মধ্যে বর্ণিত সবকিছুই বিশ্বস্ত প্রামাণ্য বা একদম সহীহ্ বলে সর্বসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হয়নি। হাদীস বা সুন্নাহ্র ব্যাপারে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তেমন ধারার অভিজ্ঞ আলেম-মুহাদ্দিসের নিকট স্বল্পসংখ্যক হাদীসই সর্বজনস্বীকৃত বিশ্বস্ত হাদীস হিসেবে অনুমোদন লাভ করতে পেরেছে। এ কারণেই আল-মুয়াত্তা, সহীহ্ মুসলিম ও সহীহ্ আল-বুখারী বাদে অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে দেখা যায়, সহীহ্ বা সঠিক বলে পরিচিত হাদীসের পাশাপাশি এমনসব হাদীসও স্থান লাভ করেছে— যেসব হাদীস হল জাল, নতুবা বাতিল বলে পরিগণিত।

বাইবেলের যে কানুনিক গসপেল বা প্রামাণ্য চার সুসমাচার (ইঞ্জিলের ১-৪ খণ্ড) রয়েছে, বর্তমান সময়ে এসে সেসবের সঠিকত্ব নিয়েও কোনো কোনো বিজ্ঞ-বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু খ্রিস্টধর্মের সর্বোচ্চ পর্যায়ের পুরোহিত-ধর্মগুরুরা সেসব প্রশ্নের জবাব দিতে এগিয়ে আসছেন না। বরং, তাঁরা এসব বিষয়ে একদম নীরব। পক্ষান্তরে, যেসব হাদীস একদম সঠিক ও সহীহ্ বলে পরিচিত, সেগুলোর উপরেও মুসলিম সমাজে গোড়া থেকেই নানা পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ চালানো হয়েছে (এবং এখনো হচ্ছে)। ইসলামের ইতিহাসের সূচনাতেও দেখা যায়, ধর্মীয় বিষয়ে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁরাও এসব হাদীসের সঠিকত্ব নির্ণয়ে কম বিচার-বিশ্লেষণ চালাননি। তবে মূল ধর্মীয় গ্রন্থ (কোরআন) আগাগোড়াই 'পবিত্র কিতাব' হিসেবে ধর্মীয় শিক্ষা ও বিধি-বিধানের প্রধান উৎসরূপে বিরাজ করছে : কোরআনের সঠিকত্ব সম্পর্কে কোনোরকম প্রশ্ন কিংবা বাদানুবাদ এখনো দেখা দেয়নি।

হাদীস নিয়েও কৌতূহলের অন্ত নেই। হাদীসের বাণীকে তাই ড. মরিস বুকাইলি এই গবেষণার বিষয়বস্তু করে নিয়েছেন। একটিমাত্র কারণে : বিভিন্ন বিষয়ে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কিভাবে নিজের চিন্তাভাবনা ও বক্তব্য প্রকাশ করতেন, সে বিষয়টা সম্পর্কে ড. মরিস বুকাইলি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। সেইসাথে তিনি আরো একটি বিষয় পরীক্ষা করে নিতে চেয়েছেন, ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত ধর্মগ্রন্থ কোরআন ছাড়া মোহাম্মদের (দঃ)-এর নামে প্রচারিত তাঁর নিজস্ব অপরাপর বাণী ও বক্তব্য আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক তথ্যজ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণে কতটা টেকসই।

যদিও সহীহ্ মুসলিম ও সঠিক ও প্রামাণ্য হাদীসগ্রন্থ হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত, তবুও তিনি তাঁর এই গবেষণা-পর্যালোচনায় সর্বাধিক প্রামাণ্য ও সঠিক বলে বিবেচিত আল-বুখারীকেই বেছে নিয়েছেন। এই পর্যালোচনায় তিনি একটি কথা

সর্বক্ষণ মনে রেখেছেন যে, বিভিন্ন লোকের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এইসব হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়েছে মানুষের হাতেই। এসবের কোনো কোনোটা লিখিতাকারে থাকলেও বেশিরভাগই চালু ছিল মুখে মুখে। এসব হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনা কমবেশি সঠিক। তাছাড়া, যেসব হাদীস সঠিক নয়, সেসবের ভ্রান্তির জন্য দায়ী তারাই যাদের মাধ্যমে এসব হাদীস চালু ছিল। পক্ষান্তরে, এমন ধরনের হাদীসও রয়েছে, যেসব হাদীসের রাবি বা বর্ণনাকারীর সংখ্যা অনেক, এবং সেসব হাদীসের সত্যতা ও প্রামাণিকতাও প্রশ্নাতীত (মুসলিম মুহাদ্দিসবৃন্দ ভ্রান্তিপূর্ণ কিংবা দুর্বল হাদীসকে 'জান্নি'; এবং সম্পূর্ণ সঠিক ও প্রামাণ্য হাদীসকে 'কাতী' নামে অভিহিত করে গেছেন)।

এতুদপ্রসঙ্গে আমরা এবার ড. মরিস বুকাইলির বর্ণনা পাঠান্তে বিষয়টি পাঠকদের উদ্দেশে তুলে ধরছি ঃ '.... আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বিভিন্ন হাদীসের উপরেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি। ইতিপূর্বে কোরআনের বিভিন্ন আয়াত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত যেভাবে ব্যবহার করেছি, এক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে ফলাফল তা মুখে না বলে উদাহরণসমেত তুলে ধরে দেখা যাচ্ছে : আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে কোরআনে পরিবেশিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলী যেখানে সত্য ও প্রামাণ্য বলে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে, সেখানে হাদীসে বর্ণিত একই বিষয়ের তথ্যাবলী একই ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সত্য কিংবা প্রামাণ্য হিসেবে প্রায় দাঁড়াতেই পারছে না। বলা আবশ্যক যে, এই মন্তব্য করতে গিয়ে আমি হাদীসের শুধু বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিষয়গুলোকেই বেছে নিয়েছি।

এমনও দেখা গেছে, কোরআনের কোনো কোনো বাণীর ব্যাখ্যা হিসেবে হাদীসের কোনো কোনো বাণীকে গ্রহণ করা হয়েছে এবং হাদীসের সেই ব্যাখ্যা টেনে তফসীরকারগণ কোরআনের বিভিন্ন বাণীর যেসব ভাষ্য রচনা করে গেছেন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সেসবও গ্রহণযোগ্য হতে পারছে না। ইতিপূর্বে আমরা কোরআনের একটি আয়াত (সূরা ৩৬, আয়াত ৩৮) নজরে এনে দেখেছি, সূর্য-সংক্রান্ত এই আয়াতটি আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। আয়াতটি এই ঃ "সূর্য ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার একটি নির্ধারিত স্থানের অভিমুখে।" নিচে এই আয়াতের ব্যাখ্যা-সম্বলিত একটি হাদীস তুলে ধরা হল :

> "ডুবিয়া যাওয়ার কালে সূর্য ... আরশের নিচে নিজেকে সিজদায় নত করিয়া দেয় এবং পুনরায় উদিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে, এবং অনুমতি দেওয়া হয়। এবং তারপর (এমন এক সময় আসিবে) যখন ইহা প্রায় সিজদায় নত হবে ... এবং নিজস্ব পথে যাত্রা করার অনুমতি

প্রার্থনা করিবে; তখন নির্দেশ দেয়া হবে, সেই পথেই ফিরিয়া যাইতে, যে পথে সে আসিয়াছে। এবং এইরূপে উহা উদিত হইবে পশ্চিম দিক হইতে।" ... (সহীহ্ আল-বুখারী)

এই হাদীসের মূল আরবিটি (সৃষ্টির সূচনাপর্ব, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৩, ৫৪তম অংশ, ৪র্থ অধ্যায়, ৪২১ নং হাদীস) খুবই দুর্বোধ্য এবং তার অনুবাদ আরো দুঃসাধ্য। এই হাদীসটি একটি রূপকভাবের প্রকাশ। তথাপি, এটি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় *সূর্যই ঘুরছে এবং পৃথিবী স্থির হয়ে রয়েছে;* অথচ, আধুনিক বিজ্ঞানের অভিমত এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সবচেয়ে বড় কথা, হাদীসটি আদৌ সহীহ্, কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে (অর্থাৎ এটি জান্নি হাদীসের অন্তর্ভুক্ত)।

বুখারী থেকে গৃহীত আরেকটি হাদীসে (ঐ, অধ্যায় ৬, ৪৩০ নং হাদীস) গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্রমবিকাশের ব্যাপারে এক অদ্ভুত হিসেব তুলে ধরা হয়েছে : "মানব-প্রজননের জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন সেগুলো একত্রিত হয় ৪০ দিনে; দ্বিতীয় ৪০ দিন লাগে ভ্রূণটি যখন 'আলাক' বা 'আটকানো অবস্থায়' পৌঁছে; তৃতীয় ৪০ দিনে ভ্রূণটি উপনীত হয় 'চিবানো গোশ্‌তের টুকরার মত অবস্থায়'। তখন একজন ফিরিশ্‌তা আসেন, শিশুটির তকদিরে কি আছে তা নির্দোষ করে দেয়ার জন্য এবং ভ্রূণটির মধ্যে আত্মাকে ফুঁকে দেওয়া হয়।" বলা অনাবশ্যক যে, এখানে ভ্রূণ সম্পর্কে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে, তা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে কোনক্রমেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

কোরআনে যেখানে রোগব্যাধির উপশম-সংক্রান্ত বিষয়ে একটি মন্তব্য (সূরা ১৬, আয়াত ৬৯) বাদে আর কোনো বক্তব্য নেই, সেখানে হাদীসগ্রন্থের বিস্তৃত স্থান জুড়ে এ বিষয়ে নানা বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, কোরআনের উপর্যুক্ত আয়াতে মধু ব্যবহারের দ্বারা শুধু রোগব্যাধি নিরাময়ের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া সেখানে নির্দিষ্ট করে কোনো রোগের নামও উল্লেখ করা হয়নি। পক্ষান্তরে, 'আল-বুখারী'র একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ই (৭৬নং) ব্যবহৃত হয়েছে ঔষধ-সংক্রান্ত নানা হাদীস বর্ণনায়। হুডাস ও মারকাইস অনূদিত ফরাসী ভাষার আল-বুখারীর ৪র্থ খণ্ডের ৬২ থেকে ৯১ পৃষ্ঠা এবং ডঃ মোহাম্মদ মুহসিন খানের দ্বিভাষিক আরবী/ইংরেজি বুখারীর ৭৮ম খণ্ডের ৩৯৫ পৃষ্ঠা থেকে ৪৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সন্দেহ নাই যে, এইসব পৃষ্ঠায় যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে—তারমধ্যে অনেকগুলোই বানোয়াট (জান্নি); কিন্তু সার্বিক বিচারে এইসব হাদীস আবার গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক এই কারণে যে, খুব সম্ভব এই-সব হাদীসে সে সময়ের বিভিন্ন রোগব্যাধির প্রচলিত ঔষধপত্র ও নিরাময়-পদ্ধতি সম্পর্কেই অভিমত ও বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে থাকবে। আল-বুখারীর অপরাপর

অধ্যায়ে ঔষধপত্র-সংক্রান্ত আরো যেসব হাদীস বিদ্যমান, এই প্রসঙ্গে সেগুলোর কথাও স্মরণ করা যেতে পারে।

এসব হাদীসের কোনো কোনোটিতে দেখা যায়, বদনজর, যাদুটোনা এবং মন্ত্রের দ্বারা ভূত ছাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। অবশ্য, এসব কাজে কোরআনের আয়াত ব্যবহার করা হলে, সে জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণের উপরে রয়েছে স্পষ্ট বিধি-নিষেধ। একটি হাদীসে দেখা যায়, বিশেষ একধরনের খেজুর যাদুমন্ত্রের ক্ষমতাকে বানচাল করে দিতে পারে। অন্যদিকে এও বলা হয়েছে যে, বিষাক্ত সর্পদংশন থেকে মানুষকে বাঁচাতে মন্ত্রশক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ ধরনের বক্তব্যে অবশ্য অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই। মনে রাখা দরকার, সেকালে ঔষধপত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার চালু হয়নি। বিভিন্ন রোগব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য মানুষকে প্রধানত সাধারণ ব্যবস্থাপত্র— প্রাকৃতিক পদ্ধতি প্রভৃতির উপরে নির্ভর করতে হত। এসব পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শিংগা লাগানো, লোহা পুড়ে দাগ দেয়া, উঁকুন তাড়ানোর জন্য মাথা মুড়ানো, উটের দুধ ব্যবহার প্রভৃতি। তাছাড়াও, কালিজিরার মত নানাধরনের বীজও রোগব্যাধি নিরাময়ে ব্যবহৃত হত এবং একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত নানাধরনের লতা-গুল্ম- যেমন ইন্ডিয়ান কাস্ট। ক্ষতের রক্তপাত বন্ধের জন্য খেজুর পাতার চাটাই পুড়ে তার ছাই লাগানোর জন্যেও নির্দেশ দেয়া হত। এককথায়, আপদকালীন জরুরি প্রয়োজনে যা-কিছু হাতের কাছে পাওয়া যেত, তার সদ্ব্যবহারে কোনোরকম ত্রুটি রাখা হত না। অবশ্য, ক্ষেত্রবিশেষে এমনকিছু ব্যবহারের নির্দেশও দেয়া হত, যা রুচিকর বলে গণ্য হতে পারে না। যেমন উষ্ট্রমূত্র।

এ ছাড়াও, যে যুগে বিভিন্ন রোগের উৎস ও কারণ হিসেবে এমনসব ব্যাখ্যা দেয়া হত যা আজকের যুগে মেনে নেয়া মুশকিল। যেমন : জ্বরের মূল কারণ : 'দোজখের আগুন থেকে জ্বরের উৎপত্তি'। এ সম্পর্কে এ ধরনের মোট ৪টি বক্তব্য রয়েছে বুখারীতে (দেখুন, আল-বুখারী, ঔষধশাস্ত্র, ৭ম খণ্ড, অধ্যায় ২৮, পৃষ্ঠা ৪১৬)। প্রতিটি পীড়ার ঔষধ রয়েছে : "আল্লাহ্ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি সাথে সাথে যার ঔষধ তিনি সৃষ্টি করেননি।" (ঐ, অধ্যায় ১, পৃষ্ঠা ৩৯৫) এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় মাছি-সংক্রান্ত একটি হাদীসে বলা হয়েছে : "তোমাদের কোনো পাত্রে যদি মাছি পড়ে, তাহা হইলে উহাকে (ওই পাত্রের ভেতর) পুরাটা ডুবাইয়া লও, তারপর মাছিটাকে ফেলিয়া দাও। কেননা, মাছির একটি পাখায় যেমন রোগ থাকে, তেমনি অন্যপাখায় থাকে উহার ঔষধ (প্রতিষেধক) অর্থাৎ চিকিৎসা ব্যবস্থা।" (ঐ অধ্যায় ১৫-১৬, পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৫৩, আরো দেখুন, সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়, ৫৪তম অংশ, অধ্যায় ১৫ ও ১৬)।

সর্পদংশনে গর্ভপাত ঘটে যেতে পারে (এমনকি অন্ধও হতে পারে) এ ধরনের বক্তব্য রয়েছে বুখারীর সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ডে (অধ্যায় ১৩ ও ১৪, পৃষ্ঠা ৩৩০ ও ৩৩৪)।

মহিলাদের ঋতুস্রাবকালীন ভিন্নধরনের রক্তপাত : 'আল-বুখারীর' 'হায়েজ' অধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ড, ষষ্ঠ অংশ, ৪৯০ ও ৪৯৫ পৃষ্ঠায় দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে (অধ্যায় ২১ ও ২৮) রক্তপাত সম্পর্কে দু'টি হাদীস রয়েছে। এতে দু'জন মহিলার বিবরণ রয়েছে। একজনের ক্ষেত্রে এই রোগের লক্ষণ (বর্ণনা বিশদ নয়) দেখা দিয়েছিল। তার সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার ওই রক্ত এসেছে রক্তবহা নাড়ী থেকে। অন্য মহিলার রোগ-লক্ষণ ছিল, সাতবছর যাবত তার দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে রক্তপাত হত। সেখানেও কারণ হিসেবে একই রক্তবহা নারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা যেতে পারে, এই রক্তপাতের কারণ সম্পর্কে সেকালে এই ধারণাই পোষণ করা হত। যাহোক, রোগ-লক্ষণ নির্ণয়ে এই ধরনের বক্তব্যের পেছনে যুক্তি কি সে সম্পর্কে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। সবচেয়ে বড় কথা, এই ধরনের বক্তব্য আদৌ সঠিক নয়।

রোগব্যাধি সংক্রামক নয় : আল-বুখারীতে এ বিষয়ে বেশ কয়েকটি স্থানে আলোচনা করা হয়েছে (অধ্যায় ১৯, ২৫, ৩০, ৩১, ৫৩ ও ৫৪; ৭ম খণ্ড, ৭৬ নং অংশ— কিতাবুত্তিব)। বলা হয়েছে কুষ্ঠ (পৃঃ ৪০৮), প্লেগ (৪১৮ ও ৪২২), উটের পাঁচড়া (পৃঃ ৪৪৭) সংক্রামক ব্যাধি নয়। এছাড়াও, এইসব হাদীসে সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে সাধারণ আলোচনাও স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, এরই পাশাপাশি এমন হাদীসও রয়েছে, যেখানে সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে : যে স্থানে প্লেগ দেখা দিয়েছে, সেখানে যেন কেউ না যায়; এবং কেউ যেন কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে না আসে।

এসব আলোচনা থেকে সম্ভাব্য এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা চলে যে, হাদীসগ্রন্থসমূহে এমন হাদীসও বিদ্যমান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যেসব গ্রহণযোগ্য নয়। এদিকে এসব হাদীস আদৌ সহীহ্ বা বিশুদ্ধ কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ রয়ে গেছে। তবুও আমরা এসব হাদীস নিয়ে আলোচনা করছি, শুধু একটি উদ্দেশ্যে। আর তা হল, কোরআনের আয়াতের সাথে এসব হাদীসের তুলনামূলক বিচার। আমরা দেখেছি, কোরআনে বিজ্ঞান-সংক্রান্ত এমন একটি আয়াতও নেই— যা বৈজ্ঞানিক বিচারে ভুল। বলা আবশ্যক যে, আমাদের আলোচনার জন্য এই বিষয়টিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচনার সুবিধার জন্য মনে রাখা দরকার, মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পর তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার ধারা দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে :

প্রথমত, বিপুলসংখ্যক ইমানদার ছিলেন কোরআনের হাফেজ। মোহাম্মদের (দঃ) মতই তাঁরা বহু বহুবার এই কোরআন সম্পূর্ণভাবে হেফ্জ-খতম দিয়েছিলেন। তাছাড়া, কোরআন লিখিতাকারেও ছিল সংরক্ষিত। এমনকি হিজরতের আগে যতটুকু কোরআন নাজিল হয়েছিল, তাও সম্পূর্ণভাবে লিখিতাকারে সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

হিজরতের ঘটনা সংঘটিত হয় মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর দশ বছর আগে ৬২২ সালে।

দ্বিতীয়ত, মোহাম্মদের (দঃ) একান্ত ঘনিষ্ঠজন, সাহাবী-সঙ্গীরা তো বটেই, বহু ঈমানদারও তাঁর বাণীর ও কার্যাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন। তাঁরা কোরআন ছাড়াও মোহাম্মদের (দঃ) ওইসব বাণী ও কার্যাবলীর মধ্যে শরা-শরীয়তের বিধি-বিধান ও জায়েজ-না-জায়েজের প্রশ্নের জবাব খুঁজে নিতেন।

এই পরিস্থিতিতে মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর রেখে-যাওয়া এই দুই ধরনের শিক্ষাধারা-সম্বলিত বিষয়গুলো সংকলিত হওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। হাদীস-সংক্রান্ত প্রথম সংকলন প্রকাশ পায় মোটামুটিভাবে হিজরতের চল্লিশ বছর পর। পক্ষান্তরে, কোরআন সংকলিত হয় আরো অনেক আগে, প্রথম খলিফা আবুবকরের (রাঃ) আমলে, বিশেষ করে তৃতীয় খলিফা ওসমানের (রাঃ)-এর সময়। এই ওসমানের (রাঃ) আমলেই অর্থাৎ মোহাম্মদের (দঃ) মৃত্যুর বারো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যেই কোরআনের চূড়ান্ত সংকলন কিতাব আকারে প্রকাশ পায়।

এই যে দুই ধরনের ধর্মীয় গ্রন্থ : একটি কোরআন এবং অপরটি হাদীস, এদের মধ্যে যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যটার উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। কোরআন ও হাদীসের মধ্যকার এই গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটা শুধু ভাষা বা সাহিত্যমানের দিক থেকে নয়; এ পার্থক্য বিষয়বস্তুর দিক থেকেও উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, কোরআনের ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গির সাথে হাদীসের ভাষা ও বাকভঙ্গির কোনো তুলনা তো দূরের কথা, তুলনা করার চিন্তাও করা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা, এই দুই ধরনের ধর্মীয়গ্রন্থের বাণীসমূহ যখন আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য-জ্ঞানের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে যে পার্থক্য বিরাট হয়ে ধরা পড়ে। তা লক্ষ্য করলে যে-কারোপক্ষেই বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে উপায় থাকে না। আশা করি, সেই পার্থক্য ইতিমধ্যেই যথাযথভাবে সকলের কাছে ধরা পড়েছে। সেই পার্থক্যগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

কোরআনে এমনসব বাণী ও বক্তব্য রয়েছে, যেগুলো দেখতে-শুনতে অতি সাধারণ মনে হলেও সে-সবের মধ্যে এমনসব তথ্য রয়েছে যেসব তথ্যের অর্থ ও

মর্ম শুধু পরবর্তী পর্যায়ে এসে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সত্য হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছে ও হচ্ছে।

পক্ষান্তরে, হাদীসে এমনসব বক্তব্য বিদ্যমান, যেগুলো তৎকালীন ধারণা ও প্রচলিত বিশ্বাসের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে ওইসব হাদীসের বক্তব্য বিজ্ঞানের বিচারে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারছে না। এমনকি ইসলামী শরা-শরীয়ত বিষয়ে যেসব হাদীসগ্রন্থের সঠিকত্ব প্রশ্নাতীতভাবেই সর্বজনস্বীকৃত—তাদের বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদীসের বেলাতেও মোটের উপর একই অবস্থা ঘটছে।

সবশেষে, একটা বিষয় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন ঃ তাহল, কোরআনের বাণী সম্পর্কে স্বয়ং মোহাম্মদের (দঃ) দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর নিজের বক্তব্য-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কোরআনকে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছিলেন, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত ওহী বা অবতীর্ণ আসমানী কিতাব হিসেবে। বিশ বছরের অধিককাল ধরে এসব বাণী তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মোহাম্মদ (দঃ) নিজেই সবিশেষ সতর্কতার সাথে সেসব বাণী শ্রেণীবদ্ধ করে গেছেন। এ বিষয়টা নিয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। দেখা গেছে, কোরআনের ওইসব বাণী কিভাবে মোহাম্মদের (দঃ) জীবদ্দশাতেই লিখিতাকারে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যেসব বাণী হেফ্‌জ করে রাখা হয়েছিল বহুসংখ্যক ঈমানদার হাফেজের দ্বারা। শুধু তাই নয়, প্রতিটি নামাজে কোরআনের মুখস্থ করা কোনো-না-কোনো অংশ তেলাওয়াতের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে, হাদীস হচ্ছে— প্রধানত মোহাম্মদের (দঃ) নিজস্ব বাণী, বক্তব্য ও ব্যক্তিগত কার্যকলাপের বিবরণী। তাঁর সেইসব বাণী ও কার্যবিবরণী থেকে উদাহরণ নিয়ে নিজেদের আচার-আচরণ গড়ে নেয়ার দায়িত্ব তিনি মানুষের ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করে গেছেন। তিনি এও বলে গেছেন, যদি তারা ভাল মনে করে তাহলে তারা তাঁর হাদীস সাধারণ্যে প্রচারও করতে পারে। তবে কোন ধরনের হাদীস মানুষ প্রচার করবে, সে বিষয়ে তিনি কোনো নির্দেশ দিয়ে যাননি।

সত্যি কথা বলতে কি, শুধু সীমিতসংখ্যক হাদীসেই মোহাম্মদের (দঃ) চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। বাদবাকি হাদীসে যা প্রতিফলিত হয় তা অবশ্যই সে যুগের প্রচলিত সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন। অর্থাৎ, তা সে যুগের প্রচলিত সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

আমরা এখানে যেসব হাদীস উদ্ধৃত করছি, সেসবের ক্ষেত্রে এই কথাটা বেশি খাটে। এ ধরনের কোনো দুর্বল কিংবা জাল হাদীসের বক্তব্যের সাথে কোরআনের কোনো আয়াতের তুলনা করে দেখলেই আমরা বুঝে নিতে পারব যে, এ দুয়ের মধ্যকার পার্থক্য কত বিরাট। আর এই ধরনের যে-কোনো তুলনায় যে সত্যটা ফুটে ওঠে (সেই সত্য ফুটে ওঠার ব্যাপারে আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না) তা থেকে আমরা অনায়াসেই সে যুগের প্রচলিত রচনার ধারা এবং লেখার ভঙ্গির একটি পরিচয় পেতে পারি।

বলা অনাবশ্যক যে, সে যুগে প্রচলিত বিজ্ঞান-সংক্রান্ত যে-কোনো রচনা আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে শুধু অসত্যই নয় বাতিল বলেও পরিগণিত হতে বাধ্য। পক্ষান্তরে, সেকালেই ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণীর সংকলিত রূপ হিসেবে যে কোরআন আমরা পাচ্ছি; সেই কোরআন এই ধরনের যে-কোনো ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত'।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ধর্মীয় বিষয়ের বিচারে, বিশেষত ধর্মীয় বিধি-বিধান হিসেবে হাদীসের সত্যতা প্রশ্নাতীত। কিন্তু কোনো হাদীসে যখন নিছক পার্থিব কোনো বিষয় আলেচিত হয়েছে, দেখা গেছে, সেসব বক্তব্য সে যুগের সাধারণ মানুষের প্রচলিত ধারণা থেকে বেশি আলাদা নয়।

> "ধর্মীয় বিষয়ে যখন আমি কোনো নির্দেশ দেব, তখন তোমরা তা অবশ্যই মান্য করবে ও পালন করবে। পক্ষান্তরে, জাগতিক কোনো ব্যাপারে আমি যখন নিজের অভিমত অনুসারে কোনো নির্দেশ দেব, তখন (মনে রাখবে যে,) আমি একজন মানুষ।"

— আল সারাকসী তাঁর প্রিন্সিপল্স (আল-ওসুল) গ্রন্থে এই হাদীসটি তুলে ধরেছেন এভাবে : মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন ঃ

> "আমি যখন কোনো ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের জন্য কোনো বক্তব্য রাখি, তোমরা তদনুসারে ধর্মের কাজ করবে, কিন্তু আমি যখন দুনিয়াদারীর ব্যাপারে তোমাদের কোনো কথা বলি, তখন মনে রাখবে যে, তোমাদের দুনিয়াদারীর ব্যাপারে তোমাদের নিকটই উত্তম জ্ঞান রয়েছে।"

সাধারণ আলোচনা ঃ
বাইবেল পুরাতন নিয়ম

কে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের লেখক? কোনো সন্দেহ নেই এর উত্তরে বলা হবে যে, বাইবেলের এই পুরাতন নিয়ম মানুষের রচনা, তাহলেও এ রচনার প্রেরণা এসেছে 'হোলি-ঘোস্ট' বা 'পবিত্র-আত্মা' থেকে, সুতরাং এ পুস্তকের রচয়িতা বিধাতাই।

বাইবেলের পরিচিতি লেখার সময় পাঠকবর্গের খেদমতে এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেই লেখকেরা ক্ষান্ত থাকেন বলে পরবর্তীকালে আর কোনো প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ থাকে না। কখনো কখনো পরিচিতি-পর্বে এই মর্মেও পাঠকদের সতর্ক করা হয়, কোনো ব্যক্তি সম্ভবত পরবর্তী পর্যায়ে আদি-পুস্তকের সঙ্গে বিশদ কোনো বিবরণী সংযুক্ত করেছেন; কিন্তু সেই সংযুক্তিতে সংশ্লিষ্ট বক্তব্যে সন্নিবেশিত সত্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এই পর্যায়ে উল্লিখিত এই 'সত্যে'র উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বলা আবশ্যক, বাইবেলের এই 'পরিচিতি' রচনার ব্যাপারে চার্চ-অথরিটি নিজেদের একমাত্র হকদার বলে মনে করেন। কেননা, সাধারণ্যে এ ধারণা দিয়ে আসা হয়েছে যে, চার্চ-অথরিটিই একমাত্র সংস্থা— যাঁরা 'পবিত্র আত্মার' সহযোগিতায় এসব বিষয়ে বিশ্বাসীদের প্রয়োজনীয় আলোকদানের ক্ষমতা রাখেন। স্মতব্য যে, চার্চ-কাউন্সিল বা গির্জা পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল চতুর্থ শতাব্দীতে। সেই থেকে এই গির্জা সংস্থাই একের-পর-এক 'পবিত্র বাইবেল' প্রকাশ করে এসেছে। পরবর্তীকালে কাউন্সিল অব ফ্লোরেন্স (১৪৪১), ট্রেন্ট ১৫৪৬ এবং ফার্স্ট ভ্যাটিক্যান কাউন্সিলও (১৮৭০) এইসব প্রকাশিত বাইবেল অনুমোদন দিয়ে গেছেন। এভাবেই অধুনা 'কানুন' বা 'প্রামাণ্য' হিসেবে পরিচিত বাইবেল পাওয়া যাচ্ছে। অনুমোদিত এই বাইবেল প্রচুরভাবে সম্প্রচারিত হওয়ার পর অতিসম্প্রতি দ্বিতীয় ভাটিক্যান কাউন্সিল সম্পূর্ণ নতুনভাবে একখানি বাইবেল সংকলনও প্রকাশ করেছেন। এটি প্রকৃতপক্ষেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উল্লেখ্য যে, এই সংকলনটি প্রকাশ করতে দীর্ঘ তিনটি বছর ধরে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। বাইবেলের এই আধুনিক সংস্করণের গোড়াতে স্পষ্ট

ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে যে, বিগত শতাব্দীগুলোতে বাইবেলের নির্ভুলতা সম্পর্কে যে গ্যারান্টি দেয়া হয়েছিল, তা ছিল সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক। আধুনিক সংস্করণে সন্নিবেশিত এই বক্তব্যের পর বাইবেলের বাণীর নির্ভুলতা নিয়ে আর কোনো বিতর্ক উত্থাপনের অবকাশ যে থাকে না, তা বলাই বাহুল্য।

তবুও কথা থেকে যায় ঃ কেননা, ইতিমধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক পুরোহিত-পণ্ডিত বাইবেল সম্পর্কে বেশকিছু রচনা প্রকাশ করেছেন। এসব রচনা যদিও সর্বসাধারণের জন্য নয়, তবুও সে-সবের প্রতি যদি কেউ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, দেখতে পাবেন, বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পুস্তকের যে নির্ভুলতাকে এতকাল উপাসনালয়ের মতোই নির্মল ও পবিত্র বলে মনে করা হত, সেই নির্ভুলতার প্রশ্নে জড়িয়ে রয়েছে নানান ঘোর-প্যাঁচ।

উদাহরণস্বরূপ, জেরুজালেমের বাইবেল স্কুলের তত্ত্বাবধানে অনূদিত ফরাসী ভাষার বাইবেলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশিত এই আধুনিক ফরাসী বাইবেল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাইবেলের নির্ভুলতা সম্পর্কে এর বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু তাই নয়, বাইবেলের নতুন নিয়মের মতো পুরাতন নিয়মেরও বেশিরভাগক্ষেত্রে যেসব বিতর্কমূলক বিষয় নানাসমস্যার সৃষ্টি করে রেখেছে, সে সম্পর্কে এই বাইবেলের অনুবাদকেরা কোনো রাখ-ঢাকের বালাই রাখেননি। অধ্যাপক এডমন্ড জ্যাকোব রচিত আর একটি গবেষণামূলক পুস্তকের নাম ঃ *দি ওল্ড টেস্টামেন্ট।* সংক্ষিপ্ত হলেও এই পুস্তকটি অনেক বেশি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত। এই পুস্তক পাঠে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। বস্তুত, এই পুস্তকে বাইবেলের ত্রুটি-বিচ্যুতির বিভিন্ন চিত্র চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

অনেকের অজানা, কিন্তু এডমন্ড জ্যাকোব দেখিয়েছেন যে, আদিতে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের একটি নয়, বরং একাধিক পাঠ বা টেক্সট বা পাঠ অংশত হলেও গ্রীক অনুবাদের জন্য ব্যবহৃত হত এবং তৃতীয় পাঠটি পরিচিত ছিল 'সামারিটান পেন্টাটেক' নামে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বাইবেলের (পুরাতন নিয়ম) একটিমাত্র পাঠ প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে, সেই একমাত্র পাঠ সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা পায় খ্রিস্টের জন্মের শতাব্দীকাল পরে।

যদি বাইবেলের পুরাতন নিয়মের উপর্যুক্ত তিনটি পাঠই এখন পাওয়া যেত, তাহলে তাদেরমধ্যে তুলনামূলক বিচার-পর্যালোচনা সম্ভব হত। শুধু তাই নয়, আদি বা মূল পাঠ কোনটি, সে সম্পর্কেও একটি অভিমতে পৌছানো যেত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ ব্যাপারে এখন কারোপক্ষে সামান্যতম ধারণাও গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এখন আদিযুগের প্রাচীনতম বাইবেল বলতে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা সেই মরুসাগরের প্রাপ্ত জড়ানো কাগজের একখানি পুস্তক (ডেড সী স্ক্রল—

কেভ অব কামরান)। এরও সময়কাল বর্তমান খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাবের আগে হলেও যীশুখ্রিস্টের সমসাময়িক।

আর পাওয়া যাচ্ছে খ্রিস্ট-পরবর্তী দ্বিতীয় শতকে প্রাপ্ত টেন-কম্যান্ডমেন্টস সম্বলিত একখানি প্যাপিরাস পুস্তক। এতেও দেখা যায় যে, প্রচলিত বাইবেলের স্বীকৃত পাঠের সঙ্গে এর গরমিল প্রচুর। তাছাড়া, তৃতীয় আর যা পাচ্ছি, তাহলো খ্রিস্টপরবর্তী পাঁচ-শতকের বাইবেলের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন পুস্তক *(জেনিজা অব কায়রো)*। পক্ষান্তরে, বাইবেলের নতুন নিয়মের (ইঞ্জিল) প্রাচীনতম হিব্রু পাঠ হিসেবে যা পাওয়া যাচ্ছে, তার সময়কাল হলো খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী।

'সেপ্টোজিন্ট' নামে পরিচিত বাইবেলটি (পুরাতন নিয়ম) খুব সম্ভব গ্রীক ভাষায় অনূদিত প্রথম বাইবেল। এর সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী। এটি আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদীদের দ্বারা রচিত হয়েছে। এর পাঠের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট বা নতুন নিয়ম। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই বাইবেল প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থ হিসেবে চালু ছিল। সাধারণ্যে ব্যবহারের জন্য খ্রিস্টান জগতে বাইবেলের যে গ্রীক পাঠটি চালু আছে, তার মূল খসড়াটি Codex Vaticanus নামে তালিকাভুক্ত হয়ে ভাটিক্যান নগরীতে সংরক্ষিত রয়েছে। এরই আরেকটি খসড়া লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হচ্ছে Codex Sinaiticus নামে। এই উভয় পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের সময়কাল হচ্ছে খ্রিস্টপরবর্তী চতুর্থ শতাব্দী।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে সেন্ট জেরোমে হিব্রু দলিল-প্রমাণ সহযোগে ল্যাটিন ভাষায় আর একটি বাইবেল প্রকাশ করতে সমর্থ হন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর এই বাইবেলের ব্যাপক প্রচার ঘটে। এটি সাধারণ্যে 'বালগেট' নামে পরিচিতি লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে বাইবেলের আরামীয় এবং সিরিয়াক (পেশিত্তা) অনুবাদের কথাও উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু এই উভয় অনুবাদই অসম্পূর্ণ।

বাইবেলের এতোগুলো পাঠ চালু থাকার ফলেই পরবর্তীকালে সবকয়টিকে একসঙ্গে যোগাড় করে নিয়ে তথাকথিত মাঝামাঝি ধরনের একটি টেকসট বা পাঠ দাঁড় করা বিশেষজ্ঞদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বলা অনাবশ্যক যে, এই পদক্ষেপ ছিল বিভিন্ন পাঠের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস মাত্র। এদিকে, একইসঙ্গে একাধিক ভাষায়ও বেশকিছু বাইবেল সংকলিত ও প্রকাশিত হয়। এতে একই বাইবেলের মধ্যে পাশাপাশি স্থান পেয়েছিল হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, সিরিয়াক, আরামীয় এবং এমনকি আরবি ভাষার পাঠ। বিখ্যাত ওয়াল্টন বাইবেল (লন্ডন, ১৬৫৭) এমনিধারার একখানি গ্রন্থ।

বক্তব্য সম্পূর্ণ করার প্রয়োজনে আরেকটি কথা বলে নিতে হয়। বাইবেলের এতোসব ভিন্ন ভিন্ন পাঠের কারণ আর কিছুই নয় : খ্রিস্টানদের গির্জার যেমন বিভিন্নতা রয়েছে, তেমনি গির্জাভিত্তিক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা বাইবেল। কেননা, বাইবেল সম্পর্কে একেক গির্জার ধারণা একেকরকম। আর পারস্পরিক এই ভিন্ন ধারণার কারণেই অন্যভাষায় বাইবেল তরজমা করতে গিয়েও তাদের পক্ষে একমতে পৌছানো সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতি এখনও অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, The Ecumencial Translation Of The Old Testament নামে একটি সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনটি বেশ কিছুসংখ্যক ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট বিশেষজ্ঞের সম্মিলিত অনুবাদ। এতে বাইবেলের সবধরনের সবভাষ্যের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বোক্ত বিবরণী থেকে এটা স্পষ্ট হয় বাইবেলের পুরাতন নিয়ম রচনার ক্ষেত্রে মানুষের হাত কমবেশি সক্রিয় ছিল আগাগোড়া। এ থেকে এ কথা বুঝতেও বেগ পেতে হয় না যে, এক পাঠের সঙ্গে আরেক পাঠের, এক অনুবাদের সঙ্গে আরেক অনুবাদের এই যে পার্থক্য, তা সংশ্লিষ্ট বাইবেলগুলোর সংশোধনজনিত কর্মকাণ্ডের অনিবার্য পরিণতি। এভাবে বিগত দু'হাজার বছর ধরে ক্রমাগতভাবে সংশোধনী চালিয়ে যাওয়ার ফলেই বাইবেলের মূলবাণীর পাঠ 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুস্তকাকারে সংকলনের পূর্বে বাইবেল ছিল ঐতিহ্যবাহী জনকথা অর্থাৎ মানুষের স্মৃতিনির্ভর কাহিনী। আদিতে এই ধরনের স্মৃতিচারণই ছিল ভাবাদর্শ প্রচারের একমাত্র উপায়। আর এই ঐতিহ্যনির্ভর স্মৃতিকথা সম্প্রচারের প্রধান মাধ্যম বা বাহন ছিল সঙ্গীত।

ই. জ্যাকোব লিখেছেন, "আদিযুগের মানুষেরা ছিল সঙ্গীতপ্রিয়। অন্যান্য স্থানের মতো ইহুদীদের মধ্যেও আগে কবিতা সৃষ্টি হয়েছে, পরে এসেছে গদ্য। ইহুদী সঙ্গীত ছিল সুদীর্ঘ এবং সুন্দর। সঙ্গীতই ছিল তাঁদের আনন্দ ও বেদনা প্রকাশের বাহন। এভাবে সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁরা ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে এমনভাবে একাত্মতা বোধ করতেন যে, প্রত্যেকটি ঘটনা যেন তাঁরা প্রত্যক্ষ করছেন। এছাড়াও, ইহুদীরা তাঁদের সঙ্গীতকে ব্যাপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের প্রকাশ হিসেবে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেতেন।" বিভিন্ন কারণ ও ঘটনা উপলক্ষে ইহুদীরা সঙ্গীতের মাধ্যমে নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতেন। এ প্রসঙ্গে ই. জ্যাকোব বেশকিছু উপলক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে নানাবিষয় ও ঘটনা উপলক্ষে রচিত বিভিন্ন সঙ্গীত বাইবেলে স্থান লাভ করেছে; যেমন— ভোজন-সঙ্গীত, ফসল কাটার গান ইত্যাদি। এছাড়াও বিশেষ কোনো কর্মকাণ্ড উপলক্ষে রচিত গান যেমন— বিখ্যাত কূপ খননের গান (বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, গণনাপুস্তক ২১, ১৭), বিবাহ-সঙ্গীত, সঙ্গীত সম্পর্কিত সঙ্গীত এবং বিলাপ-সঙ্গীত। বাইবেলে যুদ্ধ-সংক্রান্ত বেশকিছু সঙ্গীতও রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেবোরা সঙ্গীত (ঐ, বিচারকর্তৃগণ ৫, ১-৩২) এবং সদাপ্রভুর (জেহোভা) ইচ্ছায় ও নেতৃত্বে অর্জিত বিজয়ের গান (ঐ, গণনাপুস্তক ১০, ৩৫) : "আর সিন্দুক এগিয়ে যাওয়ার সময় মোশি বলতেন ঃ

"হে সদাপ্রভু, ওঠ, তোমার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হউক, তোমার বিদ্বেষীগণ তোমার সম্মুখ থেকে পলায়ন করুক।"

এ ছাড়াও বাইবেলে রয়েছে নীতিবাক্য ও প্রবাদ (বুক অব প্রভার্ব : হিস্টোরিক বুকস-এর প্রবাদ ও নীতিমালা দ্রষ্টব্য), আশীর্বাদ বা অভিশাপবাণী

এবং নবুয়তপ্রাপ্তির পর নবীগণ কর্তৃক মানুষের প্রতি প্রদত্ত আসমানী বিধিবিধান-সংক্রান্ত বাণী।

ই. জ্যাকোবের মতে, এসব বাণী ও কাহিনী পরিবার পরম্পরায় অথবা উপাসনালয়গুলো মাধ্যমে স্রষ্টা কর্তৃক মনোনীত মানুষের (নবীর) তথা ইতিহাসের কাহিনী বা গাথা হিসেবে জারি ছিল। ইতিহাসের এসব কাহিনী কখনো কখনো লোকমুখে গল্প-কথায় পরিণত হয়েছে। যেমন ঃ বোথমের গল্প-কথা। (বিচারকর্তৃগণ ৯, ৭-২১) যেখানে বলা হয়েছে, "একদা বৃক্ষগণ আপনাদের উপর অভিষেককরণার্থে রাজার অন্বেষণে গমন করিল— তাহারা জলপাই, ডুমুর, আঙুর এবং কণ্টকবৃক্ষকে কহিল" ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে ই. জ্যাকোবের অভিমত হলো, "কাহিনীকে সুন্দর করে তোলার বাসনায় এসব বর্ণনা টেনে আনা হয়েছে। কাহিনীতে 'অশ্রুত ইতিহাসের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে'; এসেছে সেকালের নানা বিবরণীও। এভাবে জানা-অজানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে বটে, কিন্তু বর্ণনার গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি।"

উপসংহারে ই. জ্যাকোবের বক্তব্য হলো ঃ "ওল্ড টেস্টামেন্টে (বাইবেলের পুরাতন নিয়মে) হযরত মুসা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীপতির যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাতে খুব সম্ভব ধারাবাহিক ইতিহাসের ঘটনা প্রতিফলিত হয়েছে, একান্ত প্রক্ষিপ্তভাবেই। বহুবিচিত্র এইসব কাহিনী বর্ণনাকালে কথককে জোড়াতালির স্বার্থে এ ধরনের বহু কল্পনা ও গল্প-কথার আশ্রয় নিতে হয়েছে। পরিশেষে, এসব বর্ণনাকে সুন্দর ও বিশ্বাসযোগ্য করে ইতিহাস হিসেবে করা হয়েছে উপস্থাপন। আর এ থেকেই আধুনিক চিন্তাবিদ সমালোচককে বুঝে নিতে হচ্ছে যে, পৃথিবীর ও মানবজাতির সূচনাপর্বে কী ঘটেছিল।"

এটা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, খ্রিস্টপূর্ব শতকের শেষভাগে ইহুদীরা যখন কেনানে বসতি স্থাপন করেছিল, তখন থেকেই ঐতিহ্যবাহী এসব কাহিনী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। তবে, সে লেখা যে নির্ভুল ছিল, তা নয়। এমনকি আইন বা বিধানের মতো যেসব বিষয় মানুষের চাহিদা ছিল সর্বাধিক, সেসব যেমন—তেমনি অন্য আরো যেসব বিষয় স্থায়ীভাবে ধরে রাখা প্রয়োজন ছিল যেসব বিধান এবং বিষয়ও নির্ভুলভাবে উল্লিখিত হয়নি। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিধাতার নিজ হাতে রচিত বলে প্রচারিত দশটি বিধান বা টেন-কম্যান্ডমেন্টস। ওল্ড টেস্টামেন্টে এই টেন-কম্যান্ডমেন্টস-এর দু'টি পৃথক ও ভিন্নপাঠ বিদ্যমান : একটি যাত্রাপুস্তকে (২০, ১-২১) এবং অপরটি দ্বিতীয় বিবরণীতে (৫, ১-৩০)। মূল বক্তব্যের দিক থেকে এ দু'টির মধ্যে খুব বেশি অমিল নেই; কিন্তু এ দুটি রচনায় বর্ণনার পার্থক্য স্পষ্ট। এছাড়াও, তখন বিভিন্ন চুক্তি, চিঠিপত্র, ব্যক্তিত্বের তালিকা (বিচারক, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, বংশ-

তালিকা ইত্যাদি) এবং দান ও লুণ্ঠনের বিশদ বিবরণ ও এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। এরফলে গড়ে উঠেছিল আর্কাইভ বা সরকারি মোহাফেজখানা বা সংরক্ষণাগার। বাইবেল-সংক্রান্ত চূড়ান্ত রচনা প্রণয়নে এই মোহাফেজখানায় রক্ষিত দলিলপত্রাদি ব্যবহৃত হয়েছিল। এভাবেই প্রণীত হয়েছিল এখন আমাদের হাতের কাছে পাওয়া বাইবেলের পুরাতন নিয়ম। আর এভাবে বাইবেলের নামে সংকলিত পুস্তকটিতেও বিভিন্ন লেখকের রচনার ঘটেছিল সংমিশ্রণ। প্রাপ্ত এসব দলিলপত্রসমূহ কেন যে এরকম বিসদৃশ পাঁচমিশালীভাবে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ ও সংকলিত হয়েছিল, তার কারণ খুঁজে বের করার দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের।

প্রকৃতপক্ষে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মের গোটাটাই এমনিভাবে প্রচলিত লোক-ঐতিহ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল। সুতরাং, যে পদ্ধতিতে এটি প্রণীত হয়েছে তাতে সময় যদি অন্যরকম হত, আর এসব ঘটনাস্থল যদি হত ভিন্ন, তাহলে আদিযুগের আর পাঁচটি সাহিত্যের মতোই এই বাইবেলও তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ আলাদা এক সৃজনশীল সাহিত্যকর্মে পরিণত হতে পারতো এবং তা যদি হত, তাহলে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকতো না।

উদাহরণ হিসেবে রাজ-রাজড়াদের আমলে গড়ে ওঠা ফরাসী সাহিত্যের কথা বলা যেতে পারে। অতীতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী তখন চালু ছিল ঐতিহ্যভিত্তিক লোককাহিনীকে সম্বল করে। অতীতের যুদ্ধ-কাহিনী (এরমধ্যে কোনো কোনো যুদ্ধ আবার খ্রিস্টধর্মের নিরাপত্তার স্বার্থে সংঘটিত); নানাধরনের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা, ফরাসী বীরদের বীরত্ব। সবকিছু শতাব্দীকাল পরেও রাজকবি, কাহিনীকার ও বিভিন্ন ধারার লেখকদের উদ্বুদ্ধ করেছিল সৃষ্টিধর্মী কিছু রচনা করতে। এভাবে একাদশ শতাব্দীর পর থেকে সত্যিকার ঘটনার সঙ্গে নানা উপকথা সংমিশ্রিত হয়ে লোক-গাথাসমূহ ফরাসী-সাহিত্যের অঙ্গনে নতুনভাবে উপস্থাপিত হতে শুরু হয়েছিল আর এভাবেই গড়ে উঠেছিল ফরাসী সাহিত্যের মহাকাব্যের ধারা। এরমধ্যে সুবিখ্যাত মহাকাব্যটি হচ্ছে 'সং অব রোল্যান্ড'। রোল্যান্ড ছিলেন সম্রাট শার্লিম্যানের সেনাপতি। স্পেন অভিযানশেষে দেশে ফেরার পথে তিনি যেসব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাতে যে দুঃসাহসিক অস্ত্রচালনার কৌশল ও বীরত্ব প্রদর্শন করে আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল এই মহাকাব্যটি।

তবে, শুধু রোল্যান্ডের আত্মত্যাগ এই মহাকাব্যের একমাত্র উপজীব্য ছিল না। তারসঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছিল নানা গল্পকথা, বহু উপ-কাহিনী। রোল্যান্ডের আত্মত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল ৭৭৮ সালের ১৫ আগস্ট। বাস্তবে পার্বত্য এলাকার বাস্ক সম্প্রদায়ের লোকেরা রোল্যান্ডের ফেরার পথে তাঁর উপরে হামলা

চালিয়েছিল। সুতরাং, এই মহাকাব্যটি শুধু উপকথার বর্ণনা নয়, এর ঐতিহাসিক ভিত্তিও ছিল। কিন্তু তবুও কোনো ঐতিহাসিক এই মহাকাব্যের ঘটনাবলীকে সম্পূর্ণভাবে ইতিহাস হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হবেন না।

এ ধরনের একটি ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য যেভাবে তৈরি হয়েছে, তারসঙ্গে বাইবেল রচনার হুবহু তুলনা চলে। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, অনেকে যেভাবে পদ্ধতিগত-বিচারে স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে চান, আমরাও সেভাবে নানা উপ-কাহিনীর সংকলন হিসেবে ধরে নিয়ে বাইবেলের সব বক্তব্যকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছি। না, তা নয়। বিশ্বসৃষ্টির বাস্তবতা, স্রষ্টা কর্তৃক হযরত মুসার উপরে টেন-কম্যান্ডমেন্টস বা দশধারার বিধান অবতীর্ণ করার ঘটনা আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা এও বিশ্বাস করি যে, হযরত সোলায়মানের আমলে যেমনটি হয়েছিল—মানবিক বিষয়ে স্রষ্টার মধ্যস্থতা করার মত ঘটনা—তাও অসম্ভব নয়। কিন্তু এই বিশ্বাস সত্ত্বেও আমরা এ কথা না বলে পারছি না যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম আমাদের যা উপহার দিচ্ছে, তা ঘটনার সারার্থ মাত্র; পুরো সত্য ঘটনা নয়। কেনান একইসঙ্গে নানা কল্পকাহিনীর যে বিশদ বর্ণনা বাইবেলে স্থান পেয়েছে, সেসবের কঠোর সমালোচনা না করে উপায় নেই। বস্তুত, লোকমুখে প্রচলিত ঐতিহ্যগাথার ভিত্তিতে বাইবেল যাঁরা রচনা করেছিলেন, তাঁরা মূলবাণীর সঙ্গে নিজেদের কল্পনা ও মানবীয় উপাদান এতো অধিকমাত্রায় সংযোজন করে গেছেন যে, সেক্ষেত্রে সমালোচনা অপ্রতিরোধ্য হতে বাধ্য।

পুরাতন নিয়মের পুস্তকাবলী

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম বিভিন্ন পুস্তকের সংকলন। এসব পুস্তক নানা আয়তনের এবং এসবের লেখকের সংখ্যাও কম নয়। লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে ওইসব লেখক নয়শত বছরেরও বেশি সময় ধরে নানা ভাষায় ওই পুস্তকগুলো রচনা করে গেছেন। কখনো কোনো ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের জন্য অথবা জরুরি কোনো প্রয়োজনে বহুবার এসব রচনা সংশোধিত ও রূপান্তরিত হয়েছে এমনও দেখা গেছে যে, প্রথমবারের সংশোধন ও রূপায়ণের সময়কালের সাথে দ্বিতীয়বারের সংশোধন ও রূপান্তরের সময়কালের ব্যবধান ছিল বিরাট।

খুব সম্ভব খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে ইহুদীদের রাজত্বের সূচনায় বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ওইসব রচনা বিপুল পরিমাণে রচিত হতে শুরু করে। তখন রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একদল লিপিকারের আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁরা সবাই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং শুধুমাত্র লেখা নকলের মধ্যেই এঁদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতিহাসে বাইবেলের যে অসম্পূর্ণ রচনার কথা উল্লেখ রয়েছি, সম্ভবত তা এই সময়কার। তখন বিশেষ কারণে এসব রচনা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিছুসংখ্যক সঙ্গীতের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে হযরত ইয়াকুব ও হযরত মুসার প্রাপ্ত প্রত্যাদেশসমূহ এবং টেন-কম্যান্ডমেন্টস ছাড়াও সাধারণের জন্য আইনবিষয়ক বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। কেননা, রাজকীয় আইন প্রণয়নের আগে এসব বাণী ধর্মীয় ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল যথেষ্ট। এভাবে নানাস্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নানাধরনের বিষয় ও বাণী-সম্বলিত রচনা নিয়েই গড়ে উঠেছিল বাইবেলের পুরাতন নিয়মের মূল গ্রন্থাংশ।

এর কিছুকাল পরে, সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে, 'জেহোভিস্ট সংস্করণ' নামে পরিচিত বাইবেলের পুরাতন নিয়মে পেন্টাটেক অধ্যায়ের মূল রচনা তৈরি হয়। এই নামকরণের জন্য যে, এইসব রচনায় স্রষ্টাকে বলা হত 'জোহাভা'। এই মূল রচনাই ছিল হযরত মুসার কিতাব বলে পরিচিত তোরাহ্ বা তাওরাতের বুনিয়াদ। পরবর্তীকালে এর সাথে 'এলোহিস্ট' পাঠ এবং

'সেকেরডোটাল' বিবরণী সংযোজিত হয়। এসব পাঠের স্রষ্টাকে বলা হতো 'এলোহিম'। প্রাথমিক পর্যায়ে জেহোভিস্ট বাইবেলের মূল রচনায় বিশ্বের উৎপত্তি থেকে হযরত ইয়াকুবের (জ্যাকব) মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের বিবরণী স্থান লাভ করেছিল এই মূল রচনাসমূহ সংগৃহীত হয়েছিল দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য জুদাহ্ থেকে।

খ্রীস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর শেষভাগ ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ ছিল হযরত ইলিয়াস ও এলিশার নবুয়তের আমল। এই উভয় নবীর কিতাবও এখন আমরা পাচ্ছি। তখনই উপর্যুক্ত পেন্টাটেক বা পঞ্চপুস্তকের বিবরণীর এলোহিস্ট পাঠ রচিত হয়। এই রচনা অবশ্য জেহোভিস্ট রচনার চেয়ে সংক্ষিপ্ত। কেননা, এলোহিস্ট রচনায় শুধু হযরত ইবরাহীম, ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের বিবরণী স্থান লাভ করেছিল। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের যশুয়া ও জাজেস (বিচারকর্তৃগণ) পুস্তকখানিও এই সময়ের রচনা।

খ্রীস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে এমনসব নবীর আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা নিজেরাই ছিলেন লেখক। এ ধরনের লেখক-নবীদের মধ্যে আমোষ ও হোশেয় এবং জুদাহ্-র নবী মিখাহ্র নাম উল্লেখযোগ্য। খ্রীস্টপূর্ব ৭২১ সালে সামারিয়ার পতনের মধ্যদিয়ে ইহুদীদের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরফলে ধর্মীয় উত্তরাধিকার ন্যস্ত হয় জুদাহ্ রাজ্যের উপর। তখনই পুরাতন নিয়মের প্রবাদসমূহ একক-পুস্তক হিসেবে সংকলিত হয়ে জেহোভিস্ট ও এলোহিস্ট উভয় সংস্করণের পেন্টাটেক বা পঞ্চপুস্তকের সাথে যুক্ত হয়। এভাবে তাওরাত হয় সংকলিত। তখনই ডেটেরোনমি বা গণনা-পুস্তক রচিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জোশিয়ার রাজত্বকালে আবির্ভাব ঘটে জিরমিয় নবীর। কিন্তু তাঁর বাণীসমূহ পুস্তকাকারে সম্পূর্ণভাবে সংকলিত হতে সময় যায় প্রায় শত বছর।

খ্রিস্টপূর্ব ৫৯৮ সালে ইহুদীদের প্রথম নির্বাসনের আগেই পুরাতন নিয়মের তিনটি পুস্তক যথা সফনিয়, নহুম ও হবকুক সংকলিত হয়। এজেকেল নবীর সময়কালে সংঘটিত হয় ইহুদীদের প্রথম নির্বাসন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ সালে জেরুজালেমের পতনে ইহুদীদের দ্বিতীয় নির্বাসনের কাল শুরু হয় এবং এই নির্বাসন অব্যাহত থাকে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ সাল পর্যন্ত।

এজেকেল শুধু ইহুদীদের নির্বাসনকালের নবী ছিলেন না; তিনি ছিলেন নির্বাসনকালের শেষ উল্লেখযোগ্য পয়গম্বরও। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কিতাব বর্তমান আকারে সংকলিত হতে পারেনি। যেসব লিপিকার-পুরোহিত তাঁর 'আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার' লাভ করেছিলেন, তাঁদের হাতেই তাঁর বাণীর সংকলন সমাপ্ত হয়েছিল। এই লিপিকার-পুরোহিতরাই বাইবেলের আদি-পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ রচনার কাজে হাত দেন। এই সংস্করণ 'সেকেরডোটাল' নামে

পরিচিত। এতে সৃষ্টির সূচনা থেকে হযরত ইয়াকুবের মৃত্যু পর্যন্ত বিবরণী স্থান পেয়েছে। এভাবে তাওরাতের জেহোভিস্ট ও এলোহিস্ট সংস্করণের মাঝখানে কেন্দ্রীয় যোগসূত্র হিসেবে স্থান লাভ করে এই তৃতীয় সংস্করণ। পরবর্তীকালে দেখা যায়, মোটামুটিভাবে দু' থেকে চার শতাব্দী আগেকার পাঠের সাথে এই তৃতীয় সংস্করণের পাঠ যুক্ত হওয়ায় কি ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। যাহোক, পুরাতন নিয়মের বিলাপ পুস্তক তখনই প্রকাশিত হয়।

খ্রীস্টপূর্ব ৫৩৮ সালে সাইরাসের ঘোষণায় ইহুদীদের ব্যাবিলন নির্বাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর তাঁরা জেরুজালেমে ফিরে আসেন এবং সেখানকার উপাসনালয় পুনঃর্নির্মাণ করেন। এরপর বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রচারকার্য চলতে থাকে। এসব নবীর বাণী সংকলন ক্রমান্বয়ে হগয়, সখরিয়, ইশাইয়ার তৃতীয় পুস্তক, মালাখি, দানিয়েল এবং বারোখ-পুস্তক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে (সর্বশেষ পুস্তকটি গ্রীক ভাষায় রচিত)।

ইহুদীদের নির্বাসনের পরবর্তী পর্যায়ে রচিত হয় *'বুকস অব উইজডম'*। প্রবাদ-সংক্রান্ত পুস্তকখানি নিঃসন্দেহে খ্রীস্টপূর্ব ৪০০ সালের দিককার রচনা। ইয়োব পুস্তকের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। ইকলেসিয়াস্টিস বা কোহেলেথ রচিত হয় খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। পরমগীত ও বংশাবলী প্রথম ও দ্বিতীয় ইষ্‌রা ও নহিমিয় পুস্তকগুলোও তখনকারই রচনা। ইকলেসিয়াস্টিকাস বা সিরাহ্ প্রকাশিত হয় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। হিতোপদেশ পুস্তক ও মাক্কাবিস প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক খ্রিস্টের জন্মের এক শতাব্দীকাল আগেকার রচনা। রুথ, ইস্টার ও জোনা (ইউনুস নবী) পুস্তকের সময়কাল নির্ণয় করা কঠিন। টবিট ও জুডিথ পুস্তকদ্বয় সম্পর্কেও একইকথা বলা চলে। অবশ্য, ইতোপূর্বে যেসব পুস্তকের রচনা ও সংকলনের সময়কাল দেয়া হয়েছে, ধরেই নিতে হবে যে, তখনকার পরেও এইসব পুস্তকে নানা বিষয় ও রচনা সংযোজিত হয়েছে। কেননা, খ্রিস্টজন্মের মাত্র এক শতাব্দীকাল আগে বাইবেল (পুরাতন নিয়ম) রচনার রীতিনীতি ও নিয়মকানুন ঘোষণা করা হয়। কিন্তু, এর অনেক নিয়ম-রীতি চূড়ান্ত হতে হতে খ্রিস্টজন্মের পরেও শতাব্দীকাল চলে যায়।

এভাবে, আদি থেকে খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব পর্যন্ত বাইবেল (পুরাতন নিয়ম) ইহুদী জাতির ধর্মগ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বাইবেলের (পুরাতন নিয়মের) পুস্তকসমূহ বহুবার লিখন ও সংশোধনের পর চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। বলা আবশ্যক যে, তওরাত তথা বাইবেল (পুরাতন নিয়ম) রচনার এই ইতিহাস কোনোক্রমেই কারো ব্যক্তিগত অভিমতের বিবরণ নয়। বাইবেলের ইতিহাস-সংক্রান্ত এই জরিপ-গবেষণায় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে সলকরের ডমিনিক্যান

ফ্যাকালটির অধ্যাপক জে. পি. সানদ্রোজ প্রণীত এনসাইক্লোপিডিয়ার 'বাইবেল' অধ্যায় থেকে (প্যারিস, ১৯৪৭ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৫৩ দ্রষ্টব্য)। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (ওল্ড টেস্টামেন্ট) প্রকৃতপক্ষে যে কি ধরনের গ্রন্থ, তা বুঝতে হলে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞবৃন্দের গবেষণার দ্বারা আধুনিক যুগে সঠিকভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত এই তথ্যাবলীর সহায়তা নিঃসন্দেহে প্রয়োজন।

অনস্বীকার্য যে, বাইবেলের (পুরাতন নিয়মের) এইসব গ্রন্থে বিভিন্ন পয়গম্বর কর্তৃক প্রাপ্ত ওহী বা প্রত্যাদেশের সংমিশ্রণ অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু, তারচেয়েও বড় কথা, এইসব প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বাণীর ভিত্তিতে তখনকার লেখকেরা নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে যেসব রচনা উপহার দিয়েছেন, সেগুলো এখন বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (ওল্ড টেস্টামেন্ট) বা তাওরাত নামে চলছে। তখনকার এই লেখকেরা বিভিন্ন নবীর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বাণীর পরিবর্তন তো করেছেনই, অধিকন্তু, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ স্বার্থে নিজস্ব যুগের এবং পরিবেশের প্রয়োজনে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ব্যাপক অদল-বদল এমনকি সংযোজন ঘটাতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি।

কিন্তু, এসব নিরপেক্ষ ও গবেষণালব্ধ তথ্যের সাথে যদি অধুনা জনসাধারণের জন্য সম্প্রচারিত এবং বাইবেলের ভূমিকায় পরিবেশিত বিভিন্ন বক্তব্যের তুলনামূলক বিচার করা হয়, তা হলে কি দেখতে পাই? দেখতে পাই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র ও বক্তব্য। দেখা যাচ্ছে, বাইবেল রচনার এই ইতিহাস সম্পর্কে আধুনিক বাইবেলের ভূমিকা-লেখক কোনো কথা বলছেন না। বরং তিনি এমনসব দ্ব্যর্থবোধক বক্তব্য পেশ করছেন যা সহজেই পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে পারে। এছাড়াও, ভূমিকা-লেখক সঠিক তথ্য ও সত্যকে এমনভাবে ধামাচাপা দিয়ে অসম্পূর্ণভাবে এমনসব ভুল তথ্য তুলে ধরছেন যে, সেসব পাঠ করলে মনে হবে যেন, এরচেয়ে বড় সত্য আর কোনোটিই হতে পারে না।

শুধু একটি বা দু'টি বাইবেলে নয়, বিভিন্নসূত্রে প্রকাশিত বহু বাইবেলেই এই ধরনের বিভ্রান্তির ভূমিকা ও পরিচিতি সন্নিবেশিত রয়েছে। বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব পুস্তকই বেশ কয়েকবার করে সংশোধন ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হয়েছে (উদাহরণ, পেন্টাটেক বা তাওরাতের পঞ্চপুস্তক) এবং প্রতিবারই বর্জিত বিষয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওইসব বাড়তি বিষয় 'খুব সম্ভব পরবর্তী সময়ের সংযোজন'। বাইবেল-সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তকে আরো দেখা যাবে, গুরুত্বহীন কোনো বিষয় কিংবা অধ্যায় নিয়ে নানাকথা বলা হচ্ছে, কিন্তু যেসব সমস্যাসঙ্কুল বিষয় বা অধ্যায়ের জন্য বিস্তৃত আলোচনা ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন, সেগুলো সম্পর্কে পালন করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নীরবতা। আরো পরিতাপের বিষয়, এই ধরনের ভুল তথ্য ও অসত্য ভূমিকা ও পরিচিতি-সম্বলিত বাইবেল এখনো জনসাধারণের জন্য প্রচুর বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

তওরাত-এর পঞ্চপুস্তক

'তওরাত' শব্দটি সেমেটিক। গ্রীক ভাষায় 'তাওরাত' বলতে যা বোঝায় তা-ই ইংরেজিতে এসে হয়েছে পেন্টাটেক। এই শব্দটি মূলত গ্রীক। এর দ্বারা তাওরাতের প্রথম পাঁচটি পুস্তককে বোঝায়, যথা– (বাংলা বাইবেল অনুসারে) আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবিয় পুস্তক, গণনাপুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণ। ঊনচল্লিশটি খণ্ডে সংকলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচ খণ্ডে এই পুস্তক পাঁচটি স্থান পেয়েছে।

বিশ্বসৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে মিসরে ইহুদীদের নির্বাসনশেষে প্রতিশ্রুতভূমি কেনানে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত— আরো সোজাকথায়, হযরত মুসার (আঃ) মৃত্যুপর্যন্ত যাবতীয় ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে এসব পুস্তকে। এসব বিবরণে ইহুদীদের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতি ও নিয়মকানুন তুলে ধরা হয়েছে। এজন্য, এই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে তাওরাত বা আইনগ্রন্থ।

ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বহু শতাব্দী যাবত বিশ্বাস করে আসছেন যে, তাওরাতের লেখক হচ্ছেন স্বয়ং হযরত মুসা (আঃ)। এই বিশ্বাসের পেছনে সম্ভবত তাওরাতের সেইসব বাণী কাজ করছিল, যেসব বাণীতে হযরত মুসার (আঃ) নিজ হাতে লিখার প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন (যাত্রাপুস্তক ১৭, ১৪) : "এই কথা (আমালেকের পরাজয়) স্মরণার্থে পুস্তক লিখ।" ইহুদীদের মিসর থেকে যাত্রা প্রসঙ্গে অন্য স্থানে বলা হয়েছে : "মোশি (হযরত মুসা) সেই উত্তরণস্থানগুলোর বিবরণ লিখলেন।" (গণনাপুস্তক : ৩৩, ২) এবং সর্বশেষ : "পরে মোশি এ ব্যবস্থা লিখলেন।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩১, ৯) হযরত মুসা যে তাওরাতের এই পাঁচটি খণ্ড রচনা করেছিলেন, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর পূর্বপর্যন্ত সেই ধারণা সঠিক বলে প্রমাণ করার প্রয়াস অব্যাহত ছিল। ফ্লাভিয়াস জোসেফাস এবং আলেকজান্দ্রিয়ার ফিলো ছিলেন এই ধারণার সমর্থক।

একালে এ ধারণা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং তাওরাত যে হযরত মুসার রচনা নয়, এ বিষয়ে এখন আর কারো কোনো দ্বিমত নেই। এদিকে বাইবেলের নতুন নিয়মে (অর্থাৎ ইঞ্জিলে) পুরাতন নিয়মের, বিশেষত তাওরাতের

লেখক হিসেবে হযরত মুসার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রোমিওদের কাছে লিখিত একপত্রে (১০, ৫) লেবিয় পুস্তকের বরাত দিয়ে পৌল বলেছেন, "মোশি লিখেন, যে ব্যক্তি ব্যবস্থামূলক ধার্মিকতার অনুষ্ঠান করে" প্রভৃতি। যোহন তাঁর লিখিত সুসমাচারে (বাইবেল, নতুন নিয়ম, ৫, ৪৬-৪৭) স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, "কারণ যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করিতে, তবে আমাকেও বিশ্বাস করিতে, কেননা, আমারই বিষয়ে তিনি লিখেছেন। কিন্তু তাঁর লেখায় যদি বিশ্বাস না কর, তবে আমার কথায় কিরূপে বিশ্বাস করিবে?" এখানেই বাইবেলের বক্তব্য সংশোধন তথা সম্পাদনার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, কেননা, লিখার স্থলে এখানে যে গ্রীক শব্দটি (এপিসটিউট) ব্যবহৃত হয়, তা ছিল মূলগ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দের অনুরূপ। কিন্তু তার অর্থ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং, সুসমাচার রচয়িতা এখানে যীশুর মুখ দিয়ে হযরত মুসার লেখার সমর্থনে যে বক্তব্য পেশ করেছেন, তা সম্পূর্ণ অশুদ্ধ। পরবর্তী আলোচনা থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এই প্রমাণপঞ্জির জন্য ড. মরিস বুকাইলি জেরুজালেমের বাইবেল স্কুলের প্রধান ফাদার ডি ভক্স-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ১৯৬২ সালে তিনি জেনেসিস বা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের আদিপুস্তকের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এই অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি পেন্টাটেক বা পঞ্চপুস্তকের এক সাধারণ পরিচিতি পেশ করেন। তাঁর এই ভূমিকা-পরিচিতির বক্তব্য বিশেষভাবে যুক্তিসমৃদ্ধ। ফাদার ডি. ভক্স পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, "যীশু এবং তাঁর প্রেরিতগণ (সহচর বা সাহাবা) যে ইহুদী-ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন" বলে বলা হত, সে বক্তব্য মধ্যযুগের শেষপর্যায় পর্যন্ত নির্বিবাদে মেনে চলা হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে শুধু একজন ব্যক্তি এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। তিনি হলেন, এ্যাবেনেজরা। ষোড়শ শতাব্দীতে এসে কালস্ট্যাডট প্রথম প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, "দ্বিতীয় বিবরণীতে হযরত মুসার মৃত্যুর যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে (৩৪, ৫-১২), তা হযরত মুসার নিজের পক্ষে রচনা করা আদৌ সম্ভব নয়।' এরপর লেখক অন্যান্য সমালোচকের উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলেছেন, ওইসব সমালোচক স্বীকার না করে পারেননি যে, তাওরাতের পঞ্চপুস্তকের অন্তত একাংশ হযরত মুসার রচনা নয়। এ প্রসঙ্গে আর একজন প্রাচীন লেখকের বক্তব্য উল্লেখ না করে পারা যায় না। তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক, নাম রিচার্ড সাইমন। ১৬৭৮ সালে তিনি *'ক্রিটিক্যাল হিস্ট্রি অব দা ওল্ট টেস্টামেন্ট'* নামে এক পুস্তক প্রকাশ করে দেখিয়েছেন যে, তাওরাত বা পুরাতন নিয়মের এই পঞ্চপুস্তকের কোথায় কোথায় ঐতিহাসিক তথ্যের বিভ্রান্তিজনিত সমস্যা

বিদ্যমান; কোনো কোনো পরিচ্ছেদ পুনরাবৃত্তির দোষে দূষণীয়; কোনো কোনো কাহিনীতে রয়েছে গরমিল; এবং কোনো কোনো রচনায় রয়েছে ভাষাগত স্টাইলের ভিন্নতা। তদানীন্তন সময়ের খ্যাতিমান বাগ্মী রিচার্ড সাইমনের এই পুস্তকখানি প্রকাশের সাথে সাথে চারিদিকে তুমুল হৈচৈ পড়ে যায়। তবে হৈচৈ যতো তুমুল হোক, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রিচার্ড সাইমনের এই পুস্তকে প্রদত্ত যুক্তিসমূহ কিন্তু খুব কমই বাইবেলের ইতিহাস পুস্তকগুলোতে স্থান লাভ করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, সেকালে তাওরাতের প্রাচীনত্বের সূত্র টেনে প্রায়শই "হযরত মুসা লিখে গেছেন" বলে ধুয়া ওঠানো হত।

মূলত, যে কথার সত্যতা স্বয়ং যীশুখ্রিস্ট সাব্যস্ত করে গেছেন বলে বাইবেলের নতুন নিয়মে (ইঞ্জিল) উল্লিখিত রয়েছে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন যে কতোটা কঠিন তা সহজেই অনুমেয়। তবুও এই প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যাপারে অন্তত একজনকে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি হচ্ছেন পঞ্চদশ লুইয়ের চিকিৎসক জিন অস্ট্রক তিনিই প্রথম এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তমূলক যুক্তি পেশ করে গেছেন।

১৭৫৩ সালে *'কনজেকচার অন দা অরিজিন্যাল রাইটিংস হুইচ ইট এপিয়ার্স মোজেস ইউজড টু কমপোজ দি বুক অব জেনেসিস'* নামক এক আলোচনায় তিনি তাওরাতের পুস্তকসমূহের একাধিক উৎসের ওপর গুরুত্বসহকারে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সম্ভবত, এ বিষয়টি আরো অনেকের নজরে পড়ে থাকবে। কিন্তু, জিন অস্ট্রকই প্রথম তাঁর এই পর্যবেক্ষণ সাধারণ্যে প্রকাশের সাহস দেখিয়েছিলেন। এরমধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণটি ছিল এরূপ : বাইবেলের পুরাতন নিয়মের আদিপুস্তকে দু'টি আলাদা পাঠ বা রচনা পাশাপাশি স্থান লাভ করেছে। একটিতে আল্লাহ্‌কে উল্লেখ করা হয়েছে 'জোহোভা' বলে; অপরটিতে 'ইলোহিম' বলে। অর্থাৎ এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে, জেনেসিস বা আদিপুস্তক অন্তত দু'টি ভিন্ন রচনার সমাহার। এ্যাইহর্ন নামক অপর এক লেখকও তাঁর এক রচনায় (১৭৮০-১৭৮৩) তাওরাতের অপর চারটি পুস্তকের রচনাতেও এ ধরনের ভিন্নতা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেন। এরপর ইলজেন (১৭৯৮) নামক অপর এক লেখক তাঁর এক পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন যে, অস্ট্রক বাইবেলের যে পাঠটিকে আলাদা বলে উল্লেখ করে গেছেন,– সেখানে গড-কে বলা হয়েছে 'ইলোহিম'– সেই পাঠটিও দু'টি আলাদা পাঠের সমাহার। মূলত, তাওরাতের পঞ্চপুস্তক শাব্দিক অর্থেই বিচ্ছিন্ন রচনার সমাহার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের মূল উৎস সম্পর্কে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ চলে; এবং সুষ্ঠু বিচার-পরিচালনার

মাধ্যমে তাওরাত রচনার চারটি প্রধান ধারা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। যথা ঃ জেহোভিস্ট ধারা, ইলোহিস্ট ধারা, গণনাপুস্তকের ধারা এবং সেকেরডোটাল বা পুরোহিতদের রচনার ধারা। এমনকি এই গবেষণায় তাওরাতের এই বিভিন্ন ধারার রচনাকাল পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব হয়। যথা ঃ

১. জেহোভিস্ট ধারার রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে (জুদাহ্-তে এই ধারার পুস্তকগুলো রচিত)

২. ইলোহিস্ট ধারার পুস্তকগুলো রচিত হয় সম্ভবত এর কিছু পরে (এসব রচিত হয় ইহুদীদের রাজ্যে)।

৩. ডেটারোনমি বা গণনাপুস্তকের রচনাকাল কারো কারো মতে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী (ই. জ্যাকোব); আবার কারো কারো মতে যিশাইও নবীর সময় (ফাদার ডি ভক্স)।

৪. বাইবেলের যে অংশ পুরোহিতদের রচনা, সেই সেকেরডোটাল পাঠ বা ভার্সন রচনার সময়কাল ইহুদীদের নির্বাসনকালে কিংবা তৎপরবর্তী খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম বিশেষত তাওরাতের প্রথম পঞ্চপুস্তকের সংকলনকাল কমপক্ষে তিন শতাব্দী ধরে বিস্তৃত।

কিন্তু এখানেই সমস্যার অন্ত নয়। সমস্যা বরং ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছে। ১৯৪১ সালে এ. লড্স নামক এক গবেষক বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখান যে, তাওরাতের জেহোভিস্ট ধারার পুস্তকগুলো কমবেশি তিনজন লেখকের রচনা। অনুরূপভাবে, ইলোহিস্ট ধারার পুস্তক রচয়িতার সংখ্যা চারজন, গণনাপুস্তকের লেখকের সংখ্যা ছয়জন এবং সেকেরডোটাল সংস্করণের পুস্তকসমূহ কমবেশি নয়জন লেখকের রচনার সমষ্টি। ফাদার ডি ভক্স-এর মতে, পূর্বোক্তসংখ্যক লেখক ছাড়াও বাইবেলের এই পঞ্চপুস্তকের রচয়িতা হিসেবে আরো আটজন লেখকের সন্ধান পাওয়া গেছে। তদুপরি, সম্প্রতি গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, 'তাওরাতের পঞ্চপুস্তকে যেসব বিধি-বিধান ও আইনকানুনের উল্লেখ রয়েছে, এই বাইবেল ছাড়াও সেসব আইন-বিধানের অস্তিত্ব অন্যত্রও বিদ্যমান। শুধু তাই নয়, তাওরাতের পুরাতন নিয়মে এইসব আইনকানুন প্রণয়নের যে তারিখ উল্লিখিত রয়েছে, যেসব আইনকানুন প্রণীত হয়েছে তারো বহু আগে।" অনুরূপভাবে,

> "তাওরাতের পঞ্চপুস্তকের কাহিনীসমূহের পটভূমি শুধু ভিন্ন নয়; যে সূত্র থেকে এসব বাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, ওইসব সূত্রও বাইবেলের রচনাকালের বহু আগেকার।"

এইসব গবেষণা থেকে এভাবে "বাইবেল রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের ধারা গঠনের প্রশ্নে বাইবেল লেখকদের আরো বেশি আগ্রহ জাগ্রত করার উপাদান" খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এভাবে যতোই অনুসন্ধান চালানো হয়, দেখা যায়, সমস্যা ক্রমশ জটিলতর হয়ে দাঁড়ায় এবং গবেষকদের পক্ষে তখন "ছেড়ে দে-কেঁদে বাঁচি" বলে আর্তনাদ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

বাইবেলের এই পুরাতন নিয়মের রচয়িতার সংখ্যা অনেক বেশি বলেই সম্ভবত তাঁদের বক্তব্যে মিলের চেয়ে গরমিল বেশি। একইবিষয়ে পুনরাবৃত্তিও কম দেখা যায় না। ফাদার ডি ভক্স একের-পর-এক উদাহরণ তুলে ধরে দেখিয়েছেন, কিভাবে ইতিহাসের কাহিনী এলোমেলো হয়ে পড়েছে। বিশেষত, মহাপ্লাবনের প্রশ্নে, যোসেফ বা হযরত ইউসুফের চুরির ঘটনায়, মিসরে তাঁর দুঃসাহসিক কার্যাবলীতে— এমনকি একই চরিত্রের নামের প্রশ্নেও লেখকদের মতবিরোধ কত তীব্র। শুধু তাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা সম্পর্কে লেখকবর্গের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণী প্রদানের আলোকেও বাইবেলের রচনাবলীর মধ্যকার গরমিল প্রকট হয়ে ধরা পড়ে।

মোদ্দাকথা, তাওরাতের বিভিন্ন পুস্তক সন্দেহাতীতভাবে বিভিন্ন ঐতিহ্যভিত্তিক কাহিনীর সমাহার। অবশ্য, এ কথা মানতে হবে যে, লেখকেরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এসব ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়ে গেছেন এবং এসব কাহিনীকে তাঁরা পাশাপাশি সাজিয়ে কখনো-কখনো তাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর জন্যে নানা গল্প-কথা টেনে এনেছেন। এ কারণে তাঁরা এসব পুস্তকে অসম্ভব ও অগ্রহণযোগ্য বহুবিষয়ের অবতারণাও করেছেন। আর এতসব কারণেই আধুনিক গবেষকগণ এসবের সূত্র ও উৎস অনুসন্ধানকল্পে নিরপেক্ষ গবেষণা পরিচালনার জন্য এগিয়ে না এসে পারেননি।

তাওরাতের পঞ্চপুস্তকের পাঠ-সংক্রান্ত সমালোচনার ক্ষেত্রে বলা চলে যে, সম্ভবত এই পুস্তকগুলো মানুষের হাতে ধর্মগ্রন্থ সংশোধিত হওয়ার জলজ্যান্ত উদাহরণ। ইহুদীদের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে লোকমুখে শ্রুত কাহিনী অবলম্বনে এগুলো রচিত হয়েছিল এবং সেই অবস্থায় সেসব রচনার পরবর্তী বংশধরদের নিকট হয়েছিল হস্তান্তরিত। এভাবে খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর শুরুতে ইহুদীদের ঐতিহ্যগত কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয় তাওরাতের জেহোভিস্ট সংস্করণ। সৃষ্টির আদি থেকে বর্ণিত কাহিনী এতে স্থান লাভ করেছেন। 'মানুষের জন্য বিধাতার যে মহাপরিকল্পনা বিদ্যমান, সেই পরিকল্পনা কার্যকর করার ব্যাপারে ইহুদীদের ভূমিকার গুরুত্ব বর্ণনাই ছিল এসব কাহিনীর মুখ্য উপজীব্য।' (ফাদার ডি. ভক্স)

যাহোক, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেকেরডোটাল ভার্সন তথা পুরোহিতদের দ্বারা রচিত কাহিনীর মাধ্যমে তাওরাতের এই পঞ্চপুস্তকের রচনার কাজ সমাপ্ত হয় এবং এই শেষোক্ত রচনায় স্থানে স্থানে সন, তারিখ ও বংশ-তালিকা জুড়ে দিয়ে এই পুস্তককে যতোটা সম্ভব নির্ভুল হিসেবে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

এতুদ্‌সত্ত্বেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য ও পরিসংখ্যানের নিরিখে পুরোহিতদের রচিত এই সংস্করণটিতে বর্ণনাগত ভ্রান্তি অনেক বেশি। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাবের কাল এবং সৃষ্টির সূচনাকালীন পরিস্থিতিতে মানুষের মর্যাদা-সংক্রান্ত বর্ণনায় এসব ভ্রান্তি সুস্পষ্ট। তাওরাতের মূল গ্রন্থের অদল-বদল ঘটাতে গিয়েই যে এই ভ্রান্তি ঘটেছে, তা বলাই বাহুল্য।

ফাদার ডি ভক্স লিখে গেছেন, "পুরোহিতদের রচিত এই সংস্করণে ইহুদীদের নিজস্ব আইনগত বিধি-বিধানের সমর্থনে বিভিন্ন কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। যেমন : বিশ্বসৃষ্টির কর্মকাণ্ড শেষে বিধাতা কর্তৃক শনিবারে বিশ্রামগ্রহণ; হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীমের প্রতি আনুগত্য; ত্বকছেদন এবং ম্যাকপেলা গুহা ক্রয়ের মাধ্যমে ইহুদী যাজকদের কেনানে ভূসম্পত্তি লাভ" ইত্যাদি।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণযোগ্য যে, বাইবেলের এই সেকেরডোটাল সংস্করণটির সংকলনকাল ইহুদীদের ব্যাবিলনে নির্বাসন থেকে প্যালেস্টাইনে ফিরে আসা পর্যন্ত। অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ সাল থেকে এর সূচনা। এ কারণে বাইবেলের এই সংস্করণে নির্ভেজাল রাজনৈতিক সমস্যাও ধর্মীয় বিষয়ের সাথে জড়িয়ে গেছে।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের আদি পুস্তকটি যে তিনজন ভিন্ন লেখকের তিনটি আলাদা রচনার সমাহার, সেই অভিমত এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। ফাদার ডি ভক্স তাঁর অনূদিত ফরাসী বাইবেলের মুখবন্ধে এই আদিপুস্তকের কোন কোন পরিচ্ছেদ কার কার রচনা এবং কোন কোন আমলের রচনা, তার একটা তালিকাও তুলে ধরেছেন। আর সেই প্রামাণ্য-দলিলের আলোকে বাইবেলের কোন কোন অধ্যায়ের রচনায় কোন যুগের কোন কোন লেখকের কতোটা অবদান– তাও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, সৃষ্টিতত্ত্ব-সংক্রান্ত আলোচনা, মহাপ্লাবন এবং তৎপরবর্তী হযরত ইবরাহীমের আমল পর্যন্ত ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আদিপুস্তকের এগারোটি অধ্যায় জুড়ে এসব কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বর্ণনার কোন অংশ জেহোভিস্ট আমলের রচনা আর কোন অংশ সেকেরডোটাল আমলে রচিত তা রচনাভঙ্গির দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। যেমন ঃ

বাইবেলের আদিপুস্তকে জেহোভিস্ট ও সেকেরডোটাল পাঠের সংমিশ্রণ-এর ছক

অধ্যায়ের	বাক্যাংশ থেকে	অধ্যায়ের	বাক্যাংশ পর্যন্ত	পাঠ
১	(১)	২	(৪-ক)	সে
২	(৪-খ)	৪	(২৬)	জে
৫	(১)	৫	(৩২)	সে
৬	(১)	৬	(৮)	জে
৬	(৯)	৬	(২২)	সে
৭	(১)	৭	(৫)	জে
৭	(৬)	–	–	সে
৭	(৭)	৭	(১০)	জে পরিগৃহীত
৭	(১১)	–	–	সে
৭	(১২)	–	–	জে
৭	(১৩)	৭	(১৬-ক)	সে
৭	(১৬-খ)	৭	(১৭)	জে
৭	(১৮)	৭	(২১)	সে
৭	(২২)	৭	(২৩)	জে
৭	(২৪)	৮	(২-ক)	সে
৮	(২-খ)	–	–	জে
৮	(৩)	৮	(৫)	সে
৮	(৬)	৮	(১২)	জে
৮	(১৩-ক)	–	–	সে
৮	(১৩-খ)	–	–	জে
৮	(১৪)	৮	(১৯)	সে
৮	(২০)	৮	(২২)	জে
৯	(১)	৯	(১৭)	সে
৯	(১৮)	৭	(২৭)	জে
৯	(২৮)	১০	(৭)	সে
১০	(৮)	১০	(১৯)	জে
১০	(২০)	১০	(২৩)	সে
১০	(২৪)	১০	(৩০)	জে
১০	(৩১)	১০	(৩২)	সে
১১	(১)	১১	(৯)	জে
১১	(১০)	১১	(৩২)	সে

দ্রষ্টব্য : প্রথম ও তৃতীয় সংখ্যাটি অধ্যায়সূচক। বন্ধনীর মধ্যকার দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যাটি বাক্য বা বাক্যাংশসূচক। 'পাঠ'-এর ঘরে 'জে' বলতে জেহোভিস্ট পাঠ এবং 'সে' বলতে সেকেরডোটাল পাঠ বুঝতে হবে। যেমন : ছকের প্রথম লাইন : আদি পুস্তকের ১নং অধ্যায়ের ১নং বাক্যাংশ থেকে ২ নং অধ্যায়ের ৪-ক বাক্যাংশ পর্যন্ত সেরেডোটাল পাঠ।

দেখা গেছে, বাইবেলের প্রথম এগারোটি অধ্যায়ে ইলোহিস্ট আমলের কোনো রচনা স্থান পায়নি। এক্ষেত্রে, আদিসৃষ্টি থেকে হযরত নূহের আমলের কাহিনীর বর্ণনায় (অর্থাৎ প্রথম পাঁচটি অধ্যায় রচনায়) একটি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমে জেহোভিস্ট বর্ণনা এবং পরের বর্ণনা সেকেরডোটাল আমলের; এবং এভাবে শুরু থেকে শেষপর্যন্ত গোটা বর্ণনাকেই সাজিয়ে নেয়া হয়েছে। তদুপরি, মহাপ্লাবনের অধ্যায়ে বিশেষত সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে এসে একের-পর- এক প্রতিটি আমলের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এমন সংক্ষিপ্ত যে, কোনো বর্ণনা একবাক্যেই শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজি বাইবেল পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই পর্যায়ে কম-বেশি একশত লাইনের মধ্যে একেকটি আমলের রচনা ঘুরেফিরে এসেছে পরপর সতেরো বার। আর তাই, এখন বর্তমান আমলের বাইবেল পড়তে গিয়ে— দেখা যায়, গোটা বর্ণনা কিভাবে যতসব অসম্ভব ও পরস্পরবিরোধী কাহিনীতে পূর্ণ।

ঐতিহাসিক পুস্তকাবলী

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের ঐতিহাসিক পুস্তকগুলো (বাংলা বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ-এর পরবর্তী পুস্তকসমূহ দ্রষ্টব্য) মাধমে ইহুদীদের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এই ইতিহাসের বিস্তার প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডে তাদের আগমন (খুব সম্ভব খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকের ঘটনা) থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলনে তাদের নির্বাসন পর্যন্ত।

এই পুস্তকগুলোতে যেসব ঘটনার উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যে-কোনো বিচারে তা ইহুদীদের নিজস্ব 'জাতীয় ঘটনাবলী' ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এখানে এসব ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার উদাহরণ হিসেবে।

যাহোক, এসব পুস্তকের বর্ণনায় ঐতিহাসিক সত্যতার কোনো ধার ধারা হয়নি। যেমন, এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত ইশাইয়া পুস্তকটি প্রথমত ও প্রধানত সংকলিত হয় ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রচারের উদ্দেশ্যে। এই পর্যায়ে এই

স্ববিরোধিতাকে সামনে রেখেই ই. জ্যাকোব তাঁর পুস্তকে আরো একটি বৈপরিত্যের উদাহরণ তুলে ধরেছেন। তাহল, জেরিকো এবং আই-এর কল্পিত ধ্বংসের ঘটনা— যারমধ্যে প্রকৃত ঘটনার সাথে বর্ণনার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া দুস্কর।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের 'বিচারকর্তৃগণ পুস্তকে'র প্রধান বিষয়বস্তু হল শত্রু পরিবেষ্টিত মনোনীত ব্যক্তিদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) পক্ষ সমর্থন করা; এবং এই মর্মে বক্তব্য রাখা যে, আল্লাহ্ই তাদের সমর্থন দিচ্ছেন। ফাদার এ লেফেভার তাঁর 'ক্রাম্পন বাইবেলের' মুখবন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকেই এই মন্তব্য করেছেন যে, বাইবেলের এই 'বিচারকর্তৃগণ' পুস্তকটি বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে। বাইবেলের বিভিন্ন ভূমিকা ও পরিশিষ্ট এর বড় প্রমাণ। রুথের কাহিনীটি যে এই পুস্তকের বর্ণনার সাথে জোড়াতালি দেয়ার মত করে জুড়ে দেয়া হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

'শ্যামুয়েল পুস্তক' এবং 'রাজাবলী পুস্তক' দুটি মোটের উপর শ্যামুয়েল ও সৌল এবং ডেভিড ও সলোমনের (হযরত দাউদ ও হযরত সোলায়মান) জীবন-বৃত্তান্তের সংকলন ছাড়া আর কিছু না। কিন্তু পুস্তকগুলোতে ইতিহাসের সত্যতা কতটা সংরক্ষিত হয়েছে তা বিতর্কের ব্যাপার। ই. জ্যাকোব এসব পুস্তকের বহু ভ্রান্তি নির্দেশ করেছেন। তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, কোনো ঘটনার দুটি, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনটি পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া গেছে। ইলিয়াস, এলিশা ও ইশাইয়া প্রমুখ নবীর কাহিনীও এই পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সে বর্ণনায় ইতিহাস আর উপকথা একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। অথচ, এ বিষয়ে অপরাপর ভাষ্যকারদের মতই ফাদার এ. লেফেভারের মন্তব্য, "এইসব পুস্তকের ঐতিহাসিক যে গুরুত্ব তা নাকি একেবারে মৌলিক!"

'বংশাবলী পুস্তক'—'১ ও ২ 'ইয্রা পুস্তক' এবং 'নহিমিয় পুস্তক' কয়টির লেখক কিন্তু একই ব্যক্তি। বংশাবলী-বিশারদ হিসেবে পরিচিত এই লেখক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এসব পুস্তক রচনা করেন। তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের ইতিহাস থেকে শুরু করে তাঁর সময়কাল পর্যন্ত ইতিহাস রচনা করেছিলেন। অবশ্য, তাঁর রচনায় ইহুদী রাজবংশের তালিকা হযরত দাউদ পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়েছে। মূলত, তিনি তাঁর রচনায় অন্য অনেককিছুর সাথে শ্যামুয়েল পুস্তক ও রাজাবলী পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাবলী ব্যবহার করেছেন নির্বিচারে : "তিনি সেসব শুধু নকল করেই গেছেন; সেসবের মধ্যে যে অসঙ্গতি ছিল, তা কিন্তু লক্ষ্য করেননি।" (ই. জ্যাকোব) এতদ্সত্ত্বেও একটি কথা স্বীকার করতে হবে যে, এই লেখক তাঁর পুস্তকের বর্ণনা পুরাকীর্তি ও ধ্বংসাবশেষের সাথে মিলিয়ে নিয়ে সেসবের একটি

সঠিক রূপ দেয়ার প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। অবশ্য, এসব রচনায় ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আইনকানুনের স্বার্থে ইতিহাসকে সযত্নে 'সংশোধন' করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ই. জ্যাকোবের মন্তব্য ঃ "এই লেখক বহুক্ষেত্রে ইতিহাস রচনা করেছেন ধর্মীয় বিধি-বিধানের প্রয়োজন পূরণের জন্য।" প্রসঙ্গত, এই লেখক রাজা মনঃশি-র যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তার সূত্র টেনে ই. জ্যাকোব বলেছেন : "লেখকের বর্ণনামতে, এই রাজা ছিলেন পরম ধার্মিক এবং ন্যায়বিচারক। তাঁর রাজত্বকাল ছিল সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধপূর্ণ। রাজা মনঃশি আসিরিয়ায় অবস্থানকালে স্রষ্টার সাথে কথোপকথন করেছিলেন বলেও লেখক উল্লেখ করেছেন। (বংশাবলী, ২-৩৩/১১) কিন্তু লেখক যা-ই বলুন না কেন, বাইবেলের অন্যত্র কিংবা বাইবেলের বাইরে অন্যকোনো সূত্রে এই রাজা সম্পর্কে কোথাও কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না।" 'ইষরা পুস্তক' এবং 'নহিমিয় পুস্তক' দু'টিকেও একইভাবে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ, আর কিছুই নয়। দু'টি পুস্তকেই গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে বাগাড়ম্বর করা হয়েছে এবং এই দুই পুস্তকে যে সময়ের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) সে সময়কার কোনো ঘটনা সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। তাছাড়া, বাইবেলের বাইরে এসব ঘটনার প্রামাণ্য-দলিলও তেমন কিছু নেই।

একইভাবে টোবিট, জুডিথ ও ইস্টের পুস্তক তিনটিকেও ঐতিহাসিক পুস্তকের পর্যায়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এসব পুস্তকে ইতিহাসের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে লেখকেরা স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের নাম পর্যন্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন নতুন ঘটনা ও চরিত্রের আমদানি করা হয়েছে। আর এসব কিছুই করা হয়েছে ধর্মের নামে। প্রকৃতপক্ষে, এসব কাহিনীতে ইতিহাসের নাম করে যতসব অসত্য ও অসম্ভব ঘটনা এমনভাবে ঢোকানো হয়েছে, যেন গল্প পড়ে পাঠক নীতিকথা বা হিতোপদেশ পেতে পারে।

বাইবেলের ম্যাক্কাবিস পুস্তকখানি অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। এ পুস্তক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংঘটিত ঘটনাবলী স্থান লাভ করেছে। এসব বর্ণনায় এই সময়ের ইতিহাসের সত্যতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে সত্য ঘটনার বৃত্তান্ত হিসেবে এই পুস্তকের গুরুত্ব অনেক।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে বাইবেলে বর্ণিত ঐতিহাসিক পুস্তকাবলী অনেকাংশে ভিত্তিহীন। এসব পুস্তকে ইতিহাস যেমন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের প্রতিদ্বন্দ্বী; তেমনি কোনো কোনো কাহিনী ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়।

বিভিন্ন নবীর কিতাবসমূহ

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন নবীর শিক্ষার সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি পুস্তক স্থান লাভ করেছে এবং এসব পুস্তককে হযরত মুসা, শ্যামুয়েল, ইলিয়াস, এলিশা প্রমুখ প্রাথমিক যুগের বড় বড় নবীর বিবরণী থেকে আলাদাভাবে স্থান দেয়া হয়েছে। এসব পুস্তকে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের বিবরণী তুলে ধরা হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর বিবরণী পাওয়া যায় আমোষ, হোশেয়, যিমাইয় এবং মিখাই পুস্তকে। আমোষ নবী সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধাচরণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পক্ষান্তরে, হোশেয় নবীর সময় ধর্মের নামে দুর্নীতি চরমে পৌঁছেছিল। হোশেয় নবী নিজেও দুর্নীতিবাজদের কবলে নিপতিত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনে চরম অশান্তি ভোগ করেন (প্যাগানদের এক ধর্মীয়-বেশ্যাকে বিয়ে করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন)। শত অত্যাচার সত্ত্বেও আল্লাহ্ যেমন তাঁর বান্দাদের ক্ষমা করেন, তেমনি অনুসারীরা অধঃপতনের নিম্নস্তরে নিপতিত হয়ে তাঁকে অশেষ দুঃখ দিলেও হোশেয় নবী তাদের ভালবাসা দিতে দ্বিধা করেননি। যিশাইয়া (ইশাইয়া) ছিলেন রাজনীতিবিদ এবং এক ঐতিহাসিক চরিত্র। রাজ-রাজড়ারা তাঁর থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন; এবং দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপরও তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল। নবী হয়েও তিনি সবসময় জাঁকজমকের সাথে জীবনযাপন করতেন। তাঁর অনুসারিগণ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত কার্যাবলীর বিবরণী এবং তাঁর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বাণীসমূহ সংকলনও প্রকাশ করে গেছেন। এসব বিবরণী ও বাণীর মধ্যে অসাম্যের বিরোধিতা, আল্লাহ্র বিচারকে ভয় করে চলা, নির্বাসন অবস্থায় প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ও পরবর্তী পর্যায়ে ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে প্রত্যাবর্তন উল্লেখযোগ্য। এই ঘোষণাপত্র ও প্রত্যাবর্তন-সংক্রান্ত বিবরণী থেকে একটি বিষয় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যিশাইয়া নবীর নবুয়তি-কার্যক্রম ছিল তখনকার ইহুদীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমান্তরাল। যিশাইয়া নবীর সমসাময়িক আরেকজন নবী ছিলেন মিখা; তাঁরও কাজকর্ম ছিল একইধরনের।

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন সফনিয়, জিরমিয়, নহূম ও হবককুম নবী। এঁরা প্রত্যেকে ধর্মবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। জিরমিয় নবী শহীদ হন। তাঁর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বাণীসমূহ বারুচ বা বারুখ কর্তৃক সংকলিত হয়। এই বারুখই ছিলেন সম্ভবত বাইবেলের বিলাপ পুস্তকের রচয়িতা।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরুতেই ইহুদীরা ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়। তখন তাদের নবী ছিলেন এজেকেল (বাংলা বাইবেলে যিহিস্কেল)। নবী এজেকেল সেই দুর্দিনে ইহুদীদের সান্ত্বনা দান করতেন। তাদের মনোবল চাঙ্গা রাখতেন। যেভাবে তিনি নবুয়ত লাভ করেছিলেন, সেই দৃশ্যের বর্ণনা বাইবেলে বিখ্যাত হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, বাইবেলের ওবদিয় পুস্তকে অধিকৃত জেরুজালেমের বাসিন্দাদের দুর্দশার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দে ইহুদীদের নির্বাসনকাল শেষ হয়। তখনই শুরু হয় হগয় ও সখরিয়া নবীর (হযরত জাকারিয়া) নবুয়ত। তাঁরা উভয়েই জেরুজালেমের উপাসনালয় পুনঃর্নির্মাণের জন্য ইহুদীদের প্রতি আবেদন জানান। এই উপাসনালয়ের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হওয়ার পরে ঘটনা মালাখি পুস্তকে রয়েছে। মালাখি রচিত এই পুস্তকে আরো লিপিবদ্ধ রয়েছে আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্রত্যাদেশ বাণীসমূহ।

যোনা (হযরত ইউনুস) পুস্তক যে কিভাবে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে স্থান পেল, তা অনেকের নিকট বিস্ময়ের ব্যাপার। কেননা, এই পুস্তকে অন্যান্য নবীর প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত পুস্তকের মতো বাণী বা বক্তব্য-সম্বলিত কোনো রচনা নেই। যোনা পুস্তক প্রকৃতপক্ষে একটি কাহিনী মাত্র : স্রষ্টার ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার কথাই এই কাহিনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত দানিয়েল পুস্তকখানি হিব্রু, আরামীয় এবং গ্রীক এই তিনটি ভাষায় রচিত হয়। খ্রিস্টান ভাষ্যকারদের মতে, ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এ পুস্তকখানিকে 'অসময়ের অসংলগ্ন প্রকাশ' ছাড়া কিছুই বলা যায় না। সম্ভবত, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ম্যাকাবিয়ান আমলে এটি রচিত হয়ে থাকবে। ইহুদীরা যখন 'ন্যক্কারজনক' অবস্থায় পড়ে 'হতাশার অতলে' তলিয়ে যাচ্ছিল, তখন লেখক এই পুস্তকের মাধ্যমে তাদের মধ্যে বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি ইহুদীদের এই আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিলেন যে, মুক্তির মুহূর্ত সমাগত।— (ই. জ্যাকোব)

গীত-সংহিতা ও হিতোপদেশ পুস্তক

এই দুই পুস্তক মূলত অতুলনীয় সাহিত্যকীর্তি। 'গীত-সংহিতার' সর্বোত্তম অধ্যায় হচ্ছে 'সাম' বা স্রষ্টার প্রশংসাগীতি। এটি হিব্রু কবিতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মিনার বিশেষ। এই গীত-সংহিতার বেশিরভাগ কবিতা বা সঙ্গীত হযরত দাউদের রচনা; বাকিগুলো রচিত যাজক ও পুরোহিতদের দ্বারা। এসব গীতি-কবিতার বিষয়বস্তু হচ্ছে স্রষ্টার প্রশংসা, প্রার্থনা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণ। উপাসনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এসব সঙ্গীত গাওয়া হত।

'ইয়োব পুস্তক', 'হিতোপদেশ' ও 'উপদেশক'— এই পুস্তক তিনটি মোটামুটিভাবে চমৎকার : সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ থেকে ৫০০ অব্দে এগুলো রচিত হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জেরুজালেমের পতনের উপরে ভিত্তি করে রচিত 'বিলাপ পুস্তক' খুব সম্ভব জিরমিয় নবীর আমলের রচনা।

এই প্রসঙ্গে 'পরমগীত পুস্তকের'ও উল্লেখ করতে হয়। অলংকারবহুল ভাষায় রচিত এই 'পরমগীত'-এর বিষয়বস্তু প্রধানত স্রষ্টার প্রেম। 'উপদেশক' পুস্তক হচ্ছে, হযরত সোলায়মান এবং তাঁর দরবারের কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি ও কিছুসংখ্যক পুরোহিতের উপদেশবাণীর সংকলন। একলেসিয়াটস বা কোহ্‌লেথ পুস্তকে বিজ্ঞজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পার্থিব সুখ-শান্তির অসারতা তুলে ধরা হয়েছে।

সুতরাং, বাইবেলের পুরানো নিয়মের গোটা অংশটাতেই দেখা যায় কমপক্ষে সাতশত বৎসর ধরে নানাজনের লিখিত এমনসব অসম ও অসংলগ্ন রচনার সমাহার, যার তুলনা অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এখানে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কিভাবে এ ধরনের বহু পুস্তকের একটি সংকলন বহু শত বৎসর যাবত একটি অচ্ছেদ্য অখণ্ড পুস্তক হিসেবে টিকে থাকতে পারল? এবং সম্প্রদায়গতভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন সংস্করণে কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা গেলেও এই সংকলনটিই বা কিভাবে ইহুদী ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তক হিসেবে চালু হলো? উল্লেখ্য যে, দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতা এই পুস্তকের মূল সুর

বলেই বাইবেলকে গ্রীক ভাষায় বলা হয়, 'কানুন' বা প্রামাণ্য বিধান : সে বিধান সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন চলে না।

বাইবেলের পুরানো নিয়মের মধ্যে বিভিন্ন অসংলগ্ন পুস্তকের এই যে সমাহার, এই সমাহার তথা সংকলন কিন্তু খ্রিস্টান আমলের নয়, বরং ইহুদীদের আমল থেকেই এই বাইবেল চালু রয়েছে। খুব সম্ভব খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রাথমিকভাবে এই বাইবেল সংকলিত হয়ে সাধারণের ধর্মপুস্তক হিসেবে পরিগৃহীত হয়েছিল। পরবর্তী পুস্তকসমূহ সংযুক্ত হয়েছিল আরো পরে। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রথম পঞ্চপুস্তক— যা তাওরাত বা পেন্টাটেক নামে পরিচিত, সেই পাঁচটি পুস্তকের মর্যাদা সবসময়ই ছিল সর্বোচ্চ। পরবর্তী পর্যায়ে কোনো নবীর ভবিষ্যদ্বাণী (যথা ঃ অপরাধপূর্ণ কাজের জন্য শাস্তি প্রাপ্তির ভবিষ্যদ্বাণী) যখন পূর্ণ হয়েছিল, তখন তার বিবরণীও পূর্বোক্ত গৃহীত পুস্তকগুলোর সাথে অনায়াসে সংযুক্ত হতে পেরেছিল। তাছাড়া, যেসব নবী আশার বাণী শুনিয়ে সফল হন, তাঁদের বিবরণীও সম্ভবত একইভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকবে। এভাবে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেই নবীদের 'কানুন'-সম্বলিত এই বাইবেল সংকলনের কাজটি সমাধা হয়।...

ইহুদীদের দ্বারা সংকলিত হলেও এই বাইবেল খ্রিস্টানদের দ্বারা গৃহীত হয় এবং ধর্মীয় দিকদিয়েও এ বিষয়ে তেমন কোনো অসুবিধা দেখা দেয়নি। কিভাবে এই ইহুদী-বাইবেল খ্রিস্টধর্মে পরিগৃহীত হয়েছিল, সে ব্যাপারে কার্ডিন্যাল ডানিয়েল প্রমুখ আধুনিক লেখক সবিশেষ গবেষণা চালিয়ে গেছেন। আদিতে খ্রিস্টধর্ম ছিল ইহুদী ধর্মেরই সম্প্রসারিত রূপ। তখন খ্রিস্টধর্ম পরিচিত ছিল 'জুডিও-ক্রিশ্চিয়ানিটি' নামে। খ্রিস্টধর্মের উপর পৌলের প্রভাব বিস্তারের পূর্ব পর্যন্ত সেই জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান সমাজ বাইবেলের এই পুরাতন নিয়মকে নিজেদের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল। বাইবেলের নতুন নিয়মের (ইঞ্জিল) লেখকগণও এই পুরাতন নিয়মের প্রতি ছিলেন সবিশেষ অনুগত। যদিও খ্রিস্টান সমাজ পরবর্তীকালে 'এ্যাপোক্রাইফা' নামের বাহানায় নিজেদের সুসমাচারগুলোকে 'ঢেলে সাজাতে' কার্পণ্য করেনি; তবুও বাইবেলের এই পুরানো নিয়মের পুস্তকসমূহের বেলায় তেমন কোন বর্জন বা সংশোধনের গরজ তাদের মধ্যে দেখা যায়নি; এর সবকিছু, মানে— প্রায় সবকিছুই তারা গ্রহণ করেছিল বিনাদ্বিধায়।

মূলত, মধ্যযুগ শেষ হওয়ার আগে অন্য কোনো জায়গায় তো বটেই, এমনকি পাশ্চাত্য জগতেও কার এমন বুকের পাটা ছিল যে, বাইবেলের এই অসম ও অসংলগ্ন সংকলন-কর্মের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করতে পারে?

এ প্রশ্নের জবাব একটিই। আর তা হলো— তেমন কেউ ছিলেন না : তেমন কাউকে প্রায় পাওয়াই যায় না। মধ্যযুগ শেষ হয়ে আধুনিক যুগ যখন শুরু হলো, দেখা গেলো, একজন-দু'জন করে সমালোচক এগিয়ে আসছেন। কিন্তু গির্জার কর্মকর্তারা নিজস্ব পন্থায় তাঁদের স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। সন্দেহ নেই যে, অধুনা কিছুসংখ্যক খাঁটি সমালোচক বাইবেলের বাণী সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনা অব্যাহত রেখেছেন। পক্ষান্তরে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, এক শ্রেণীর ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ সমালোচনার নামে বাইবেলের খুঁটিনাটি বিচার-বিশ্লেষণে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন ঠিকই; কিন্তু যেসব বিষয়কে তাঁরা বিনয়ের সঙ্গে জনগণের জন্য 'দুর্বোধ্য' বলে রায় দিচ্ছেন, সেইসব অসম ও অসংলগ্ন বিষয়ের গভীরে যেতে তাঁরা মোটেও রাজি হচ্ছেন না। বিজ্ঞানের আলোকে ওইসব জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচনে তাঁদের কাউকে এগিয়ে আসতেও দেখা যাচ্ছে না। যেসব ক্ষেত্রে আদর্শগত বিচারে বাইবেলের বর্ণনা ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেসব জায়গায় তাঁরা বাইবেলের বক্তব্যকে ইতিহাসের সমান্তরালে এনে সুপ্রতিষ্ঠিত করছেন ঠিকই, কিন্তু এ যাবত তাঁরা কেউই কোনো বিশদ ও খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে বাইবেলের বর্ণনার তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণে এগিয়ে আসেননি। তাঁদের এই এগিয়ে না-আসার কারণ আর কিছুই নয়, একটা বিষয় তাঁরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, এতোকাল যাবত যদিও বাইবেলের বর্ণনা তর্কাতীতভাবে গৃহীত হয়ে এসেছে, তথাপি, এখন যদি এ ধরনের বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ পরিচালিত হয়, তবে ইহুদী ও খ্রিস্টান সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত এই ধর্মগ্রন্থটির সত্যতা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে প্রশ্ন না জেগে পারবে না।

বিজ্ঞানসংক্রান্ত বক্তব্য বাইবেলের পুরানো নিয়মে খুবই কম। সেজন্য, যেসব বিষয়ে বাইবেলের পুরানো ও নতুন নিয়মের বর্ণনার সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিরোধ দেখা যায়, সে ধরনের বিষয়ের সংখ্যাও খুব বেশি নয়। কিন্তু, যত কমসংখ্যকই হোক, বিজ্ঞানের সাথে বাইবেলের এই বিরোধ ও অসংগতির গুরুত্ব সত্যিই অপরিসীম।

বাইবেলের বর্ণনায় ইতিহাসগত ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রচুর বলা অনাবশ্যক যে, পূর্বোক্ত ইহুদী ও খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ স্বভাবগত প্রবণতায় বাইবেলের এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতির গুরুত্ব কম করে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন।

কেননা, তাঁদের মতে, বাইবেলের পুণ্যবান রচয়িতাবৃন্দ ধর্মীয়-তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে ইতিহাসকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে এবং ধর্মীয় কোনো প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে ইতিহাসকে তুলে ধরতে গিয়ে যদি কোনো ভুল-ত্রুটি করেই থাকেন, তবে সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো নাকি অস্বাভাবিক না হওয়ারই কথা!

যুক্তির বিচারে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন অংশ থেকে বিপুলসংখ্যক অসংগতি ও অবাস্তব বিষয় চিহ্নিত করা সম্ভব। আদিতে সম্ভবত মূল বাইবেলের কোনো ঘটনার মাত্র দু'-একটি ভিন্ন পাঠ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে সেই একই বিষয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত বহু লেখকের রচনা বাইবেলে সন্নিবেশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাইবেলের রচনাসমূহ বহুবারই নানাভাবে সংশোধন করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেইসব সংশোধিত পাঠও বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। অনেকে অনেক ক্ষেত্রে বাইবেলের বিভিন্ন বর্ণনার টীকা অথবা ভাষ্য রচনা করেছেন। পরবর্তী সময়ে যখন নতুন কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তখন, সেই টীকাভাষ্যগুলোও মূল রচনার অংশ হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এইসব সংশোধনী ও সংযোজনা অধুনা বাইবেল-বিশেষজ্ঞবৃন্দ সহজেই সনাক্ত করে নিতে পারছেন। শুধু তাই নয়, বাইবেলের কোনো অংশ কখন কার দ্বারা রচিত হয়েছিল, তাও তাঁদের পক্ষে চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে।

উদাহরণস্বরূপ, বাইবেলে পুরাতন নিয়মের পেন্টাটেক বা পঞ্চপুস্তক (তাওরাত) অধ্যায়ের কথা বলা যেতে পারে। ফাদার ডি ভক্স তাঁর অনূদিত বাইবেলের আদিপুস্তকের (জেনেসিস) ভূমিকায় (পৃষ্ঠা, ১৩-১৪) এ ধরনের বহুসংখ্যক ভিন্ন-পাঠের কথা উল্লেখ করেছেন। উপস্থিতক্ষেত্রে সেসব উদ্ধৃতি প্রদান থেকে আমরা বিরত রইলাম।

যাহোক, এসব উদাহরণ ও বিশ্লেষণ থেকে যেকোনো পাঠকের মনে স্বভাবতই যে ধারণার সৃষ্টি হয়, তাহলো, বাইবেলের কোনো রচনাকেই শাব্দিক অর্থে— অন্যকথায়, বর্ণে বর্ণে গ্রহণ করার উপায় নেই। এখানে, একটি নমুনা পেশ করা হল ঃ

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের আদিপুস্তক (৬, ৩) রয়েছে, মহাপ্লাবনের ঠিক আগেভাগে আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন যে, অতঃপর মানুষের আয়ুষ্কাল একশত কুড়ি বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে : "পরন্তু তাহাদের সময় একশত বিংশতি বৎসর হইবে।" কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই আদিপুস্তকেই দেখা যায়, (১১, ১০-৩২) হযরত নূহের দশজন বংশধরের অনেকেই ১৪৮ থেকে ৬০০ বৎসর পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন। দুই বক্তব্যের মধ্যে এই যে অসঙ্গতি, এ ধরনের অসঙ্গতি প্রচলিত বাইবেলে রয়েছে অনেক। কিন্তু কেন যে এই অসঙ্গতি, তার অন্তরালবর্তী ব্যাখ্যাটিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, আদি পুস্তকের পূর্বোক্ত প্রথম বক্তব্য-সম্বলিত অধ্যায়টি (৬, ৩) জেহোভিস্ট আমলের রচনা। এই রচনার সময়কাল, যতটুকু জানা গেছে খুব সম্ভব খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দী। পক্ষান্তরে, সঙ্গতিহীন দ্বিতীয় বক্তব্য-সম্বলিত অধ্যায়টি (বাইবেল, আদিপুস্তক ১১, ১০-৩২) তার অনেক পরের রচনা (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর) : আর এটি রচিত হয়েছিল সেকেরডোটাল আমলে। মূল রচনায় বংশ-তালিকা এবং মানুষের আয়ুষ্কালের সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সম্ভবত ছিল, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের হাতে পড়ে সেই তথ্য ও পরিসংখ্যানের অবস্থার হয়েছে এই দুর্দশা!

বাইবেলের এই আদিপুস্তকে আরো এমনসব বিবরণ পাওয়া যায় যা আধুনিক বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য-প্রমাণের সাথে সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, এখানে তিনটি বিষয়ের আলোচনা তুলে ধরা হল ঃ

১. বিশ্বসৃষ্টি এবং তার বিভিন্ন পর্যায়;

২. বিশ্বসৃষ্টির তারিখ ও পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময়কাল; এবং

৩. মহাপ্লাবনের বর্ণনা।

ফাদার ডি ভক্স তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মের আদিপুস্তকের শুরুতেই 'বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে দু'টি ভিন্ন ধরনের বক্তব্য পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে।' আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সত্য ও তথ্য-প্রমাণের সাথে বাইবেলের এই বর্ণনার অসঙ্গতি কোথায়, তা নির্ণয়ের সুবিধার্থে পূর্বোক্ত দু'টি বর্ণনারই পৃথক পৃথক আলোচনা তুলে ধরা হল ঃ

বর্ণনাসমূহ

বাইবেলের আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায় জুড়ে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে বিশ্বসৃষ্টির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এরচেয়ে অসত্য বর্ণনা আর হয় না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণের সুবিধার্থে এখানে একটি একটি করে অনুচ্ছেদ গ্রহণ করা হল। উদ্ধৃতিসমূহ বাইবেলের রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন (১৯৫২) (ডব্লিউ. এম. কলিন্স অ্যান্ড সন্স, ব্রিটিশ অ্যান্ড ফরেন বাইবেল সোসাইটি) থেকে গৃহীত।

"আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন।" —অধ্যায় ১, বাণী ১ ও ২ ঃ

স্বীকার করে নিতে অসুবিধা নেই যে, পৃথিবী সৃষ্টির আগে এখন আমরা যাকে বিশ্ব বলছি, তা অন্ধকারে আবৃত ছিল। কিন্তু তখন পানির অস্তিত্ব ছিল বলে বাইবেলে যা উল্লেখ রয়েছে, তা নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বসৃষ্টির সূচনায় গ্যাসজাতীয় বায়ুবীয় পদার্থের অস্তিত্বের যথার্থ প্রমাণ বিদ্যমান। এই অবস্থায় সেখানে পানির অস্তিত্ব থাকার কথা ভুল ছাড়া কিছু নয়।

> "পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন। আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।" — বাণী ৩ থেকে ৫

যে আলোক আকাশ ও জমিন জুড়ে বিস্তৃত, তা নক্ষত্রমণ্ডলীর জটিল প্রক্রিয়ার পরিণতি। বাইবেলের বর্ণনামতে, বিশ্বসৃষ্টির এই পর্যায়ে তখনও নক্ষত্র সৃষ্টি করা হয়নি ঃ আদিপুস্তকে ১৪নং বাণীর আগে আকাশমণ্ডলীর এই 'দীপ্তি' অর্থাৎ, সূর্যসৃষ্টির কথা বলা হয়নি। এই বাণী অনুযায়ী সূর্য সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বসৃষ্টির চতুর্থ দিবসে। দিবসকে রাত্রি থেকে পৃথক এবং পৃথিবীর উপরে আলো

প্রদান ইত্যাকার বর্ণনা মোটামুটি সঠিক। কিন্তু যেখানে আলোর উৎস (সূর্য) সৃষ্টি করা হয়েছিল বিশ্বসৃষ্টির তিনদিন পর, সেখানে সূর্য সৃষ্টির আগে— বিশ্বসৃষ্টির প্রথমদিনেই পৃথিবীতে আলো ছড়িয়ে পড়ার বর্ণনা একান্তভাবেই যুক্তিহীন। কেননা, এখানে কোনো 'কারণ' ছাড়াই 'কার্য' সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া, সূর্যহীন প্রথম দিবসেই সকাল ও সন্ধ্যার অস্তিত্ব নিছক কল্পনার বস্তু। কেননা, পৃথিবীকে তার প্রধানতম নক্ষত্র সূর্যের মণ্ডলে নিয়ে এসে তার আহ্নিক গতি তথা সূর্যকেন্দ্রিক আবর্তন সম্ভব করা হলেই শুধু দিবস পাওয়া যাবে; আর শুধু তখনই সম্ভব হবে সকাল ও সন্ধ্যার উপস্থিতি। তাই নয়কি!

> "পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক ও জলকে দুইভাবে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন, তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।" – বাণী ৬ থেকে ৮ ঃ

এখানেও পানির অস্তিত্বের সেই অলীক বক্তব্য টেনে আনা হয়েছে। সেইসঙ্গে সেই পানিকে দুই ভাগে ভাগ করে একভাগ আকাশমণ্ডলে আর এক ভাগ পৃথিবীতে প্রবাহিত করার কথা বলা হয়েছে। পানিকে এভাবে দ্বিধাবিভক্ত করার কাল্পনিক বক্তব্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

> "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নিস্থ সমস্ত জল একস্থানে সংগৃহীত হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল। তখন, ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন। আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, তাহা উত্তম। পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি, তৃণ বীজোৎপাদক ঔষধি ও সবিজ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ, ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলত ভূমি-তৃণ, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বীজোৎপাদক ঔষধি ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সবিজ ফলের উৎপাদক, বৃক্ষ, উৎপাদন করিলো, আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে-সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।" –বাণী ৯ থেকে ১৩ ঃ

পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসে দেখা যায়, মহাদেশসমূহ পানি থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে। এক্ষেত্রে, বাইবেলের বর্ণনা তাই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যেখানে বলা হয়েছে যে, পরিকল্পিতভাবে গাছপালা, ঘাস-আগাছা, সজি ইত্যাদি গজিয়ে উঠেছে এবং তাদের বীজ থেকে পুনরায় চারা হচ্ছে, সে বক্তব্য কোনোক্রমেই সত্য বলে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, সূর্যের আলো ছাড়া এই সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। (বাইবেলের এই আদিপুস্তকেই বলা হয়েছে যে, চতুর্থ দিবসের আগে সূর্য

সৃষ্টি হয়নি।) সুতরাং, এই পর্যায়ে দিন-রাত্রির আগমন তথা তৃতীয় দিবসের যে কথা বলা হয়েছে, তাও একই যুক্তিতে নাকচ হয়ে যায়।

> "পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক, এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক, তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর দিনের উপর কর্তৃত্ব করিতে এবং মহাজ্যোতিঃ ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ এই দুই বৃহৎ জ্যোতিঃ এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন। আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য, এবং দিবস ও রাত্রির উপর কর্তৃত্ব করণার্থে, এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিঃসমূহকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে-সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।" – বাণী ১৪ থেকে ১৯ ঃ

এখানে বাইবেলের রচয়িতার এইসব বক্তব্য গ্রহণ করা যেতে পারে; কিন্তু তবুও এখানে সামগ্রিকভাবে সৃষ্টির যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। পৃথিবী এবং চন্দ্র উভয়ই তাদের মূল নক্ষত্র সূর্য থেকে উৎপন্ন। তাছাড়া, আধুনিক বিজ্ঞান সৌরমণ্ডল ও তার কার্যকারণ পদ্ধতি সম্পর্কে যেসব তথ্য আবিষ্কার করেছে, তা একান্তভাবে সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই অবস্থায় পৃথিবীসৃষ্টির পরে সূর্য ও চন্দ্রসৃষ্টির বক্তব্য বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী।

> "পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক এবং ভূমির ঊর্ধ্বে আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষিগণ উড়ুক। তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের ও যে নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল প্রাণিময় আছে, সে সকলের এবং নানা জাতীয় পক্ষির সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রাণবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।" – বাণী ২০ থেকে ২৩ ঃ

বাইবেলের এইসব বাণীতে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে, তাও গ্রহণযোগ্য নয়। আদিপুস্তকের বর্ণনা অনুসারে সামুদ্রিক প্রাণী ও পাখিদের সাথে সাথে পৃথিবীতে প্রাণিজগতের আবির্ভাব ঘটেছে। অথচ, এই বাইবেলেই অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, পঞ্চম দিবসে নয়, বরং ষষ্ঠ দিবসে পৃথিবীতে প্রাণিজগতের সৃষ্টি করা হয়েছিল।

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রাণের উৎপত্তি সমুদ্র থেকেই। সমুদ্র থেকে প্রাণের আবির্ভাব হয়ে পৃথিবীর বুক ভরে তুলেছে, আর এভাবেই গড়ে উঠেছে প্রাণিজগৎ। পক্ষান্তরে, পৃথিবীর বুকে বিরাজমান প্রাণী থেকে এবং বিশেষত পৃথিবী সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায়ে একশ্রেণীর সরীসৃপ প্রজাতি থেকে পক্ষিকুলের আবির্ভাব ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়। এই ধারণার কারণ এই উভয় ধরনের প্রজাতির মধ্যে একইধরনের দেহগত বৈশিষ্ট্য। অথচ, আদিপুস্তকে ষষ্ঠদিনের আগের পৃথিবীতে পশুপ্রাণী সৃষ্টির কথা বলা হয়নি। অথচ, এর আগেই পাখি সৃষ্টি হয়েছে বলা হয়েছে। সুতরাং, পৃথিবীতে পশুপ্রাণীর আগে পক্ষিকুলের আবির্ভাবের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

> "পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানা জাতীয় প্রাণিবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক, তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলত ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।"
>
> "পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রে মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুদের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতেই মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।"
>
> "পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর। ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষধি ও যাবতীয় সজীব ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। আর ভূচর যাবতীয় পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ওষধি সকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল।"
>
> "পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তুসকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।"

– বাণী ২৪ থেকে ৩১ ঃ

এইসব বর্ণনা মূলতঃ সৃষ্টিকর্মের চূড়ান্ত পর্যায়ের। এখানে বাইবেল-লেখক ইতিপূর্বে সৃষ্ট যেসব প্রাণীর বর্ণনা দেননি, সেসবের একটি তালিকা তুলে ধরেছেন এবং সেইসাথে মানুষ ও পশুর খাদ্যাখাদ্যের বর্ণনা পেশ করেছেন।

ইতিপূর্বের বর্ণনায় যে ভুলটি রয়েছে, তাহলো, পৃথিবীতে পক্ষিকুলের আগে পশুকুলের আবির্ভাব। অবশ্য, সমস্ত প্রাণিজগতের সর্বশেষ পর্যায়ে যে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, সে-বিষয়ে লেখকের বর্ণনা সঠিক।

সৃষ্টি-সংক্রান্ত বর্ণনা অবশ্য এখানেই শেষ হয়নি। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম তিনটি বাণীতেও এ বিষয়ের বর্ণনা স্থান লাভ করেছে। যেমন—

> "এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তমদিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। আর ঈশ্বর সেই সপ্তমদিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেইদিনে ঈশ্বর সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।"

বাইবেলের সাতদিনের এই বর্ণনা সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। প্রথমেই ধরা যাক, কয়েকটি শব্দের কথা ঃ এখানে যে পাঠ উদ্ধৃত, তা গৃহীত হয়েছে উপরে উল্লিখিত *'রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন অব দি বাইবেল'* থেকে। এখানে host শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা অবশ্যই বিপুলসংখ্যক সৃষ্টির কথা বোঝানো হয়েছে। আর যেখানে 'বিশ্রাম করিলেন' বলা হয়েছে, সেটি আসলে হিব্রু Shabbath শব্দের অনুবাদ। এ থেকেই এসেছে ইহুদীদের 'বিশ্রাম দিবস'। ইংরেজিতে এই শব্দটিকে লেখা হয় 'Sabbath'।

ছয়দিন কাজের শেষে 'স্রষ্টা বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন' বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা যে একটা লেজেন্ড বা উপকথা মাত্র— তা দিবালোকের মতোই পরিষ্কার। এর একটি ব্যাখ্যা অবশ্যই রয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, সৃষ্টিতত্ত্বের যে অধ্যায়টি এখানে পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, তা হচ্ছে তথাকথিত সেকেরডোটাল পাঠ বা পুরোহিতদের রচনা। এই পাঠ রচিত হয়েছিল ব্যাবিলনে ইহুদীদের নির্বাসনকালীন নবী এজেকেলের (বাংলা বাইবেলের জিহিস্কেল) আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী বলে পরিচিত পুরোহিত ও লিপিকারদের দ্বারা। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। ইতিপূর্বে দেখা গেছে, পুরোহিতেরা বাইবেলের জেহোভিস্ট এলোহিস্ট বাণীগুলোকে নিজেদের ইচ্ছেমত ও প্রয়োজনানুসারে কিভাবে ঢোল সাজিয়ে নিয়েছিলেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব-সংক্রান্ত বাইবেলের আদিপুস্তকের জেহোভিস্ট পাঠ বা বাণীসমূহ পুরোহিতদের রচিত বাণীর কয়েক শতাব্দী আগে রচিত হয়। সেখানে কিন্তু ছয়দিন ধরে সৃষ্টির কাজ করে স্রষ্টার ক্লান্ত হয়ে পড়ার ও বিশ্রাম গ্রহণের কোনো

উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালে পুরোহিতেরা বাইবেলে সেটি জুড়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে কোন দিন স্রষ্টা কি কি সৃষ্টি করেছেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন। নিজেদের বিশ্রাম গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট একটি দিন নির্ধারণ ও সাব্যস্ত করার জন্যই তাঁরা এই রচনাটি জুড়ে দিয়েছেন এবং এর যৌক্তিকতা দাঁড় করাতে চেয়েছেন এই বলে যে, স্বয়ং স্রষ্টাই সবার আগে এই বিশ্রাম-দিনকে মর্যাদা দিয়ে গেছেন। এভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তি দাঁড় করিয়ে নিয়ে উল্লিখিত পুরোহিতগণ নিজেদের জাগতিক প্রয়োজনীয়তা মিটিয়েছেন। কিন্তু, বৈজ্ঞানিক তথ্যের নিরিখে তাঁদের সেই ধর্মীয় যুক্তিকে নিছক খামখেয়ালী ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করতে গিয়ে এই পুরোহিত-লেখকবৃন্দ বাইবেলের বর্ণনাকে একটি ধর্মীয় রূপ দিতে চেয়েছেন ঠিকই; কিন্তু এক সপ্তাহের যে কাজ তাঁরা দেখিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক বিচারে তার কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। পর্যায়ক্রমেই পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হয়েছে বটে; কিন্তু এ বিষয়ে মানুষ এখন সম্পূর্ণভাবে অবহিত যে, প্রতিটি পর্যায়ে সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয়েছে সুদীর্ঘ সময়ের। স্রষ্টার বিশ্রাম গ্রহণের জন্য বিশ্রাম-দিনের কথা বাদ দিলেও দেখা যাচ্ছে, ষষ্ঠ দিনের সন্ধ্যায় বিশ্বসৃষ্টির কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে। এই যদি হয়, তবে আমাদের অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে যে, সপ্তাহের এই হিসেবটা আসলেই কি দিনক্ষণের হিসেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাকি এর অর্থ কোরআনের বর্ণনা মোতাবেক কোনো অনির্দিষ্ট কাল? সপ্তাহের বা দিনের হিসেব যদি সেই অনির্দিষ্ট কাল ধরা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও পুরোহিতদের রচিত বাইবেলের এতদসংক্রান্ত বর্ণনা আরো বেশি করে অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। বিশেষত সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনায় বাইবেলের দিনের হিসেবে সন্ধ্যা ও সকালের যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে, তা বিজ্ঞানের মৌলিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিরোধী।

সুতরাং, এসব বিচার-পর্যালোচনা থেকে যে-কেউ দেখতে পাবেন, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত বাইবেলের যে বক্তব্য, বিশেষত যেসব বর্ণনার রচয়িতা পুরোহিতগণ, সেসব বর্ণনা যেমন কল্পনাপ্রসূত তেমনি নিছক জালিয়াতি ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যকে প্রকাশ করা এসব রচনার উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য অন্যকিছু।

বাইবেলের দ্বিতীয় বর্ণনা

প্রথম বর্ণনার পরেপরেই বাইবেলের আদিপুস্তকে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে দ্বিতীয় আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এই দ্বিতীয় বর্ণনায় কোনো মন্তব্য নেই; এমনকি এই বর্ণনাকে প্রথম বর্ণনার সাথে এমনভাবে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মাঝখানে কোনো ফাঁকও নেই। পাঠকদের মনে এই বর্ণনাপাঠে তেমন কোনো প্রশ্ন কিংবা সন্দেহ দেখা দেয় না। স্মরণ রাখা দরকার, এই দ্বিতীয় বর্ণনা শুধু সংক্ষিপ্ত নয়— এটি রচিত হয়েছিল প্রথম বর্ণনা রচনার প্রায় তিন শতাব্দী আগে। এই বর্ণনায় পৃথিবী ও আকাশসৃষ্টির কথা যতটা না বলা হয়েছে, তারচেয়ে অনেক বেশি স্থান জুড়ে রয়েছে মানুষসৃষ্টি এবং পৃথিবীতে স্বর্গোদ্যান তৈরির কাহিনী। সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় বর্ণনাটি হলো ঃ

"সৃষ্টিকালে যেদিন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল নির্মাণ করিলেন, তখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত মতে তখন পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোনো উদ্ভিজ হইত না, আর ক্ষেত্রের কোনো ওষধি উৎপন্ন হইত না, কেননা সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষাণ নাই, আর ভূমিতে কৃষিকর্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। আর পৃথিবী হইতে কুজঝটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলসিক্ত করিল। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মানুষকে) নির্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন। তাহাতে মনুষ্য সজীব হইল।" (পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক, ২ : ৪-৭)

প্রচলিত বাইবেলের এই হল সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কিত জেহোভিস্ট বর্ণনা। এরইসাথে পরবর্তী পর্যায়ে সংযোজিত হয়েছে পুরোহিতদের রচিত প্রথম বর্ণনা। প্রশ্ন উঠতে পারে, আদিতে এই দ্বিতীয় বর্ণনা কি এরকমই সংক্ষিপ্ত ছিল? সময়ের সাথে সাথে জেহোভিস্ট বর্ণনাকে যে বাইবেল থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়নি, সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা মুশকিল।

আমরা এও জানি না, এখন সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে দ্বিতীয় বর্ণনা হিসেবে যতটুকু রচনা পাচ্ছি, তা আদি বাইবেলের হুবহু বক্তব্য কিনা। বাইবেলের এই দ্বিতীয়

বর্ণনায় অর্থাৎ জেহোভিস্ট বর্ণনায় আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে তেমন কিছু বলা হয়নি। তবে, একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বিধাতা যখন মানুষ সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তখন গাছপালা বলতে কিছুই ছিল না। অথচ, তখনও কিন্তু পৃথিবীর পানি মাটির উপরিভাগকে সিক্ত করেছিল। এই দ্বিতীয় বর্ণনার ৪নং বাণীতে আরো রয়েছে যে, মানুষসৃষ্টির সময় বিধাতা একটি বাগানও সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, বৃক্ষজগৎ মানব-সৃষ্টির সাথে সাথে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। এ বক্তব্য কিন্তু বিজ্ঞানের নিরিখে একদম ভুল। পৃথিবীতে গাছপালা জন্মের পর বহুসময় অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত মানুষের আবির্ভাব এখানে ঘটেনি। অবশ্য, গাছপালার জন্ম এবং মানুষের আবির্ভাব— এতদুভয়ের মধ্যে কত কোটি বছরের ব্যবধান, তা আমরা জানি না।

যাহোক, বাইবেলের জেহোভিস্ট রচনার ব্যাপারে সমালোচনা শুধু এইটুকুই। বেশি সমালোচনার অবকাশ এক্ষেত্রে ঘটছে না এই কারণে যে, এই বর্ণনায় পুরোহিতদের বর্ণনার মত মানুষের সাথে সাথে পৃথিবী ও বিশ্বসৃষ্টিকে এক সময়ের ঘটনা বলে গুলিয়ে ফেলা হয়নি। তাছাড়া, পুরোহিতদের বর্ণনার মত বিধাতার সৃষ্টির কাজকে একমাত্র সপ্তাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না করার দরুন এই দ্বিতীয় বর্ণনার ব্যাপারে বাইবেলকে এই অধ্যায়ে তেমন তীব্র কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না।

বৈজ্ঞানিক আলোচনায় মানব-সৃষ্টি
ডারউইনের বিবর্তনবাদ

ডারউইনের আবির্ভাব ঘটেছিল লামার্ক-এর অর্ধশতাব্দী পরে। ডারউইন তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে লামার্ক-এর ধারাতেই আরো অনেক তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেন; এবং এই মতবাদের অনেক অগ্রগতি সাধন করেন। তবে, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ডারউইন মনে করতেন, প্রকৃতির নির্বাচন-সংক্রান্ত মতবাদ শুধু স্বতঃসিদ্ধ নয়, বরং এই মতবাদ সর্বব্যাপক; এবং এই থিওরি দিয়ে যাবতীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা সম্ভব।

এছাড়াও, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ডারউইন তাঁর গবেষণায় সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা থিওরি দ্বারা অধিকমাত্রায় প্রভাবিত হন। অথচ, সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্বগত কোন উপাদান বিজ্ঞানের মৌল গবেষণায় আদৌ কোন গুরুত্বের দাবিদার হতে পারে না। তবে, এতকিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষ-দুর্বলতা সত্ত্বেও এ কথা মানতেই হবে যে, ডারউইনের থিওরি আধুনিক যুগের সর্বাপেক্ষা পরিচিত থিওরি। এই থিওরির এই সুযশী তথা ডারউইনের এই সুখ্যাতির পেছনে যে-সব বিষয় কাজ করছে, তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ডারউইনের থিওরির যুক্তিসমূহ চরম চাতুর্যের সাথে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। যুক্তির 'ধার' যাই থাকুক, কৌশলগত 'ভারের' দরুন সেই যুক্তিকেই সর্বাধিক কার্যকর বলে মনে হয়। এই সঙ্গে আরো একটি বিষয় ভুলে গেলে চলবে না যে, এক শ্রেণীর বিজ্ঞানী, মানুষের মূল উৎস-সম্পর্কিত বাইবেলের বক্তব্যকে এবং প্রাণিজগতের অপরিবর্তনশীলতা-সংক্রান্ত বাইবেলীয় শিক্ষাকে হেয়প্রতিপন্ন করার স্বার্থে ডারউইনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান।

এ কথা সত্য যে, প্রাণিজগতে বিবর্তনের যে ধারা বিদ্যমান,— সেই একইধারায় মানুষ যে বানরের বংশধর, তা প্রতিপন্ন করার কাজেই সাধারণত ডারউইন-থিওরিকে ব্যবহার করা হয়। তবে, মূলকথা এই যে, মানুষ যেকোন-এক জানোয়ারের বংশধর,— এই ধারণা আদৌ ডারউইনের নয়। বরং, প্রথম ১৮৬৮ সালে হেকেল এই ধারণার কথা ব্যক্ত করেন। অধুনা, প্রায় সবাই

সাধারণভাবে ডারউইনের মতবাদের সাথে বিবর্তনবাদকে গুলিয়ে ফেলেন। অথচ, এই গুলিয়ে ফেলার ব্যাপারটি ঘটে থাকে এতদ্সংক্রান্ত ভুল ধারণার দরুন।

এই দুই মতবাদের (ডারউইনবাদ ও বিবর্তনবাদ) মধ্যে এ ধরনের গুলিয়ে ফেলার ব্যাপারটা আদতেই বিভ্রান্তিজনক ও বিরক্তিকর। কারণ, ডারউইন নিজেই তাঁর মতবাদকে উপস্থাপন করে গেছেন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে।

উল্লেখ্য যে, ডারউইনের পুস্তকটির নাম হল ঃ *"অন দ্য অরিজিন অব স্পেসিস বাই মিন্স অব নেচারাল সিলেকশন অব দি প্রিজারভেশন অব ফেভার্ড রেসেস ইন দা স্ট্রাগল ফর লাইফ।"* এটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম, ১৮৫৯ সালে।

পরবর্তীতে *'অন দি অরিজিন অব স্পেসিস'* পুস্তক থেকেই ডারউইনের এতদ্সংক্রান্ত নিজের বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে। এখানে ডারউইনের ওই পুস্তকের যে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল, তা ১৯৮১ সালে 'পেঙ্গুইন বুকস্' হিসেবে প্রকাশিত পেলিক্যান ক্লাসিক্স সংস্করণ থেকে গৃহীত ঃ

> "অতএব, যতজনের টিকে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে তারচেয়ে বেশিজন যখন জন্ম নেবে, তখন প্রতিটি ক্ষেত্রেই টিকে থাকার জন্য শুরু হয়ে যাবে সংগ্রাম। একে বলা হয় অস্তিত্বের লড়াই। এ লড়াই দেখা দেবে একই প্রজাতির প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে, অপরাপর নির্দিষ্ট কোন প্রজাতির বিরুদ্ধে অথবা জীবনের প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গেই।... এই অবস্থায় দেখা যায়, মানুষের উপযোগী পরিবর্তন ঘটে চলেছে সন্দেহাতীতভাবেই। এবং জীবনযুদ্ধের বিরাট ও ব্যাপক জটিলতায় কোন-না-কোন পরিবর্তন কোন-না-কোনভাবে কারো-না-কারো জন্যে অধিকতর উপযোগী হয়ে ধরা দিয়ে থাকে। সুতরাং, হাজার হাজার প্রজন্মেরধারায় এইরকম কোন অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় কি? বরং, সম্ভাবনার ঐতিহ্যকেই স্বীকার করে নিতে হয়। আর এরকম অবস্থা যখন দেখা দেবে (মনে রাখতে হবে যে, এটা হচ্ছে সেই অবস্থা— যখন যতজন টিকে থাকা সম্ভব তারচেয়েও অধিকসংখ্যক জন্ম নিয়ে সেরেছে) তখন এটা সন্দেহ করা কি অমূলক হবে যে, যারা অন্যদেরচেয়ে— যত সামান্যই হোক— অধিক সুবিধা লাভ করবে, তারাই তখন টিকে থাকার এবং নিজস্বধারায় প্রজনন বৃদ্ধির সর্বাধিক সুযোগ পেয়ে যাবে? পক্ষান্তরে, এটাও আমরা নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারি যে, অনুরূপ কোন পরিবর্তনে তা যত সামান্যই হোক, কেউ যদি প্রতিকূলতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে

তার বা তাদের ধ্বংসই হবে অনিবার্য। এই যে অনুকূল পরিবর্তনের ধারায় সংরক্ষণ আর ক্ষতিকর পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যাত হওয়া, এটাকেই আমি নেচারাল সিলেকশন বা প্রকৃতির নির্বাচন বলেছি।"

প্রকৃতপক্ষে, এখানে ডারউইন যা-কিছু বোঝাতে চেয়েছেন, তাতে তার উদ্দেশ্য ছিল একটাই। আর তা হল, প্রকৃতির নির্বাচনে কিংবা জীবন-সংগ্রামে পরিবর্তনের আনুকূল্যপ্রাপ্তির মাধ্যমে জাতিসমূহের টিকে যাওয়ার ধারা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন প্রজাতির অরিজিন বা আদি উৎস সম্পর্কে একটি থিওরি দাঁড় করানো। অথচ, তাঁর এই থিওরিকেই নিজেদের পতাকা হিসেবে লুফে নিয়েছিলেন বিবর্তনবাদীরা। শুধু তাই নয়, বিবর্তনবাদীরা এরপর ডারউইনের সেই থিওরিকে ব্যবহার করে চললেন ধর্মীয়-বিশ্বাসের বিরুদ্ধ-সংগ্রামে বস্তুবাদী চিন্তাধারার হাতিয়ার হিসেবে। এখনো ডারউইনের মতবাদের সেই পতাকা বস্তুবাদী দার্শনিকদের সমান উদ্দীপনার সঙ্গে আন্দোলিত করে।

ডারউইন তাই এখনও নাস্তিক্যবাদী শিবিরের একজন হিরো— পূজনীয় ব্যক্তিত্ব। বস্তুবাদীগণ যখন তাঁদের মতবাদের যাঁতাকলে কোনকিছুকে গুঁড়িয়ে দিতে বা উড়িয়ে দিতে চান, তখনই তাঁরা ডারউইন এবং তাঁর এই থিওরির দোহাই পাড়েন। অথচ, পাঠক-পাঠিকাবর্গ *'অন দি অরিজিন অব স্পেসিস'* পুস্তকের অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়ে গেলে দেখতে পাবেন, ডারউইনের বিবর্তনবাদ আদৌ ধর্মবিরোধী কোন বিষয় নয়। এমনকি, সে বিবর্তন যদি মানব প্রজাতিরও হয়, তাহলেও তা ধর্মীয় বিশ্বাসকে হেয়প্রতিপন্ন করে না।

মূলত, জীবকোষের জৈবপ্রক্রিয়া-সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সর্বশেষ ফলাফল বিবর্তনবাদকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে, তবে তা ভিন্নধারায়। এতকাল এই কথাটিকে কেউ কেউ ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করেননি এমন নয়। তবে যেহেতু তাঁদের কথিত সেই বিবর্তনবাদ ছিল ভিন্নধারার, সেহেতু, বিবর্তনবাদীরা তাঁদের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বহাতে এতটুকু কার্পণ্য করেননি। কিন্তু, আধুনিক সর্বশেষ বিজ্ঞান-গবেষণা বিবর্তনবাদকে জীবন সাংগঠনিক পদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বিষয় বলে রায় দিয়েছেন। আধুনিক বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত এই সত্য অবশ্য তথাকথিত বিবর্তনবাদীদের ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তবুও, অতীতে বিবর্তনবাদ নিয়ে যে ধরনের বিতর্ক ও বাদানুবাদ চলত, আধুনিক বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারের দরুন সেই বিতর্কের অবসান সূচিত হয়েছে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন পর্যায়ে, বলতে গেলে, সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে থেকেও এই বিবাদকারীরা এখন একটি অভিন্ন ঐক্যমত্যে একত্রিত হতে পারছেন।

যাহোক, এ কথা মানতেই হবে যে, ডারউইনের মতবাদ বা তত্ত্ব খুবই স্পষ্ট। ডারউইন তাঁর গবেষণাকর্মের দ্বারা এক সাধারণ সত্যের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, আর তা হল, নির্দিষ্ট কোন প্রজাতির প্রতিটি প্রাণীর স্ব-স্ব চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভিন্নতার— এবং বৈচিত্র্যের দিকথেকে তা ব্যাপক। এই বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার যে-সব কারণ ডারউইন উল্লেখ করে গেছেন, তা স্পষ্টতই লামার্ক-এর নির্দেশিত কারণের কাছাকাছি। ডারউইন বর্ণনা করেছেন যে, পরিবেশের পরিবর্তনের দরুন প্রাণিজগতের প্রজনন-কোষসমূহের আকৃতির পরিবর্তন ঘটে থাকে এবং এর ফলে গুণগত যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। ডারউইন অবশ্য একটি দিক থেকে লামার্ককেও ছাড়িয়ে গেছেন। সে দিকটি হল, প্রকৃতি তার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোন কোন প্রাণীকে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আনুকূল্য প্রদর্শন করে থাকে। এভাবে, প্রকৃতির একটি নিষ্ঠুরপন্থায় যারা দুর্বলতর, তাদের বিনাশ ঘটে; আর প্রকৃতির আনুকূল্যপ্রাপ্তরা টিকে যায়। ডারউইনের আরো অভিমত, প্রকৃতির এই নির্বাচনীয়ধারার পাশাপাশি প্রাণিজগতে যৌনসঙ্গী নির্বাচনের একটা ধারাও অব্যাহত রয়েছে। এই ধারায় স্ত্রী-জাতীয় প্রাণিরা তাদের যৌনসঙ্গী নির্বাচনে শক্তিশালী পুরুষ প্রাণীকেই বাছাই করে থাকে।

নেচারাল সিলেকশন বা প্রকৃতির নির্বাচনের এই যে মতবাদ, তা প্রচারিত হওয়ার পরপরই চারদিকে প্রচুর সাড়া পড়ে যায়। এমনকি এখনও ডারউইনের অনুসারীরা প্রকৃতির নির্বাচন-মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে ডারউইনকে এ যাবতকালের সেরা প্রকৃতিবিজ্ঞানী বলে বিবেচনা করেন। জীববিজ্ঞানী হিসেবেও ডারউইন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। মৃত্যুর মধ্যদিয়েই যেন তিনি এ বিষয়ে সর্বাধিক গৌরব অর্জন করেছেন। ডারউইনের রচনাবলী যদিও ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাতে নাস্তিক্যবাদের পক্ষে যুক্তি যুগিয়েছিল এবং এ বিষয়টি উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে সর্বত্র উষ্মার সঞ্চার করেছিল, কিন্তু তবুও ব্রিটিশ জাতি তাঁর মতদেহ ওয়েস্ট মিনিস্টার এ্যাবোতে সমাহিত করতে কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করেনি।

প্রকৃতপক্ষে, ডারউইনের মতবাদের দুটো আলাদা দিক রয়েছে। প্রথমটি বিজ্ঞানভিত্তিক। স্বীকার করতে বাধা নেই যে, ডারউইন তাঁর গবেষণায় গ্রহণযোগ্য সুপ্রচুর তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করেছেন। তবে এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত বৈজ্ঞানিক দিক থেকে তেমন মজবুত করতে সক্ষম হননি। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, খোদ বিবর্তনবাদ সম্পর্কেও গ্রহণযোগ্য খুব বেশিকিছু তিনি দিয়ে যেতে পারেননি। অবশ্য, তা আলাদা ব্যাপার। তবে মানতেই হবে যে, বিভিন্ন

প্রজাতির ক্ষেত্রে বিবর্তনের ধারা-সম্পর্কিত বিষয়ে তাঁর যে পর্যবেক্ষণ, তা খুবই আকর্ষণীয়।

ডারউইনের মতবাদের দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে দর্শনভিত্তিক। এই বিষয়ে ডারউইন সমধিক গুরুত্ব আরোপে সমর্থ হয়েছেন এবং তাঁর দর্শন-সংক্রান্ত বিষয় ও বক্তব্যের প্রকাশ আকর্ষণীয় ও স্পষ্ট।

মালথাসের মতবাদ এবং....

ডারউইন প্রকৃতির নির্বাচন-সংক্রান্ত তত্ত্ব উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর ওপরে মালথাসের প্রভাবের কথা অস্বীকার করেননি। নিচে এ বিষয়ে তাঁর যে বক্তব্য তুলে ধরা হল, সেটি পি. পি. গ্রাশের *'ম্যান স্ট্যান্ডস এ্যাকিউজড্'* পুস্তক থেকে উদ্ধৃতি ঃ

এতে দেখানো হয়েছে, কিভাবে এই প্রাণিকূল জ্যামিতিক হারে তাদের বংশবিস্তার ঘটিয়ে থাকে। এই তত্ত্ব মালথাসের এবং এই তত্ত্ব প্রাণিজগৎ ও সব্জি-জগতের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।" উল্লেখ্য, ডারউইনের এই স্বীকৃতি পরিবেশিত হয়েছে তাঁর *"অন দি অরিজিন অব স্পেসিস"* পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়, ১৮৬৯ সালে।

ডারউইন প্রাণিজগৎ পর্যবেক্ষণে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণজাত-তত্ত্বকে আর্থ-সামাজিক তত্ত্বের আলোকে ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু, 'আর্থ-সামাজিক তত্ত্বের' সংজ্ঞাই বলে দেয় যে, কোন আর্থ–সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে প্রাণিজগতের কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য, এর আগেপর্যন্ত ডারউইন তাঁর প্রাণিজগতের এই পর্যবেক্ষণকে প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত যৌক্তিকভাবেই প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ডারউইন প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে ১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত বিগলে জাহাজের মিশনের দক্ষিণ আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকাসমূহ পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান। তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন সম্পূর্ণভাবে। তখনই ডারউইন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে লক্ষ্য করেন যে, এসব এলাকায় যেসব প্রাণীর বসবাস, পরিবেশগত কারণে তাদের আকৃতিগত পরিবর্তন কত ব্যাপক। এ থেকেই তিনি এই ধারণায় উপনীত হন যে, প্রাণিজগৎ অপরিবর্তনীয় নয়। তিনি এই বিষয়টিকে কৃত্রিম প্রজনন-পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ কর্তৃক গৃহপালিত পশুর উন্নতি বিধানের প্রয়াস-প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনা করেন। এই পর্যায়ে তাঁর মনে

যে প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে, তাহল, প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণিজগতের আকৃতিগত কাঠামোর ওপরে এ ধরনের নির্বাচন-পদ্ধতির প্রয়োগ কিভাবে সম্ভব?

এই প্রশ্নের দ্বারা ডারউইন যা বুঝাতে চেয়েছেন, তাহল, মানুষ যেভাবে উন্নতজাতের পশু উৎপাদনে ক্রস-ব্রিডিং পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। প্রকৃতির রাজ্যেও প্রাণিকুলের জন্য তেমনিধারায় প্রাকৃতিক কোন পদ্ধতি বিদ্যমান। লক্ষ্য করলেও স্পষ্ট বুঝা যায়, প্রকৃতির রাজ্যে প্রাণিজগতের মধ্যে একধরনের প্রাকৃতিক-নির্বাচন রয়েছে, এবং তা স্বতঃস্ফূর্ত। ডারউইনের মাধ্যমে এভাবেই একসময় একটি জিজ্ঞাসার উদ্ভব ঘটেছিল এবং একটি ধারণাভিত্তিক তত্ত্ব গড়ে উঠার পথ হয়েছিল প্রশস্ত। কিন্তু জিজ্ঞাসার জবাব যে ধারায় এগিয়ে গেছে, তা সঠিক কোন ভিত্তি বা বাস্তবতা খুঁজে নিতে পারেনি।

ডারউইন যে কিভাবে মালথাসের ধারণাকে তাঁর তত্ত্বের যৌক্তিকতা প্রমাণের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, তা বুঝে উঠা সত্যি মুশকিল। মালথাস ছিলেন একজন এ্যাংলিক্যান পাদরি। অর্থনীতিতে জনসংখ্যা এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধি কি পরিণতি বয়ে আনে, গোড়া থেকে সে বিষয়টার ওপরে মালথাসের ছিল দারুন আগ্রহ। ১৭৯৮ সালে মালথাস বেনামিতে একখানা পুস্তক প্রকাশ করেন। "এসে অন দি প্রিন্সিপাল অব পপুলেশন" শীর্ষক এই পুস্তকে তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার ব্যাপারে বিভিন্ন সমাধানের পন্থা নির্দেশ করেন। যেমন, 'পুওর ল'।

তাঁর প্রস্তাবিত এই আইনের মূলবক্তব্য হচ্ছে, যে-সব ব্যক্তি নিজে কিছুই উৎপাদন করে না এবং ধনীদের দান-খয়রাতে বেঁচে থাকে, তাদের সকলরকম সাহায্য-সহযোগিতা বাতিল করা উচিত। মালথাসের বক্তব্য ছিল, মানুষেরা নিজেরাই নিজেদের টিকে থাকার ব্যাপারটা বেছে নেবে; উৎপাদনে যারা সক্রিয় ও সক্ষম শুধু তাদেরই বেঁচে থাকার অধিকার থাকবে। পক্ষান্তরে, প্রকৃতিগতভাবে যারা অক্ষম অথবা দুর্বল তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

সময়টা ছিল শিল্প-বিপ্লবের প্রাথমিক যুগ। তখন শ্রমিক সমাজের মধ্যে এমনিতেই দুঃখ-দুর্দশার সীমা-পরিসীমা ছিল না। সেই দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে মানবিক দানশীলতাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করার এই প্রস্তাব জনসমক্ষে পেশ করা হয়। কিন্তু মালথাসের এই অমানবিক প্রস্তাবনার মধ্যেই ডারউইন তাঁর নিজস্ব 'প্রকৃতির-নির্বাচন' তত্ত্বের আকর্ষণীয় উপাদান পেয়ে যান ঃ মালথাসের ধারণাকে তিনি নিজস্ব তত্ত্বে প্রয়োগ করে 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' সুনিশ্চিত করার কাজে কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েন। তিনি দেখানোর প্রয়াস পান যে, প্রকৃতি নিজেই তার নির্বাচনে দুর্বলদের বাদ দিয়ে শক্তিমানদের সংরক্ষণ করে থাকে।

ইতোপূর্বে যা বলা হল, তার কোনটিই অসত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, কাগজে-কলমে ডারউইনের এই স্বীকৃতি যদি আমরা না পেতাম তাহলে কে ভাবতে পারত যে, তিনিও মালথাসের সমাধানের মত এত কঠিন ও নিষ্ঠুর এক মতবাদকে নিজ তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে নিয়েছিলেন! এভাবে মালথাসের নিকট থেকে গোড়াতে ডারউইনের প্রেরণালাভ এবং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর মতবাদ দিয়ে সবকিছুর ওপরে প্রভাব বিস্তারের বিষয়টাকে পি. পি. গ্রাশে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। গ্রাশে তাঁর *"ম্যান স্ট্যান্ডস্ এ্যাকিউজড্"* পুস্তকে গোটা ব্যাপারটাকেই দুর্ভাগ্যজনক আখ্যায়িত করে বলেছেন ঃ

> "এ ধরনের মূলনীতি ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কারণেই ডারউইনবাদ এ যাবত-কালের সব মতবাদের মধ্যে চরম ধর্মবিরোধী ও চরম বস্তুবাদী মতবাদ হিসেবে বিরাজ করছে।" পি. পি. গ্রাশে এই মর্মে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ডারউইন মতবাদের এই দিকটির ব্যাপারে খ্রিস্টান বিজ্ঞানীরাও তেমন অবহিত নন। তিনি আরো মন্তব্য করেছেন, "ডারউইনের থিওরিই কার্ল মার্কস্-কে তাঁর মতবাদে অনেক বেশি আস্থাবান হতে সহায়তা করেছে। ডারউইনের *'অন দি অরিজিন অব স্পেসিস'* পুস্তকেই কার্ল মার্কস্ তাঁর বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী তত্ত্বের জোরালো প্রেরণা খুঁজে পাননি এবং এ কারণেই তিনি ডারউইনের এই পুস্তকের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। শুধু তাই নয়, ডারউইনের এই পুস্তককে কার্ল মার্কস্ তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছামত ব্যবহারও করেছেন।"

মানবসৃষ্টি ঃ বাইবেলের আলোকে

বাইবেলে প্রকৃতিবিজ্ঞান-সম্পর্কিত এমন কোন বাণী বা বক্তব্য নেই যা নিয়ে কোন গবেষণা-পর্যালোচনা পরিচালিত হতে পারে। পক্ষান্তরে, পবিত্র কোরআনে প্রকৃতিবিজ্ঞান-সংক্রান্ত এত অধিক বাণী ও বক্তব্য বিদ্যমান যা নিয়ে মানব-ইতিহাসের যেকোন পর্যায়েরই গবেষণা চালান সম্ভব। শুধু তাই নয়, কোরআনের সেই গবেষণা-পর্যালোচনায় এমনসব তথ্য ও উপাদান পাওয়া যেতে পারে যা পরম স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষকে সম্যক ধারণা দিতে সক্ষম। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কোরআনে এমনসব বক্তব্য রয়েছে, যা আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে নিখাদ সত্য হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত।

যাহোক, বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণীতে পাওয়া যায়, নিছক কতগুলো অতীত ঘটনার বর্ণনা। এসব তথ্য বিজ্ঞানীদের কৌতূহলী করে বটে, কিন্তু সে-

সব তথ্যের বিচার-পর্যালোচনা পরিচালনার কোন অবকাশ থাকে না। বরং, প্রাথমিক বিচারেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, বাইবেলের ওইসব তথ্য বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের আলোকে মোটেও বাস্তবসম্মত নয়; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষ বাস্তব সত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। সৃষ্টিতত্ত্ব- সম্পর্কিত বাইবেলের বর্ণনা এমনিতেই অপ্রতুল। বাইবেলের সেইসব কৌতূহলোদ্দীপক বক্তব্যের বিবরণ পুস্তকে বিশদভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নূহের তুফান সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠিক কোন্‌সময় এই তুফানরূপী বিপর্যয়টি ঘটেছিল এবং কিভাবে সেই তুফানে দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বাইবেলে তার উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরীক্ষা-গবেষণা ও আবিষ্কার বাইবেলের ওই বক্তব্যকে মেনে নিতে পারছে না। অন্যদিকে, হযরত মুসার (আঃ) মিসর ত্যাগের যে বিবরণ বাইবেলে বিদ্যমান, তাতে আমরা এমনকিছু তথ্য পাই যা আধুনিক মিসরীয় স্থাপত্য বিজ্ঞানের দ্বারা সত্য হিসেবে সাব্যস্ত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বাইবেলের ওই বিবরণ থেকে আমরা হযরত মুসা (আঃ) এবং ফেরাউনের সঠিক ইতিহাসও অনেকাংশে সনাক্ত করতে পারি।

যাহোক, বাইবেলের রচয়িতাবৃন্দ মানবসৃষ্টি ও হযরত আদমের (আঃ) বংশধারা এবং ইহুদীদের বিবরণ সম্পর্কে ধর্মীয় যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে গেছেন, প্রথমেই তা পর্যালোচনা করা উচিত। কেননা, শুধু এইক্ষেত্রেই বিচার-পর্যালোচনার কিছু অবকাশ বিদ্যমান। এর প্রথমেই আসে মানুষের আদি উৎসের কথা; দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে পৃথিবীতে মানুষের প্রথম আবির্ভাবের ইতিহাস। প্রথমটা সম্পর্কে বাইবেলে মোটামুটিভাবে কিছুটা বিশদ বর্ণনা বিদ্যমান। দ্বিতীয় বিষয়টা সম্পর্কে বাইবেলে সরাসরি কোন বক্তব্য নেই বটে; তবে, বাইবেলে পুরাতন নিয়মে প্রদত্ত সময়কালের হিসেব থেকে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় সম্পর্কে মোটামুটিভাবে একটা ধারণা খুঁজে নেয়া যায়। সেইসঙ্গে, যদিও অনেকটা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত, তবুও বাইবেলের নতুন নিয়মের বিভিন্ন সুসমাচার বিশেষত লুক-রচিত সুসমাচার থেকেও এই বিষয়ের কিছু বরাত বা সূত্র খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বাইবেল পুরাতন নিয়মের 'আদিপুস্তকে' মানুষের আদি উৎস সম্পর্কিত বক্তব্য ওই একইঅধ্যায়ে পরিবেশিত সৃষ্টিতত্ত্বের বিবরণের মধ্যেই বিদ্যমান। তবে, বিষয়টা বিশদভাবে বুঝার জন্য এ বিষয়ে সরাসরি আলোচনা প্রয়োজন। সেই চেষ্টাই এখানে করা হবে।

ফাদার ডি ভক্স-এর গবেষণা অনুসারে, বাইবেলের 'আদিপুস্তক'-সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে দুটি ভিন্নধর্মী রচনা একইসঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে এই যে দুটি আলাদা রচনা— এই বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা। কেননা, এই বিষয়টি সম্পর্কে অনেক বাইবেল-পাঠকেরই তেমন কোন ধারণা নেই।

আগেই বলা হয়েছে, সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কিত 'আদিপুস্তকের' প্রথম বক্তব্যের রচয়িতা হলেন, জেরুজালেম উপাসনালয়ের যাজক-পুরোহিতবর্গ। এসব রচনার সময়কাল হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী। এসব রচনা 'সেকেরডোটাল' পাঠ হিসেবে পরিচিত। আদিপুস্তকের দুটি বিবরণের মধ্যে এই সেকেরডোটাল রচনা বেশ দীর্ঘ। আদিপুস্তকের দুটি বিবরণের মধ্যে এই রচনার শুরু। এতে একে একে স্থান পেয়েছে আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি, পৃথিবীর সৃষ্টি, প্রাণিজগতের সৃষ্টি এবং শেষ পর্বে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে স্থানলাভ করেছে মানুষের সৃষ্টি-সম্পর্কিত বিবরণ। তবে, মানবসৃষ্টির এই বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত।

সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কিত বাইবেলের দ্বিতীয় বর্ণনাটি হচ্ছে, জেহোভিস্ট আমলের রচনা। এই রচনার সময়কাল হচ্ছে, খ্রিস্টপূর্ব নবম অথবা দশম শতাব্দী। সেকেরডোটাল বিবরণের পরপরই আদিপুস্তকে স্থানলাভ করেছে এই জেহোভিস্ট রচনা এবং এই জেহোভিস্ট রচনায় মানবসৃষ্টি-সংক্রান্ত বিবরণ তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ। যাহোক, এখানে *'রিভাইজড্ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন অব দি বাইবেল'* থেকে 'আদিপুস্তকের' এই বিবরণ তুলে ধরা হচ্ছে। (বাংলা রূপান্তরে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা "পবিত্র বাইবেল— পুরাতন ও নতুন নিয়ম"-এর 'আদিপুস্তকের' প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত) ঃ

"আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল। এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থান করিতেছিল।" –অধ্যায় ১, বাণী ১ ও ২ ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন। আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি

রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।" —বাণী ৩ থেকে ৫ ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক ও জলকে দুইভাবে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন, তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।" —বাণী ৬ থেকে ৮ ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নিচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল। তখন, ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন। আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, তাহা উত্তম। পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি, তৃণ, বীজোৎপাদক ঔষধি ও সজীব স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ, ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ভূমি-তৃণ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বীজোৎপাদক ঔষধি স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সজীব ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপাদন করিল, আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।"
—বাণী ৯ থেকে ১৩ ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; সে-সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক, এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক, তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর দিনের উপর কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতিঃ ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ এই দুই বৃহৎ জ্যোতিঃ, এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন। আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য, এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করণার্থে, এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিসমূহকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।" —বাণী ১৪ থেকে ১৯ ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিমত হউক এবং ভূমির ঊর্ধ্বে আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষিগণ উড়ুক। তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের ও যে নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল প্রাণিময় আছে, সে সকলের এবং নানাজাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রাণবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক এবং আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।"—বাণী ২০ থেকে ২৩ ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্যপশু, সরীসৃপ ও বন্যপশু উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।" —বাণী ২৪ থেকে ৩১ ঃ

পূর্বে গ্রন্থিত হয়েছে যে, আরো বর্ণিত রয়েছে, পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষিদের উপরে, পশুদের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতেই মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন ঃ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।"

পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন, ঈশ্বর কহিলেন,
"তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর। ঈশ্বর আরো কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ঔষধি ও যাবতীয় সজীব ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইভে। আর ভূচরের যাবতীয় পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল জাতীয় কীট এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ঔষধিসকল দিলাম। তাহাতে সেইরূপ হইল।"

"পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তুসকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।"

সৃষ্টি-সংক্রান্ত বর্ণনা অবশ্য এখানেই শেষ হয় নাই। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম তিন-চারটি বাণীতেও এ বিষয়ের বর্ণনা স্থানলাভ করেছে। যেমন—

"এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।"

"সৃষ্টিকালে যেদিন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমন্ডল নির্মাণ করিলেন, তখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই।"...

বাইবেলের আদিপুস্তকে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে দ্বিতীয় বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে প্রথম বর্ণনার পরে পরেই ঃ

"সৃষ্টিকালে যেদিন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল নির্মাণ করিলেন, তখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত নেই। সে সময়ে পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন উদ্ভিদ হইত না, আর ক্ষেত্রের কোন ঔষধি উৎপন্ন হইত না; কেননা, সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষাণ নাই, আর ভূমিতে কৃষিকর্ম করিতে মনুষ্য ছিল না। আর পৃথিবী হইতে কুজ্ঝটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলসিক্ত করিল। আর সদাপ্রভূ ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মানুষকে) নির্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন। তাহাতে মনুষ্য সজীব হইল।" (সূত্র ঃ পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক, ২ ঃ ৪-৭)

অতঃপর বাইবেলের ৮ থেকে ১৭নং বাণীতে ভূ-স্বর্গের বর্ণনা রয়েছে এবং এরপর প্রাণিজগৎ ও নারী-সৃষ্টির বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

"আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভালো নয়। আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্মাণ করি। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্যপশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্মাণ করিলেন, পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন, তাহা জানিতে সে-সকলকে তাঁহার নিকট আনিলেন, তাহাতে আদম যে সজীব প্রাণীর যে নাম রাখিলেন, তাহার সে নাম হইল। আদম যাবতীয় গ্রাম্যপশুর ও খেচর পক্ষীর ও যাবতীয় বন্যপশুর নাম রাখিলেন, কিন্তু

মনুষ্যের জন্য তাঁহার সহকারিণী পাওয়া গেল না। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন, আর তিনি তাহার একখানা পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সে স্থান পুরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাহাকে আদমের নিকট আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার (হইয়াছে); ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস, ইহার নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন। এই কারণে মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে। তখন আদম ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিতেন, আর তাহাদের লজ্জাবোধ ছিল না।" – দ্বিতীয় অধ্যায়, বাণী ১৮ থেকে ২৫ ঃ

সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে বাইবেলের পর্যালোচনা

বিশ্বসৃষ্টি ও মানুষের আদি উৎস-সংক্রান্ত বাইবেলের আদিপুস্তকের উদ্ধৃত বক্তব্যসমূহের একাধিক পর্যায়ে গরমিল সচেতন কোন পাঠকের নজর এড়াবার কথা নয়। বিশেষত, মানুষের— সেই মানুষ পুরুষ হোক বা নারী হোক— আদি উৎস-সম্পর্কিত বিষয়ের সামঞ্জস্যহীনতা খুবই প্রকট। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতে বিভিন্ন জীব-জানোয়ারের আবির্ভাবের তুলনায় মানুষের আবির্ভাবের সময়কালের গরমিলও অস্বাভাবিক নয়। তদুপরি, মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে বাইবেলে যে ধারণা দেয়া হয়েছে, যেকোন তাৎপর্যেই তার অর্থ খুঁজে বের করা মুশকিল। বিশেষ করে বাইবেলের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদসমূহের প্রেক্ষপটে এই অর্থ নির্ণয় সত্যি দুরূহ। তবে, যদি বাইবেলের এসব বক্তব্য সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় আনা যায়, তবে সে-সবের একটা অর্থ যে দাঁড়ায় না, তা নয়। এই কারণেই এখানে এই পর্যালোচনায় বাইবেলের উভয় পাঠ বা রচনার উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল ঃ এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্যাবলীর নিরিখে আলাদা আলাদাভাবে বাইবেলের ওইসব বক্তব্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হল ঃ

জেহোভিস্ট পাঠ ঃ পর্যালোচনা

বাইবেল আদিপুস্তকের জেহোভিস্ট রচনায় শুধু একবারই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টির বিষয়টা উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, সেখানে প্রাধান্য দিয়ে আলোচিত হয়েছে মানুষ-সৃষ্টির বিষয়টি। কিন্তু কথা সেটি নয়। কথা হচ্ছে, বাইবেলের এই জেহোভিস্ট রচনায় বিশ্বসৃষ্টির কাহিনী যেভাবে শুরু করা হয়েছে,

তা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্যের সঙ্গে আদৌ অসঙ্গতিপূর্ণ। যেমন, আদিপুস্তকের এই জেহোভিস্ট পাঠে বলা হয়েছে যে, মানুষ যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন পৃথিবীতে গাছপালার কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং তখনও 'সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষাণনি, আর ভূমিতে কৃষিকর্ম করিতে মনুষ্য ছিল না।"

এই বর্ণনায় আরও দেখা যাচ্ছে, বিধাতা "ধূলির মানুষকে" মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এ বক্তব্যের দ্বারা পৃথিবীর মাটি থেকে মানব-সৃষ্টির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এই প্রতীকী বর্ণনার দ্বারা 'মাটিকে' 'মানব-সৃষ্টির উৎস' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ, উপরের এতদালোচনায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনা সেকেরডোটাল পাঠে মানুষের সৃষ্টিতে 'মৃত্তিকার' কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

জীবজগতের আদি উৎস সম্পর্কে *'রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন অব বাইবেলের'* (১৯৫২) জেহোভিস্ট রচনায় বলা হয়েছে ঃ

"সদাপ্রভু ঈশ্বর সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী সৃষ্টি করিলেন।" (বাণী ১৯)

এখানে কিন্তু এই সকল বন্য পশু ও পাখির আদি উৎস সম্পর্কে তেমন কিছুই বলা হয়নি। পক্ষান্তরে, ফরাসী ভাষার বাইবেলের (ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল) একই বাণীতে বলা হয়েছে ঃ "এভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বর পুনরায় মৃত্তিকা হইতে বন্য পশুসকল ও আকাশের পক্ষীসকল সৃষ্টি করিলেন। (বাংলা বাইবেলের ১৯৭৩ সংস্করণের বক্তব্যও অনেকটা ফরাসী বাইবেলের অনুরূপ) অর্থাৎ ফরাসী (এবং বাংলা) বাইবেল থেকে দেখা যাচ্ছে, সকল জীবন্ত যেমন প্রাণী মানুষ পশু-পাখি ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছিল মাটি থেকে। অন্যদিকে ইংরেজি, ফরাসী (কিংবা বাংলা) বাইবেলে মানুষ সৃষ্টির কতকাল আগে অথবা কতকাল পরে জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। [বাইবেলের উভয় পাঠে অবশ্য দেখা যায়, "তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন তাহা দেখার জন্য (স্রষ্টা) সেই সকলকে তাহার (আদমের) নিকট আনিলেন]" এরদ্বারা অবশ্য বলা হচ্ছে না যে, জন্তু-জানোয়ার মানুষের আগে-না-পরে সৃষ্টি হয়েছিল। জেহোভিস্ট পাঠের শেষপর্যায়ে নারীকে পুরুষের দেহাংশ থেকে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। সেকেরডোটাল পাঠে অবশ্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোন বিবরণ নেই।

বলা অনাবশ্যক যে, জেহোভিস্ট পাঠ এ ধরনের প্রতীকীর ব্যবহারের জন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। যেমন, মানুষ যে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি সেই বিষয়টার উপরে

এর লেখকদের সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের প্রতীকী বক্তব্যের শব্দচয়নেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন, প্রথম মানুষের নাম হচ্ছে, আদম। এই 'আদম' শব্দটি হিব্রু ভাষায় কালেকটিভ নাউন বা সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (আকারে একবচন কিন্তু অর্থে বহুবচন)। এই 'আদম' শব্দটি এসেছে 'আদামা' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'মৃত্তিকা'।... ... ...

এ কথা স্বীকার্য যে, মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য মৃত্তিকার উপরে নির্ভরশীল। এভাবে আরো একটি প্রতীকী শব্দ এই জেহোভিস্ট পাঠে বিদ্যমান। শব্দটি হচ্ছে, 'প্রত্যাগমন'। 'মানুষের পতনের' অধ্যায়ে (আদিপুস্তক, ৩১, ১৯-২০ আদম সন্তান ও সমস্ত জীবন্তবস্তুর ভাগ্যলিপি অভিন্ন বলে বাইবেল-লেখক উল্লেখ করেছেন। বলেছেন ঃ "সকলে একস্থানে যাইবে, সকলে ধূলি হইতে এবং সকলে ধূলিতে মিশিয়া যাইবে।" [বাংলা বাইবেলে আছে ঃ "তুমি তো তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিভেদ প্রতিগমন করিবে।" এখানে বহুবচন অনুপস্থিত।

মৃত্তিকায় মানুষের এই প্রত্যাগমনের বিষয়টি গীত-সংহিতায় (১০৪, বাণী ২৯) পুনরুল্লিখিত হয়েছে; এবং *বুক অব জব বা ইয়োব* পুস্তকেও (৩৪, ১৫) এই ধারণার উল্লেখ দেখা যায়।

এ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট, তা হল, মৃত্যুর পর মানুষের ভাগ্যে কি ঘটবে, বাইবেলের সেই বর্ণনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ ধর্মীয় অর্থ আরোপ করা হয়েছে। অন্যকথায়, এভাবেই আদিপুস্তকের জেহোভিস্ট পাঠে মানুষের আদি উৎপত্তিস্থলকে তার শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। মোদ্দাকথা, এই যে, গোটা বিষয়টাকে এই বর্ণনায় জাগতিক কোন বিষয় হিসেবে গ্রহণের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকছে না। সুতরাং, তা থেকে ধর্মীয় কোন তাৎপর্য খুঁজবারও কোন প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে না। অর্থাৎ, বর্ণিত এই বিষয়টা পরিপূর্ণরূপে নিরেট একটি ধর্মীয় ভাবধারার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, জেহোভিস্ট পাঠে পৃথিবী ও আকশমণ্ডল সৃষ্টির বিষয়টা অত্যন্ত সাদামাটাভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ কিভাবে সেই সৃষ্টিকর্ম সম্পাদিত হয়েছিল তার কোন বিবরণ সেখানে স্থান পায়নি।

এককালের একমাত্র ঐতিহাসিক স্বীকৃত দলিল

আধুনিক বিজ্ঞানযুগের সূচনার পূর্বপর্যন্ত বাইবেলের এই আদিপুস্তকের (উল্লিখিত উভয় পাঠ সম্বলিত) বর্ণনাই ছিল দুনিয়াতে মানুষ এবং অপরাপর জীবন্ত প্রাণীর আবির্ভাব সম্পর্কিত একমাত্র ঐতিহাসিক ও স্বীকৃত দলিল। অন্যকথায়, আধুনিককাল পর্যন্ত বাইবেলই ছিল এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞানের একমাত্র মৌল উৎস। এদিকে, আধুনিক যুগে এসে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের ফসিল বা জীবাশ্ম আবিষ্কার করতে সমর্থ হন। এসব ফসিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়, তা অনেকটা বিস্ময়কর। কিন্তু, বাইবেলের বর্ণনাকে অস্বীকার করার ব্যাপারটা তখন ছিল অভাবিত। সুতরাং, প্রথম প্রথম প্রকৃতি-বিজ্ঞানীমাত্রই বাইবেলের বক্তব্যের সঙ্গে ওইসব আবিষ্কার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য বিধানে উঠেপড়ে লাগেন। যেমন— বাইবেলে রয়েছে, প্রতিটি প্রাণীকে তাদের নির্ধারিত গঠন-কাঠামো দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এই অবস্থায় সেকালের প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা ধারণা করতে শুরু করেন যে, প্রাপ্ত ফসিলসমূহ সম্ভবত প্লাবন বা ওই ধরনের কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিণতি। অর্থাৎ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবকিছু ধ্বংস হলে পরে, নতুন গঠন-কাঠামো দিয়ে নতুন করে প্রাণিকুল সৃষ্টি করা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এসেও বিজ্ঞানী কভিয়ার দৃঢ়তার সঙ্গেই এই অভিমত সমর্থন করেন। পরবর্তী পর্যায়েও দীর্ঘদিন যাবত এই মতবাদের প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ন। এমনকি, ১৮৬২ সালেও বিজ্ঞানী অলসাইড ডি অরবিগনি উল্লেখ করেছেন যে, সৃষ্টির সূচনা থেকে তখন পর্যন্ত নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পৃথিবীর সবকিছু কমপক্ষে সাতাশবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং প্রতিটি ধ্বংসকাণ্ডের পর সবকিছু নতুন করে সৃষ্টি করা হয়!

মূলত, বাইবেলের একটি ত্রুটিপূর্ণ বিবরণ থেকেই এই ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য, বাইবেলের বিবরণটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল ঠিকই; কিন্তু তার থেকে গৃহীত ধারণাটি ছিল আরো বেশি ত্রুটিপূর্ণ এবং অনেক বেশি বিভ্রান্তিকর। যেমন,

বাইবেলে বলা হয়েছিল যে, নূহের তুফানে দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল (যা আধুনিক আবিস্কৃত তথ্য ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের নিরিখে আদৌও সত্য নয়) ।

পূর্বোল্লিখিত প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা বাইবেলের এই ভুল বক্তব্যকে সম্বল করেই তাদের 'নব-সৃষ্টির ধারণা' গড়ে তুলেছিলেন। অথচ, যত ভুলভাবেই বর্ণিত হোক, বাইবেলে এ কথাও বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হলেও নূহের জাহাজে চড়ে রক্ষা পেয়েছিলেন কতিপয় মানুষ এবং তাঁরা তাঁদের সঙ্গে জাহাজে তুলে নিয়েছিলেন জোড়ায় জোড়ায় জন্তু-জানোয়ার। দুনিয়ার মানবজাতি এবং জন্তু-জানোয়ার নূহের সেই জাহাজে রক্ষাপ্রাপ্তদেরই বংশধর। সুতরাং, বাইবেলে এ কথা বলা হয়নি যে, তুফানের বিপর্যয়ের পর আবার সবকিছু নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছিল। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ত্রুটি ছিল প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের ঃ এজন্য এই বক্তব্য ভুল হলেও বাইবেলকে দায়ী করা যায় না।

বাইবেল নতুন নিয়ম ঃ পর্যালোচনা

বাইবেলের নতুন নিয়মে (ইঞ্জিল শরীফ) মথি ও লুক-রচিত সুসমাচারে যীশু বা হযরত ঈসার (আঃ) বংশলতিকা বা কুর্সিনামা বিদ্যমান। মথি-লিখিত সুসমাচারে হযরত ঈসার (আঃ) এই কুর্সিনামা টানা হয়েছে হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে; আর লুক-রচিত সুসমাচারে এই বংশ-তালিকা ঠেকেছে হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত। অবশ্য, এই উভয় বংশলতিকা মূলত যোসেফের (যীশুখ্রিস্টের সৎ বাপ); যাঁর সঙ্গে যীশুখ্রিস্টের জন্মসূত্রের কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে, কম করে বললেও বলতে হয় যে, বাইবেল নতুন নিয়ম বা ইঞ্জিল শরীফে বর্ণিত যীশুর এই উভয় কুর্সিনামাই অযৌক্তিক ও অবান্তর।

মথি ও লুক উভয়ে অবশ্য যীশুর এই বংশলতিকা প্রণয়নে বাইবেল পুরাতন নিয়মের বিবরণীকে সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারপর নিজ নিজ উদ্দেশ্য পূরণের মানসে সেই সূত্রেরও হেরফের ঘটিয়েছেন যথেচ্ছাভাবে। হযরত ঈসার (আঃ) কুর্সিনামা প্রণয়নে এই দুই সুসমাচার রচয়িতার বর্ণনার মধ্যে যে গরমিল, তার কারণ এটাই।

কোরআনের আলোকে ঃ মানব-সৃষ্টি

মানব-সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে বাইবেলের বক্তব্যের সাথে কোরআনের বক্তব্যের তুলনামূলক বিচার-পর্যালোচনা এবং তার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা হয়নি বললেই চলে। ফলে, এ ব্যাপারে অনেকেরই তেমন কোন ধারণা গড়ে উঠতে পারেনি। পক্ষান্তরে, কোরআন কিভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল, আর অবতীর্ণ সেই ওহী কিভাবে সংরক্ষিত হয় এ যাবতকাল আসমানী কিতাব হিসেবে চালু রয়েছে, পাশ্চাত্যের লোকজনের এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকের সে সম্পর্কে ধারণা খুবই কম। এ ধরনের শিক্ষিত যে-কেউ মানব-সৃষ্টি মত বিজ্ঞানধর্মী আলোচনা-বিশ্লেষণে কোরআনের বক্তব্য নিয়ে সম্পূর্ণ একটি অধ্যায় ব্যয় করতে দেখে যে বিস্মিত হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁদের এই বিস্ময় অবশ্য অকারণে নয়। কেননা, পাশ্চাত্য (এবং আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কোন কোন মহলে) ইসলাম ও কোরআন সম্পর্কে আগাগোড়া ভুল ধারণা বিদ্যমান। সত্যি বলতে কি, ইসলাম ও কোরআন-সম্পর্কিত এহেন ভুল ধারণার মধ্যেই বেশিরভাগ আধুনিক শিক্ষিত মানুষের বেড়ে ওঠা, গড়ে ওঠা এবং এমনকি বসবাস পর্যন্ত সম্পন্ন হয়ে থাকে। পাশ্চাত্যের কথা বলতে গেলে নিজের কথাই বলতে হয়। ড. মরিস বুকাইলি জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন অনুরূপ ভুল ধারণার মধ্যে। ইসলাম সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিত মহলে ভুল ধারণা যে কি রকম, সে সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতা থেকে দু'একটা উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ড. মরিস বুকাইলি বলেন, লেখাপড়া শিখে আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, তখনকার কথা। গোড়া থেকেই আমাকে সবদিক দিয়ে একটি কথা শেখান হচ্ছিল, যে কোরআন হচ্ছে 'মেহোমেটের' রচিত একখানি 'পুস্তক'। 'মেহোমেট' অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) যে কোরআনের লেখক বা রচয়িতা, সেই কথাটা আমি কোরআনের এক ফরাসী অনুবাদের ভূমিকাতেও দেখেছি। শুধু তাই নয়, আমার শিক্ষাজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে বারবারই যে কথাটা আমার মনে গেঁথে দেয়ার প্রয়াস

চলেছে, তাহল, কোরআনের লেখক (অর্থাৎ 'মেহোমেট') কোরআন রচনা করেছেন, আগাগোড়া বাইবেল নকল করেই। তবে সেই নকলের বেলায় তিনি কিছুটা ভিন্নধারা অবলম্বন করেছেন। যেমন, বাইবেলে বর্ণিত বিভিন্ন 'পবিত্র কাহিনী' সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি কোন কোন অনুচ্ছেদ কাটছাঁট করেছেন; কোন কোন স্থানে কিছুটা যোগ-সংযোগও করেছেন এবং তার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়েছেন— যে ধর্মের তিনি প্রচারক বলে দাবি করেছেন— সেই ইসলাম ধর্মের কিছু রীতি-নিয়ম আর কিছু নীতি-আদর্শের কথা!

এখন স্মরণযোগ্য যে, এই যুগেও ফ্রান্সসহ পাশ্চাত্য জগতে এবং প্রাচ্যের আধুনিক শিক্ষিত মহলে 'ইসলাম-বিশারদ' হিসেবে খ্যাতিসম্পন্ন একধরনের 'পণ্ডিত' ব্যক্তি রয়েছেন। পেশায় এঁরা বেশিরভাগই শিক্ষক। এঁরা প্রায় সবাই 'কোরআন' ও 'মেহোমেট' সম্পর্কে কমবেশি উপরে যেভাবে বলা হয়েছে, তদনুরূপ ধারণাই পোষণ করেন। তবে, তাঁদের মধ্যে কারোকারো প্রকাশভঙ্গি কিছুটা শালীন, কৌশলপূর্ণ ও সূক্ষ্ম।

কোরআনের 'মূলসূত্র' সম্পর্কে এই যে প্রচারণা— যা শিক্ষা প্রদানের নাম করে প্রচার করা হয়ে থাকে, তা কিন্তু সত্যের ধারে-কাছেও কিছু নেই! তবুও, কোরআন সম্পর্কে এই অসত্য শিক্ষা কখনো সরাসরি, আবার কখনো সুকৌশলে সর্বত্র প্রচার করা হয়। আর এই ধরনের শিক্ষায় 'শিক্ষিত' হয়ে যারা 'বড়' হচ্ছেন, তাঁরা যে দেশের বা যে ধর্মেরই হোন-না-কেন, তাঁরা ধরেই নিচ্ছেন যে, বিজ্ঞান-সম্পর্কিত বিষয়ে বাইবেলে যে ধরনের ভুলের গোনজায়েশ রয়েছে, কোরআনও তা থেকে মুক্ত নয়।

প্রকৃতপক্ষে, কোরআন সম্পর্কে যে-সব 'শিক্ষা' ও 'প্রচার' সর্বত্র চালু রয়েছে, তাতে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সেই প্রচারণায় অনুপ্রাণিত যে-কারো পক্ষে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো খুবই স্বাভাবিক। অথচ কে তাঁদের বুঝাবে যে, তাঁদের সেই সিদ্ধান্তটি তো বটেই, সেই সিদ্ধান্তের মূলে কার্যকর যে শিক্ষা ও প্রচারণা— তাও আগাগোড়া অসত্য, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ওহীর মাধ্যমে ৬১০ থেকে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোরআন মোহাম্মদের (দঃ) উপরে নাজিল হয়। তখন শুধু প্রাচ্যে নয়, পাশ্চাত্যেও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিরাজ করছিল অজ্ঞানতার এক নিদারুণ অন্ধকার। সেই অন্ধকারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো জ্বালাবার পথেও ছিল হাজারটা প্রতিবন্ধকতা। সময়ের উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্সের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ফ্রান্সে তখন রাজত্ব করছিলেন রাজা ডগোবার্ট— মেরোভিঙ্গায়ান বংশের শেষ নরপতি।

এখন কোরআনের বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বক্তব্য সম্পর্কে সাধারণ শিক্ষিতমহলে যে ধারণা গড়ে উঠেছে, উপস্থিত ক্ষেত্রে অনেকের নিকট তা 'যৌক্তিক' বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের প্রেক্ষাপট বিচার-বিবেচনা করে দেখলে স্পষ্ট হয় যে, তাঁদের ওই ধারণা শুধু অমূলক নয়, অবান্তরও বটে। তদুপরি, কোরআনের বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বিভিন্ন বক্তব্য সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক তথ্য-জ্ঞানের সহায়তায় বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটাও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে যে, কোরআন সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিত মহলের ওইসব তথাকথিত ধারণার অবস্থান আসল সত্য থেকে বহুদূরে। পরবর্তী পর্যালোচনায় বিষয়টি আরো বিশদভাবে ফুটে উঠবে।

কোরআনের বিজ্ঞান-সম্পর্কিত কোন বক্তব্য যখন আধুনিক জ্ঞান-গবেষণার নিরিখে সত্য হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং একইসঙ্গে বাইবেলের বা অন্যকোন ধর্মের ধর্মগ্রন্থের অনুরূপ কোন বক্তব্য বিজ্ঞানের অনুরূপ কষ্টিপাথরে অগ্রহণযোগ্য বলে প্রতিপন্ন হয়, তখন আধুনিক শিক্ষিত মানুষমাত্রই একধরনের মর্মবেদনায় ভুগতে শুরু করে দেন। তখন তাঁরা তড়িঘড়ি এই মর্মে জবাব দিয়ে বলেন যে, বাইবেলের বা অন্যধর্মের ধর্মগ্রন্থের অনেক পরে কোরআন রচিত এবং সেই মুদ্দতে আরব বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও বিজ্ঞানে বহু উন্নতি সাধন করেছিলেন। ফলে, কোরআনের বক্তব্য বৈজ্ঞানিক সত্যের অত কাছাকাছি হতে পেরেছে, ইত্যাদি।

অথচ, এই বক্তব্য রাখতে গিয়ে ওইসব শিক্ষিত ব্যক্তি বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস একেবারেই ভুলে যান। সত্য বটে, মহান ইসলামী

সভ্যতার আমলে মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও গবেষণায় প্রভূত উৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে একথা আরো বেশি সত্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম মনীষীদের সেই তরক্কী সাধিত হয়েছিল কোরআন নাজিল হওয়ার শতাব্দী কয়েক পরে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের ইতিহাস আরও জানায় যে, এই পুস্তকে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কিত যে বিষয়টি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করেছি, অন্যধর্মের ধর্মীয়গ্রন্থের সময়কাল থেকে তো বটেই এমনকি বাইবেলের আমল থেকে শুরু করে কোরআন নাজিলের সময়কাল পর্যন্ত ওই বিষয়ে আদৌ জ্ঞান-বিজ্ঞানের তেমন কোন গবেষণা কিংবা আবিষ্কার সাধিত বা সম্পাদিত হয়নি।

কোন কোন শিক্ষিত মহলকে আরো একটি কথা বলে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে দেখা যায়। কথাটা হল, কোরআনের বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বাণী ও বক্তব্য সম্পর্কে এখন যে-সব কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে কোরআনের অনুবাদকর্মে কিংবা টীকা ভাষ্যমূলক গ্রন্থে সেগুলো উল্লেখ নেই কেন? এমনকি কোরআনের আধুনিক যে-সব অনুবাদ, তাফসীর ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ সেগুলোতেও এসবের কোন ইঙ্গিত-ইশারা তো দেখা যায় না। এর জবাব কোথায়?

অস্বীকার করার উপায় নেই, আধুনিক শিক্ষিত মহলের এসব বক্তব্য যুক্তিসঙ্গত এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নিকট এ ধরনের যুক্তি গুরুত্বপ্রাপ্তিরও হকদার। কোরআনের ফরাসী অনুবাদকর্মের কথাই ধরা যাক। অমুসলিম কোন পণ্ডিতের এমনকি বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ কোন মুসলিম ভাষাবিদ-কর্তৃক সম্পাদিত কোরআনের ফরাসী অনুবাদেও বিজ্ঞান-সম্পর্কিত তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন টীকা-ভাষ্য, মন্তব্য কিংবা পর্যালোচনা অনুপস্থিত। (অপরাপর ভাষার অনুবাদকর্মেও এ কথা খাটে)। কারণ, আর কিছুই নয়, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে ওইসব অনুবাদক ও ভাষ্যকার মূলত বিজ্ঞ-বিদগ্ধ ভাষাবিদ পণ্ডিত (কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে বলতে গেলে অনবহিত)। তাই দেখা যায়, কোরআনের যে-সব অনুচ্ছেদে বা অধ্যায়ে বিজ্ঞানের বিষয় বিদ্যমান বেশিরভাগক্ষেত্রে সে-সবের অনুবাদ হয় ভ্রান্তিপূর্ণ; নতুবা সে-সবের ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর। সত্যি কথা বলতে কি, কোরআনের মত বিজ্ঞানময় একটি ধর্মগ্রন্থের অনুবাদের জন্য যা অত্যাবশ্যক, তাহল, আরবী ভাষার সুগভীর জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞানের সবকয়টি শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। কোরআন-পাঠককে সর্বাগ্রে বুঝে নিতে হবে যে, কোরআনের মূল আরবীতে সঠিক কোন্ বক্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে; তারপর আসবে অন্যভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক সেই বক্তব্যের যথাযথ রূপান্তর ও পরিস্ফুটনের প্রশ্ন।

কোরআনের বিজ্ঞান-বিষয়ক আয়াত বা অনুচ্ছেদের ভুল তরজমা ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আরো একটি কারণ বিদ্যমান। সে কারণটি হল, আধুনিক অনুবাদক কর্তৃক আদিযুগের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারদের অন্ধ-অনুসরণ। প্রচলিত ঐতিহ্যের ধারায় প্রাচীনযুগের অনুবাদক ও তফসীরকারদের টীকা-টিপ্পনী, মন্তব্য, বক্তব্য ও বিশ্লেষণকে প্রায়ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত, অলঙ্ঘনীয় ও অপ্রতিরোধ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রাচীনযুগের ওইসব তর্জমাকারী ও তাফসীরকারদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মনীষার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয় যে, তাঁরা আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা ও আবিষ্কার থেকে বহুদূরে অবস্থান করতেন। সেই প্রাচীনযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আবিষ্কার ও গবেষণা ছিল একেবারেই অভাবিত। ফলে, আধুনিক যুগের সেক্যুলার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও চর্চা মানবজাতিকে যা-কিছু উপহার দিয়েছে— তার আলোকে সে-যুগে বসে কোরআনের বিজ্ঞান-সম্পর্কিত কোন বাণী বা বক্তব্যের অর্থ ও তাৎপর্য উদ্ধার আক্ষরিক অর্থেই ছিল অকল্পনীয়। সে কারণে সে যুগের অনুবাদে ও ব্যাখ্যায় কোরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক মূল শব্দের সঠিক অর্থ ও যথাযথ তাৎপর্য অনধিগত থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল না মোটেও। আর এতসব কারণে কোরআনের প্রাচীন ও আধুনিক অনুবাদ ও তফসীরসমূহ সম্পূর্ণ ভুল তরজমা ও অযথার্থ ব্যাখ্যা না হলেও কোন কোন বিষয়ে ও ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর অনুবাদ ও অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হিসেবে চালু রয়েছে। বিভ্রান্তির এই বেড়াজাল থেকে কোরআনের বিজ্ঞান-বিষয়ক বাণী ও বক্তব্যকে মুক্ত করতে চাইলে অনুবাদককে মূল আরবী ভাষায় কোরআন বুঝার মত ভাষাজ্ঞান ও পারদর্শিতা যেমন অর্জন করতে হবে; তেমনি তাঁকে একইসঙ্গে হতে হবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবিশেষ বিজ্ঞ ও যথার্থ অভিজ্ঞ।

কোরআনের অনুবাদ প্রসঙ্গ

প্রকৃতপক্ষে, আরবী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করে মূল আরবীতে কোরআন অধ্যয়ন ও অনুধাবন করার পূর্বপর্যন্ত— শুধু অনুবাদের মাধ্যমে কোরআনের বহু শব্দের ও আয়াতের অর্থ ও তাৎপর্য ড. মরিস বুকাইলির নিকট সুস্পষ্ট হয়নি। এরপর ড. মরিস বুকাইলি কোরআনের মূল আরবী শব্দের সঠিক অর্থ জেনে নেয়ার ব্যাপারে ব্রতী হলেন। আরবী ভাষা শিখলেন। অতঃপর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে কোরআনে ব্যবহৃত বিভিন্ন আরবী শব্দের মূল অর্থ ও তাৎপর্য অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করলেন। এভাবে, শেষপর্যন্ত এই কোরআন থেকে বিজ্ঞান-বিষয়ক এমনসব তথ্য ও বক্তব্য তিনি পেয়েছেন— যেকোন বিচারে তা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ বলে তাঁর নিকট মনে হয়েছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব ও কোরআন

ড. মরিস বুকাইলি ১৯৭৬ সালের ৯ নভেম্বর ফ্রেঞ্চ মেডিসিন একাডেমীতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সেই ভাষণে প্রথম তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন যে, "তাঁর" সম্পর্কে কোরআনের প্রত্যেকটি বক্তব্য আধুনিক গবেষক, বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের মনোযোগ আকর্ষণের দাবিদার। তাঁর সেই ভাষণটির শিরোনাম ছিল ঃ *"ফিজিওলজিক্যাল এ্যান্ড এমব্রাইওলজিক্যাল ডেটা ইন দ্য কোরআন।"* এটি ১৯৭৬ সালেই ফ্রেঞ্চ মেডিসিন একাডেমী কর্তৃক বুলেটিন আকারে প্রকাশিত হয়। ওই ভাষণে তিনি আরো দেখানোর প্রয়াস পান যে, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে কোরআনের যে বক্তব্য, তা পরিমাণে প্রচুর এবং কোরআনের ওইসব বক্তব্যে বিশ্লেষণে এতদসংক্রান্ত আরো বহু তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি সম্ভব।

তাঁর উক্ত ভাষণে মানুষের আদি উৎস সম্পর্কিত কোরআনের যেসব বক্তব্য আলোচিত হয়েছিল, তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য বাইবেলের বক্তব্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু তাই নয়, বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে কোরআনের ওইসব বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষণাজাত তথ্য-পরিসংখ্যানের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে যে, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী— এককথায় গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুই মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান; এবং মহাশূন্যের ঘূর্ণায়মান প্রতিটি বস্তুই বিবর্তনের ধারায় ক্রমবিকাশমান। এসব বিষয়ে কোরআনের বক্তব্য বিজ্ঞানের সুপ্রমাণিত তথ্যের সাথে বলতে গেলে অভিন্ন।

পবিত্র কোরআন বহু আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, মানুষের দ্বারা মহাশূন্য বিজিত হবে।

পবিত্র কোরআনে চৌদ্দ শ' বছর আগেই পানি-প্রবাহের গতিপথ ও ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে যে-সব বক্তব্য দেয়া হয়েছে একমাত্র আধুনিক যুগে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার আলোকে সে-সব সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাঁরা কোরআনের বক্তব্য বিশ্লেষণে আগ্রহী হবেন, পূর্বোক্ত তথ্যাবলী তাঁদের বিস্মিত না করে পারবে না। আমাদের এই গবেষণা-পুস্তকে এসববিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত ও পর্যালোচিত হবে। এখানে গোড়াতেই আবারও বলে নিতে চাই যে, আমাদের এই পর্যালোচনায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার সেই মূল ধারাটি অক্ষুণ্ন থাকবে— বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের যাবতীয় গবেষণা যে ধারায় পরিচালিত হয়। সেই নিরিখে আরো একটি কথা বলে নিতে চাই। তাহল, সার্ধ চৌদ্দশ' বছর আগে অবতীর্ণ কোরআনের মত একটি ধর্মগ্রন্থে কিভাবে এহেন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সুপ্রমাণিত এবং বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত স্থানলাভ করতে পেরেছে— সেই বিষয়টিই মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির কাছে বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে বিরাজ করছে।

মানব-সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গ

মানব-সৃষ্টিতত্ত্ব প্রসঙ্গে যেমন, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে কোরআনে যে ধরনের তথ্য-উপাত্ত বিদ্যমান, সেই ধরনের কোন তথ্য-উপাত্ত কিন্তু বাইবেলের কোথাও পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে বাইবেলের যে বক্তব্য, কিংবা বাইবেলের আদিপুস্তকে আদি মানুষের বংশধারার যে বিবরণ, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণা-আবিষ্কারের আলোকে তা আড়াগোড়াই ভ্রান্তিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কোরআনে মানুষের আদি উৎস সম্পর্কে এ ধরনের ভ্রান্তিপূর্ণ কোন তথ্য নেই।

কথা উঠতে পারে যে, কোরআনের কোন প্রাচীন পাণ্ডুলিপিতে সম্ভবতঃ ওই ধরনের ভ্রান্তিপূর্ণ তথ্য ছিল; পরে যখন ওইসব তথ্য-উপাত্ত ভুল বলে প্রমাণিত হয় তখন পরবর্তী প্রকাশনার ক্ষেত্রে কোরআন থেকে ওইসব ভ্রান্তিপূর্ণ তথ্য-পরিসংখ্যান বাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু, এই বক্তব্য যে আদৌ সঠিক নয়, কোরআন সংরক্ষণের ইতিহাস বিচার-পর্যালোচনায় তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

প্রথমত, বাইবেলের ওইসব তথ্য-পরিসংখ্যান যে ভ্রান্তিপূর্ণ, তা যে ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আবিষ্কার ও বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, সেই ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিশ্লেষণ কিন্তু একান্ত হালের ঘটনা।

দ্বিতীয়ত, কোরআনের সেই আদিযুগের প্রাচীনতম কপি এখনো বিদ্যমান। পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রায় দেড় হাজার বছরের প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপির সাথে যেমন, তেমন হাজার বছরের অধিককাল পূর্বের প্রচলিত কোরআনের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির সাথেও বর্তমান চালু কোরআনের কোন সূরা কিংবা আয়াত তো দূরের কথা, একটা হরফেরও কোন গরমিল পাওয়া যায়নি।

সুতরাং, পুর্নবার ব্যক্ত করতে হচ্ছে, 'মোহাম্মদ (দঃ) নিজেই কোরআন রচনা করেছেন বলে যে অভিযোগ তা ভিত্তিহীন, তাহলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন না উঠে পারে না যে, সে যুগে বসে বাইবেল নকল করে কোরআন রচনা করতে

গিয়ে তিনি কিভাবে বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রত্যকটি ভুলক্রটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সনাক্ত করলেন ও বাদ দিতে পারলেন? শুধু কি তাই? একইসঙ্গে মোহাম্মদ (দঃ) সে যুগে বসে কিভাবেই বা অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণা ও আবিষ্কারের সাথে একান্ত সঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য রচনা করে নিয়ে বেছে বেছে সে-সব স্থানে বসাতে পারলেন?

এই পর্যায়ে আবার যে কথাটি অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে, তাহল, বাইবেল সঙ্কলনের কাল থেকে শুরু করে মোহাম্মদের (দঃ) আমল পর্যন্ত সময়ের যে সুদীর্ঘ ব্যবধান, সেই প্রেক্ষিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমনকিছু তথ্য-পরিসংখ্যান আবিস্কৃত হয়নি কিংবা বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে এমন কোন গবেষণাও পরিচালিত হয়নি— যার দ্বারা বাইবেলের বিজ্ঞান-সংক্রান্ত ওইসব বক্তব্য ভুল বলে সাব্যস্ত হতে পারে এবং সঠিক বক্তব্য কারো হাতের নাগালে থাকতে পারে।

এই অবস্থায় বাইবেল কিভাবে প্রণীত ও সঙ্কলিত হল, সেই প্রশ্ন এসে পড়ে অনিবার্যভাবেই। ইতিপূর্বের পর্যালোচনায় জেনেছি, ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ববিদদের বক্তব্য এই যে, বাইবেলের পুরানো ও নতুন নিয়ম (অর্থাৎ প্রচলিত তাওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল) রচিত হয় ঐশ্বরিক প্রেরণায়। কোরআন সম্পর্কে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের বক্তব্য অবশ্য ভিন্ন। তাঁদের বক্তব্য, কোরআন সরাসরি ওহী বা প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণী। কিন্তু তবুও কোরআনের সেই বাণী কিভাবে প্রাপ্ত ও সংরক্ষিত এবং বিশেষত কোরআন সঙ্কলন সম্পর্কে ইতিহাসের বক্তব্য কি? এই গবেষণার স্বার্থেই তা বিচার-পর্যালোচনা করে দেখা দরকার।

মোহাম্মদের (দঃ) বয়স তখন ৪০ বছর। তিনি তখন প্রায়ই মক্কানগরীর বাইরে এক নির্জন স্থানে (হেরা পর্বতের গুহায়) যেতেন এবং সাধনায় নিমগ্ন হতেন। এখানেই তিনি একসময় ফেরেশতা জিবরাঈলের (আঃ)-এর মাধ্যমে লাভ করেন ওহী তথা আল্লাহ্র বাণী বা প্রত্যাদেশ। সময়টা হচ্ছে, ৬১০ খ্রিস্টাব্দ। কিছুদিন নীরবতার পর আবারও এই ওহী বা প্রত্যাদেশ আসা শুরু হয় এবং এভাবে একটানা দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে মোহাম্মদ (দঃ) যে-সব প্রত্যাদেশ লাভ করেন, সেই সব প্রত্যাদেশের সমষ্টিই হচ্ছে কোরআন।

মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই নাজিলকৃত ওইসব ওহী বা প্রত্যাদেশ সাহাবী-সঙ্গ-সাথীদের সহায়তায় দু'ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এক, লিখিতভাবে, দুই, মুখস্থ করে। মোহাম্মদের (দঃ) জীবদ্দশাতেই ওইসব ওহী বা

প্রত্যাদেশ বিভিন্ন সূরা বা অধ্যায়ে বিভক্তি করা হয় এবং ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর ওইসব লিখিত সূরা কিতাবের আকারে একত্রিত করা হয়। যেহেতু, মোহাম্মদের (দঃ) জীবদ্দশাতেই তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কোরআন লিখিত ও মুখস্থ উভয়প্রকারে সংরক্ষিত হয়, যেহেতু কিতাব হিসেবে সঙ্কলনের ক্ষেত্রে কোরআনের প্রত্যেকটি সূরার ও প্রতিটি আয়াত বা বাণীর সঠিকত্ব নির্ধারণে মোহাম্মদের (দঃ) সময়কালের লিপি এবং তাঁর সাহাবী-সঙ্গীদের মুখস্থ-জ্ঞান— এই উভয়ধারাই কাজে লাগানো হয় এবং যেহেতু সেই প্রথম যুগের সংরক্ষিত কোরআনের সঙ্গে বর্তমানে প্রচলিত কোরআনের বিন্দুমাত্র গরমিল নেই, সেহেতু নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, কোরআন এমন এক আসমানী কিতাব যা আগাগোড়া মানুষের হস্তক্ষেপমুক্ত।

কোরআনের মোট ২৯টি সূরার প্রথমে আলিফ, লাম, মিম, সোয়াদ, রা, কাফ, হা ইত্যাদি মোট ১৪টি হরফ ১৪ রকমে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব হরফকে বলা হয় 'হরফে মোকাত্তায়াত' বা 'রহস্যময় হরফ।' এতদিন এতকাল যাবত এসব হরফের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। একান্ত হালে এসে মিসরীয় বাহাই বিজ্ঞানী ডঃ রশীদ খলিফা কম্পিউটার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কোরআনের প্রতিটি সূরার সূচনায় 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বাক্যটি রয়েছে এবং ওই বাক্যটি আরবী ১৯টি হরফ দ্বারা গঠিত। যে সূরার শুরুতে যে কয়টি করে রহস্যময় হরফ রয়েছে, ওই সূরার মধ্যে যতগুলো ওই হরফ রয়েছে, তা একত্র করে নিয়ে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌র' এই ১৯ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মিলে যাবে। যেমন, সূরা বাকারার (২ নং সূরার) শুরু হয়েছে আলিফ, লাম ও মিম হরফ দিয়ে। এখন এই সূরার বাকারায় যতগুলো আলিফ হরফ, লাম হরফ ও মিম হরফ আছে, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সবগুলোর সংখ্যা আলাদা আলাদাভাবে ১৯ দ্বারা ভাগ করলে মিলে যায়। কোরআনের এই বৃহত্তম সূরাটির মধ্যে কোন রুকু বা অনুচ্ছেদ, আয়াত কিংবা বাণীর মধ্যে এমন কি কোন শব্দের বা হরফের মধ্যেও যদি কোন রদবদল সাধিত হত, তাহলে সংশ্লিষ্ট কোন হরফের সংখ্যা ১৯ দ্বারা ভাগ করলে মিলত না— এবং তখন গড়মিল ধরা পড়তই।

কোরআনের কোন আয়াতে এমনকি কোন শব্দেও যে মানুষের কোন হস্তক্ষেপ ঘটেনি, তার আর একটা বড় প্রমাণ হচ্ছে— সূরা আরাফ। কোরআনের এই ৭নং সূরা আরাফের ৬৯ আয়াতে রয়েছে একটি আরবী শব্দ ঃ 'বাস্‌তাতা'। এটি 'বাসাতা' শব্দ থেকে গৃহীত। আরবী ভাষায় সাধারণত এই 'বাসাতা' শব্দটি লিখিত হয় 'সিন' হরফ দিয়ে। কিন্তু কোরআনের এই 'বাসাতা'

শব্দযুক্ত শব্দটি লিখিত হয় 'সিন' হরফ দিয়ে। কিন্তু কোরআনের এই 'বাসাতা' শব্দযুক্ত আয়াত যখন নাজিল হয়, ফিরিশতা জিবরাঈল (আঃ) তখন শেষ নবীকে (দঃ) বলে দিয়েছিলেন, যাঁরা ওহী-লেখক, তাঁরা যেন এই আয়াতটি লিখতে 'বাসাতা' শব্দটিকে 'সিন' হরফ দিয়ে না লিখে 'সোয়াদ' হরফ দিয়ে লিখেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কম-বেশি ৪২ জন সাহাবী মোহাম্মদের (দঃ) উপরে নাজিলকৃত ওহী লিখে নিতেন। এইসব সাহাবী 'কাতেবে ওহী' বা 'ওহী-লেখক' নামে পরিচিত ছিলেন।

যাহোক, সেই থেকে কোরআনে সূরা আরাফের 'বাসাতা' শব্দটি 'সোয়াদ' হরফ দিয়ে লিখিত হয়ে আসা হচ্ছে— যদিও আরবী ভাষায় 'সোয়াদ' হরফে 'বাসাতা' বানান অশুদ্ধ। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে বসে একজন 'নিরক্ষর নবী' কেন আরবী ভাষার একটি চালু শব্দকে 'অশুদ্ধ বানানে' লিখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন,— এবং গত প্রায় দেড় হাজার বছরেও কোন আরবি ভাষাবিদ পণ্ডিত কোরাআন প্রকাশ কিংবা তরজমা করতে গিয়ে ওই 'বাসাতা' শব্দটি 'শুদ্ধ' করেননি, তার মাজেজা বা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কিছুদিন আগে কোরআনের এই কম্পিউটার নিরীক্ষায়। যেমন, কোরআনের মোট তিনটি সূরার শুরুতে 'সোয়াদ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ ৭নং সূরা আরাফে, ১৯নং সূরা মরিয়মে এবং ৩৮নং সূরা 'সোয়াদে'। কম্পিউটার গণনায় দেখা গেছে যে, এই তিনটি সূরা লিখতে গিয়ে 'সোয়াদ' হরফটি ব্যবহৃত হয়েছে মোট ১৫২ বার। পূর্বোক্ত 'অশুদ্ধ বানানে' লিখিত 'বাসতা' শব্দটির 'সোয়াদ' হরফটিও রয়েছে এই হিসেবের মধ্যে। কম্পিউটার গণনায় আরো দেখা গেছে, এই তিন সূরার 'সোয়াদ' শব্দের ১৫২ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা ভাগ করলে মিলে যায় ঃ (১৫২÷১৯ = ৮)।

বর্তমানে প্রচলিত বাইবেল যে সেই প্রাচীনকালের আদি ও অকৃত্রিম তাওরাত, জবুর ও ইঞ্জিলের অভিন্নরূপের সংকলন, সে কথা বলার উপায় নেই। পক্ষান্তরে, কোরআন প্রথম যুগের সেই প্রত্যাদিষ্ট বাণী যা এখনও অবিকৃত রয়েছে। আরবী ভাষায় অবতীর্ণ সেই বাণীই এখন বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে নানা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বময়। কিন্তু মূল বাণী— তার আদি ও অকৃত্রিমরূপে লিপিবদ্ধ রয়েছে পবিত্র কোরআনে। কোরআনের এই নির্ভেজাল অকৃত্রিমত্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর এ যুগের এই কোরআন যে সেই আদি অকৃত্রিম মূল কোরআন, তার সংকলনের ইতিহাস থেকেও তা অনুধাবন করা যেতে পারে। যেমন ঃ—

প্রথমত, সকলেই অবগত আছেন, মোহাম্মদের (দঃ) জীবদ্দশাতেই কোরআনের সূরাসমূহ লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করে ধরে রাখা হয়েছিল। তখন কাগজের প্রচলন তেমন ছিল না। ফলে, অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওহী-লেখকদের মাধ্যমে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল নরম পাথরের টুকরায়, চামড়ায়, হাড়ে ও তখনকার প্রচলিত অন্যান্য উপকরণে। বিভিন্ন আয়াতেও কোরআনকে স্পষ্ট ভাষায় 'লিখিত কিতাব', 'উন্মুক্ত গ্রন্থ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা উল্লেখ করা হয়েছে হিজরতের আগে ও পরে অবতীর্ণ বিভিন্ন সূরায়।

দ্বিতীয়ত, লিখিতভাবে সংরক্ষণ ছাড়াও কোরআন সংরক্ষণের অপর যে ধারাটি প্রথম থেকেই চালু রয়েছে, তা হেফ্‌জ বা মুখস্থকরণের ধারা। গোটা কোরআন, সবাই জানেন, বাইবেল পুরাতন নিয়ম (তাওরাত ও জবুর) থেকে আকারে অনেক ছোট এবং নতুন নিয়মের (ইঞ্জিল) তুলনায় সামান্য কিছু বড়। যেহেতু, গোটা কোরআন সুদীর্ঘ কুড়ি বছরেরও অধিককাল ধরে ধারাবাহিকভাবে নাজিল হয়, সে কারণে মোহাম্মদের (দঃ) সঙ্গী-সাথীদের দ্বারা একটি একটি করে সমস্ত সূরা মুখস্থ করা হয়েছিল সহজতর।

যাহোক, লিপিবদ্ধকরণের পাশাপাশি কোরআন মুখস্থ বা হেফ্‌জ করার এই ধারাটিও কোরআনকে সকল কম হস্তক্ষেপমুক্ত অবস্থায়— তার সেই আদি ও অকৃত্রিমস্বরূপে সংরক্ষণ করে আসছে। এভাবে গোড়া থেকেই কোরআন সংরক্ষণের দুটি পৃথক ধারা জারি রয়েছে। লিখিত ও মুখস্থ— এই দ্বিবিধ সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কোরআনের সঠিকত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। লিখিত কোরআনের যেকোন ত্রুটি হেফ্‌জকারীদের দ্বারা তাৎক্ষণিকভাবেই সংশোধিত হওয়ার অবকাশ রয়েছে।

অবশ্য, এ কথা ভুললেও চলবে না যে, কোরআন মূলত একখানি ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং, কোরআনের সববাণী ও বক্তব্যে যদি আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণা ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজতে যাই, তবে ভুল হবে নিঃসন্দেহে। বরং, কোরআনের বাণী ও বক্তব্যে পরম স্রষ্টার যে সৃষ্টিকুশলতা, প্রাকৃতিক বিধি-বিধানের রহস্যের যে বর্ণনা রয়েছে, তারমধ্যে যুগে যুগে মানুষের দৃষ্টিতে যতটা ধরা পড়েছে কিংবা মানুষের জ্ঞানের-আলোকে যতটা প্রতিভাত হয়েছে, শুধু ততটুকু তথ্যেরই পর্যালোচনা করা যায়। কোরআনের বাণী ও বক্তব্যে প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের এই যে প্রতিফলন, আধুনিক যুগে সেই প্রতিফলনই একান্ত তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ধরা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, কোরআনের যেসব বাণী ও বক্তব্য এতদিন যাবত ছিল অজ্ঞেয়, দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময়, আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা ও আবিষ্কারে তার অনেক কিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এখন মানব-জ্ঞানের পরিসীমায় ধরা দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, কোরআনের বাণীর এই বৈশিষ্ট্যই এখন বৈজ্ঞানিক-মনের কাছেও একান্ত বিস্ময়কর হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে।

এ কথার দ্বারা অবশ্য এটা বুঝাও উচিত হবে না যে, মানবসৃষ্টি-সম্পর্কিত কোরআনের সকল কিছু, আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য-জ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কারে আলোকিত ও বিশ্লেষিত হয়ে শেষ হয়েছে। সত্যি কথা, বলতে কি, মানব-সৃষ্টির বিষয়টা বাইবেল ও কোরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের আওতা-বহির্ভূত বিষয় হিসেবেই বিদ্যমান। এ কারণে, এখন যখন বাইবেলের নতুন নিয়ম (ইঞ্জিল) কিংবা কোরআন আমাদের জানায় যে, যীশুখ্রিস্ট অর্থাৎ হযরত ঈসার (আঃ) জন্ম হয়েছিল বিনা পিতায়, তখন বিজ্ঞানের প্রতিবাদ এ সম্পর্কে তেমন সোচ্চার হতে পারে না। যদিও বিজ্ঞান জানে যে, শারীরবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে কোন মানব সন্তানের পক্ষে বিনা পিতায় জন্ম হওয়াটা অসম্ভব। কারণ, পিতার বীর্য নিঃসৃত শুক্রকীট সন্তানকে শুধু জন্মই দেয় না, প্রতিটি নবজাতকই তার পিতার থেকে অর্ধেক জেনেটিক উত্তরাধিকারও লাভ করে থাকে। মূলত, বিজ্ঞান কোন অলৌকিকত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করে না; কেননা, অলৌকিকত্বের সংজ্ঞাই হচ্ছে— এমনকিছু, যা ব্যাখ্যার অতীত। এভাবে

কোরআন ও বাইবেল যখন বলে যে, মানুষ পরিগঠিত হয়েছে মাটি থেকে, তখন সেই বক্তব্যে কার্যত ধর্মের একটি মৌলিক সত্য লাভ করে ঃ যেখান থেকে আগমন, সেখানেই প্রত্যাগমন; যার শয়ান যেখানে, শেষ বিচারের দিনে তার পুনরুত্থান ঘটবে সেখান থেকেই।

কোরআনে ধর্মীয় তাৎপর্যমণ্ডিত বক্তব্য তো রয়েছেই; সেইসঙ্গে মানব-সম্পর্কিত বক্তব্যের পাশাপাশি আরো এমনসব তথ্য ও বক্তব্য পাওয়া যায় যা একান্তভাবেই জাগতিক বা বস্তুগত। কোন বিজ্ঞানী যখন কোরআনের মত একটি ধর্মগ্রন্থে এ ধরনের একান্ত বাস্তব-জ্ঞানসম্মত তথ্য ও বক্তব্য পেয়ে যান, তখন তিনি চমকে উঠে থমকে না যেয়ে পারেন না। উদাহরণ হিসেবে কোরআনে প্রাণের সৃষ্টি-সংক্রান্ত বক্তব্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রাণের আদি উৎস সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তব্য কোরআনে রয়েছে।

শুধু তাই নয়, মানুষ সৃষ্টির ব্যাপারটা যে শারীরবিজ্ঞানের রূপান্তরের ধারায় সম্পাদিত হয়েছে, সে সম্পর্কেও কোরআনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে বিস্তারিত বর্ণনা। কোরআনে এই তথ্যও স্পষ্ট ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ মানুষকে নিজস্ব ইচ্ছানুসারে সুষমামণ্ডিত করেছেন। অনুরূপভাবে, আমরা কোরআনে আরো দেখা যায়, মানব-প্রজনন-সংক্রান্ত এমনসব সঠিক বর্ণনা, যার সঙ্গে শুধু আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষণায় প্রাপ্ত সুপ্রমাণিত তথ্যজ্ঞানেরই তুলনা চলে।

এ কথা অবশ্য ঠিক যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এসব বর্ণনা কোরআনের সুনির্দিষ্ট কোন স্থানে পাওয়া যাবে না। ১৯৭৬ সালে এ বিষয়ে ড. মরিস বুকাইলির যে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা-নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা প্রণয়নের বেলায় তিনি গোটা পাশ্চাত্যজগতে প্রকাশিত কোরআন-সম্পর্কিত নানা গ্রন্থ মন্থন করেও এ বিষয়ে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। খুঁজে-পেতে শেষপর্যন্ত আরবি ভাষায় প্রকাশিত কিছু পুঁথি-পুস্তক পেয়েছিলেন। সেগুলো পড়লেই বুঝা যায়, এসব বিষয়ে কোরআনের বক্তব্য কি, বিজ্ঞান বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু দুই-একজন গবেষক লেখক তা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন মাত্র। কিন্তু 'ওভার অল স্টাডি' বা সামগ্রিকভাবে গবেষণা বলতে যা বুঝায় তার হদিস কোথাও মেলেনি।

বিষয়টা অবশ্য সহজও নয়। কেননা, এ ধরনের কোন বিষয়ে তেমন গভীর কোন গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় হল, আধুনিক বিজ্ঞানের সুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখার বিশদ জ্ঞান ও সুগভীর অনুসন্ধান। এদিকে ইসলামী তত্ত্ববিদ বা ধর্মবিশারদ হিসেবে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা বেশিরভাগই মূলত, ধর্মীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞাসম্পন্ন ভাষাবিদ পণ্ডিত। কিন্তু ইসলামীতত্ত্বের বিষয়ে যে-কেউ যতই বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ পণ্ডিত বা বিদগ্ধসুধীজন হোন-না-কেন, তিনি তাঁর

গবেষণা প্রকাশনায় কোরআনের বিজ্ঞান-সম্পর্কিত বিষয়ে ঠিক একজন বিজ্ঞানী-গবেষকের মত গুরুত্ব আরোপ করবেন, এটা আশা করা চলে না। কথাটা পাশ্চাত্যের ইসলামীতত্ত্ববিদদের বেলায় বেশি খাটে।

বস্তুত, এ কাজের জন্য প্রয়োজন এমন একজন আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু মানুষ— যিনি একাধারে বিজ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার সর্বাধুনিক তথ্যজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক অবহিত এবং এই সঙ্গে আরবী ভাষায়ও সমান ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। এ রকম কোন মানুষ যখন মূল আরবীতে কোরআন পড়বেন, তখন তাঁর পক্ষেই শুধু অনুধাবন করা সম্ভব হবে যে, কোন্ বিষয়ে কোরআনে সঠিক অর্থে কোন্ বক্তব্য দেওয়া হয়েছে; আর আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক জ্ঞান-গবেষণা সে সম্পর্কে কি তথ্য পরিবেশন করছে। এ রকম অনুসন্ধানী মানসিকতা নিয়ে যখন কেউ এগিয়ে আসবেন শুধু তখনই তাঁর পক্ষে এতদুভয়ের মধ্যে যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হবে ঃ তার আগে নয়।

কোরআনে প্রকৃতি ও বিজ্ঞান-বিষয়ক এ-সব বাণী ও বক্তব্যের উপস্থিতি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, কোরআন যে-কালে নাজিল হয়েছিল তখন এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষের কোন ধারণাই ছিল না। হাজার-দেড় হাজার বছর পরে এসে শুধু আধুনিক বিজ্ঞানই নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা-বিশ্লেষণ ও আবিষ্কার-অনুসন্ধানে এসব বিষয়কে মানুষের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছে। এখানেই যে বিষয়টা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাহল ঃ প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার কোরআনের বাণী বক্তব্যে কিভাবে এমন সব বিষয় স্থান পেল এবং কিভাবে সে-সব বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত তথ্য-পরিসংখ্যানের সাথে এত বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারল?

এই পর্যায়ে একটা কথা সবিনয়ে নিবেদন না করে পারা যায় না। তাহল, কোরআনের প্রচলিত বিভিন্ন অনুবাদ ও তাফসীরসমূহে এসব বিষয়ে যে-সব অর্থ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য-বর্জিত। ফলে, অনেকক্ষেত্রে ওইসব অর্থ ও ব্যাখ্যা হয়ে পড়েছে অগভীর— এমনকি বিভ্রান্তিকর। অনেক বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ তফসীরকার মোহম্মদকে (দঃ) একজন সুদক্ষ চিকিৎসক হিসেবে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন। কেউ কেউ কোরআনের মধ্যে খুঁজেছেন নানান রোগ-ব্যাধীর সমাধান। প্রকৃতপক্ষে, কোরআনে যা রয়েছে তা হল, স্বাস্থ্যবিধি, খাদ্য-অখাদ্য-সম্পর্কিত নির্দেশ। যেমন, মদ ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা এতে রয়েছে। রমজান মাসে রোজা রাখার নির্দেশটাও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত বলে ধরে নেয়া যায়। কোরআনে মধুর উপকারিতার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ব্যাধি নিরাময়ের কথা সেখানে নেই।

কোরআনের আলোকে জীবনের সূচনা

ঠিক কোন্ উৎস থেকে পৃথিবীতে জীবন বা প্রাণের সূচনা ঘটেছে—কোরআনে এ প্রশ্নের সুস্পস্ট জবাব বিদ্যমান। এই পরিচ্ছেদে কোরআনের যে-সব বাণী ও বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেব, তাতে দেখা যাবে, জীবনের সূচনা ঘটেছে পানি থেকে। প্রথম উদ্ধৃত বাণীতে বিশ্বসৃষ্টির কথাও উল্লিখিত হয়েছে। যথা ঃ

> "অবিশ্বাসীরা কি ভাবিয়া দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একত্রে মিলিত ছিল? পরে, আমরা তাহাদের পৃথক করিয়াছি এবং আমরা প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে বাহির করিয়াছি পানি হইতে? তাহার পরেও কি তাহারা বিশ্বাস করিবে না?"—সূরা ২১ (আম্বিয়া), আয়াত ৩০ ঃ

"একটা কিছু থেকে অন্য একটা কিছু সৃষ্টি করার" এই ধারণা বা মতবাদ সম্পর্কে সন্দেহের কিছু থাকতে পারে না। এখানে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তার একটা অর্থ এই হতে পারে যে, জীবন্ত সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে পানির দ্বারা (অর্থাৎ, সেই সৃষ্টির কাজে পানি হল অপরিহার্য উপাদান); অথবা এর আরেক অর্থ এই হতে পারে যে, প্রতিটি জীবন্ত কিছুর উৎপত্তি ঘটেছে পানি থেকেই। তবে, যে অর্থই করা হোক, দুটি অর্থই কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠিত-সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বস্তুত, জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে পানি থেকেই; এবং পানিই হচ্ছে জীবন্ত জীবকোষ গঠনের প্রধানতম উপাদান। পানি ছাড়া জীবন আদৌ সম্ভব নয়। তাই দেখা যায়, যখনই অন্য কোন গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা হয়, তখন প্রথমেই যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেয়, তা হল, সেই গ্রহে জীবনরক্ষার উপযোগী পর্যাপ্ত পানি রয়েছে তো?

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-প্রমাণের দ্বারা এই সত্য এখন প্রতিষ্ঠিত যে, পৃথিবীতে প্রাণ তথা জীবনের প্রাচীনতম নিদর্শনের প্রথম হচ্ছে উদ্ভিদজগৎ। পৃথিবীর প্রাচীনতম যুগ 'ক্যামব্রিয়ান' নামে পরিচিত। সেই 'ক্যামব্রিয়ান' আমলেরও আগে এক ধরনের সামুদ্রিক শেওলা বা আগাছার অস্তিত্ব ছিল—যেগুলো 'অ্যালজে' নামে পরিচিত। প্রাণী-জীবনের আবির্ভাব ঘটে এর কিছু পরে। আর সেই প্রাণী-জীবনেরও উদ্ভব ঘটেছিল সমুদ্র থেকেই।

উপরে কোরআনের আয়াতের অনুবাদে যেখানে 'পানি' শব্দের উল্লেখ রয়েছে তার মূল আরবী হচ্ছে 'মা'। এর দ্বারা যেমন আসমানের পানি বুঝায়,

তেমনি বুঝায় সমুদ্রের পানিও। শুধু তাই নয়, এই 'মা' শব্দের দ্বারা যেকোন তরল পদার্থকেও বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং, এখানে এই 'মা' শব্দের দ্বারা প্রথম অর্থে যে 'পানি'কে বুঝানো হয়েছে সে 'পানি' হচ্ছে, জীবনের অপরিহার্য উপাদান। (বিভিন্ন ভাষায় জন্মদাত্রীকে সন্তানেরা যে 'মা' নামে ডেকে থাকে— তার সূত্র বোধহয় এখানেই নিহিত।)

"এবং (আল্লাহ্ তিনিই— যিনি) আসমান হইতে পানি বর্ষাণ এবং উহার দ্বারা আমরা জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ জন্মাই,— একটা আরেকটা হইতে আলাদা।"– সূরা ২০ (ত্বাহা); আয়াত ৫৩ ঃ

এই 'পানি' বা 'মা=' শব্দের দ্বিতীয় অর্থের দ্বারা শুধু 'তরল পদার্থ' বুঝায়— যদিও কোন্ ধরনের তরল পদার্থ সে-সম্পর্কে এখানে কিছুই বলা হয়নি— তাহলেও এর দ্বারা সেই 'অজানা তরল পদার্থকেই' বুঝানো হয়েছে— যা ছিল প্রাণী-জীবনের আদি উৎস।

"আল্লাহ্ সমস্ত প্রকারের প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়াছেন পানি হইতে।"
– সূরা ২৪ (নূর), আয়াত ৪৫ ঃ

পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে, 'মা-' অর্থে এই 'তরল পদার্থ-টি' 'সেমিনাল ফ্লুড' বা 'মৌলিক তরল পদার্থ' হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। (বলা অনাবশ্যক যে, এটি হচ্ছে সেই বীর্য— যা রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যান্ড বা প্রজনন-রসস্রাবী গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়,— এবং যার মধ্যে থাকে শুক্রকীট।)

যাহোক, এই 'মা-' শব্দের দ্বারা জীবনের উৎপত্তিস্থল বা উৎস হিসেবে কিংবা উদ্ভিদের উৎপাদনকারী হিসেবে যেকোন তরল পদার্থ অথবা প্রাণীর শুক্র— যাই বুঝানো হয়ে থাকে, কোরআনের এসব আয়াতে জীবনের উৎস সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তা আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কোরআন যখন অবতীর্ণ হয়েছিল, তখন জীবনের উৎস বা প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে নানাধরনের গালগল্প এবং উপকথা ও রূপকথার ছিল ছড়াছড়ি। কিন্তু কোরআনের বাণীতে প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে তেমন কোনও গল্পকথা বা কল্পকাহিনী স্থান পায়নি।

কোরআনের প্রচলিত তফসীরসমূহে দেখা যায়, সে-সবের বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ রচয়িতাবৃন্দ জীবজগতের প্রজনন-সংক্রান্ত আলোচনার চেয়ে উদ্ভিদজগতের আলোচনায় অধিক স্থান ব্যয় করেছেন। অথচ, বাস্তবে কোরআনে শুধু জন্তু-জানোয়ার নয়, মানব-প্রজনন সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে।

এটা যখন সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত যে, উদ্ভিদজগতের বংশবিস্তার ঘটে থাকে দু'ভাবে— এক, যৌন প্রক্রিয়ায়; দুই, যৌন-বহির্ভূত প্রক্রিয়ায় (উদাহরণ, "একের বহু হওয়া", যেমন, কাটিং বা কলম— যা এক গাছ থেকে আরেক গাছ উৎপাদনের বহুল-প্রচলিত পদ্ধতি)। লক্ষণীয় যে, কোরআনে উদ্ভিদজগতের

জোড়া তথা পুং-জাতি স্ত্রী-জাতির অস্তিত্বের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ

"এবং (আল্লাহ্ তিনিই— যিনি) আসমান হইতে পানি বর্ষান এবং তদ্দারা আমরা পয়দা করি জোড়ায় জোড়ায় উদ্ভিদ— একটা আরেকটা হইতে আলাদা।" – সূরা ২০ (ত্বাহা), আয়াত ৫৩ ঃ

'একজোড়া' শব্দটা এখানে আরবী 'জাওজ' (বহুবচনে 'আজওয়াজ) শব্দের তরজমা। এই শব্দের মূল অর্থ ঃ 'যেখানে একজন আরেকজনের মিলিত সঙ্গী, মিলিতভাবে তৈরি করে জোড়া।' এই 'জাওজ' শব্দটি সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে 'বিবাহিত দম্পতি' কিংবা 'একজোড়া জুতার' বেলায়।

"এবং যে সমস্ত ফল (আল্লাহ্) দিয়াছেন (জমিনের বুকে) তাহাদের দুইটিতে মিলিয়া একজোড়া!"– সূরা ১৩ (রা'দ), আয়াত ৩ ঃ

কোরআনের এই বক্তব্যে সকল জাতের ফলফলাদির মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী-অঙ্গের অস্তিত্বের কথাই বুঝানো হয়েছে। অনেক পরে, একান্ত আধুনিক যুগে এসেই ফলফলাদির গঠনাকৃতি নিয়ে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, উদ্ভিদজগৎ থেকে নির্গত সকল কিছুর মধ্যেই রয়েছে যৌন প্রত্যঙ্গগত বিভাজন (এমনকি কলা বা ওই জাতীয় যে-সব ফল রয়েছে— যাদের বংশবিস্তার সাধারণত 'ফুল থেকে ফল'— এই প্রক্রিয়ায় হয় না, তাদের উৎপাদনকর্মেও সুস্পষ্ট যৌন প্রক্রিয়া বিদ্যমান)।

কোরআনে জন্তু-জগতের প্রজনন-প্রক্রিয়া-সংক্রান্ত বর্ণনা অনুপুংখ হলেও মোটের ওপর সংক্ষিপ্ত। পক্ষান্তরে, মানব-প্রজনন সম্পর্কে কোরআনের আলোচনা সুবিস্তৃত। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়টা নিয়ে বিশদ আলোচিত হবে।

মানুষের আদি উৎস এবং সময়ের ধারায় মানুষের রূপান্তরের ব্যাপারে কোরআনে যে-সব আয়াত রয়েছে তার মধ্যে বেশকিছুসংখ্যক আয়াতের রয়েছে সুগভীর আধ্যাত্মিক অর্থ ও তাৎপর্য। পক্ষান্তরে, এরমধ্যেও বেশকিছু আয়াতে রয়েছে মানুষের শারীরবিজ্ঞান-সংক্রান্ত দেহ-কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা। ড. মরিস বুকাইলি বলেন, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনায় এই পরিবর্তনের বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের ক্রমরূপান্তরের তথ্য। এসব আয়াতে একান্ত জাগতিক ভাষা ও ভাবধারার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের দেহাবয়বের এই পরিবর্তন তথা রূপান্তর সাধিত হয়েছে পর্যায়ক্রমে। শুধু তাই নয়, কোরআনের বক্তব্য অনুসারে, প্রতিটি পর্যায়ের সেই রূপান্তর বা পরিবর্তনের কাজটি সম্পাদিত হয়েছে— এক যথাযথ প্রক্রিয়ায়, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে। আর প্রতিবারেই এই ঘটনাটি ঘটেছে মহান স্রষ্টার মহতী ইচ্ছায়। এসব আয়াতে এই কথাটা বেশ কয়েকবারই উচ্চারিত হয়েছে।

উপরের আলোচনায়, একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যখন কোন কিছুর মধ্যে রূপান্তর সাধিত হয়, তখন তা ব্যক্ত করার জন্য বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'ইভ্যুলিউশন' বা 'বিবর্তন' শব্দ বা টার্মটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ড. মরিস বুকাইলি তাঁর এই গবেষণা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই 'বিবর্তন' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। তবে, এক্ষেত্রে তিনি যে অর্থে 'বিবর্তন' টার্মটা ব্যবহার করেছেন, তা ডারউইনের তথাকথিত 'বিবর্তনবাদের' বিবর্তন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

বস্তুত, একের পর এক সংশোধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে একটা চূড়ান্ত গঠন-কাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্যই ড. মরিস বুকাইলি এক্ষেত্রে 'বিবর্তন' শব্দ বা টার্মটা ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত এই 'বিবর্তনের' মূলে রয়েছে সর্বশক্তিমান বিধাতার সেই বক্তব্য যেখানে তিনি ঘোষণা করেছেন যে, নতুন মানব-প্রজাতির আগমনের পথ সুগম করার জন্য তিনি পুরাতন মানব-প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটিয়ে থাকেন। এই অধ্যায়ের আলোচনায় কোরআনের যে-সব

আয়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে, কোরআনের সে-সব আয়াতের বক্তব্য-বিশ্লেষণের দ্বারা এই মূল বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হতে পারে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের দৈহিক গঠন-কাঠামোর মধ্যে কোন রূপান্তর যে সাধিত হতে পারে— প্রাচীন তাফসীরকারগণ তেমন কোন ধারণা মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা অবশ্য পরিবর্তনের কথা যে একেবারে অস্বীকার করছেন, তাও নয়। তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, পরিবর্তন ঘটে, তবে সেই পরিবর্তন বা রূপান্তর-ক্রিয়াটা সাধিত হয় শুধু মাতৃগর্ভে— মানব-ভ্রূণের ক্ষেত্রে। মানব-ইতিহাসের প্রায় সকলপর্যায়ে মানব-ভ্রূণের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বা রূপান্তর স্বীকৃত। তবে, কোরআনে মানব-ভ্রূণের রূপান্তর বা পরিবর্তন বলতে সত্যিকারার্থে কি বলা হয়েছে ও কি বুঝানো হয়েছে, একমাত্র আধুনিকযুগে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের দরুন আমরা স্পষ্টভাবে তা বুঝতে সক্ষম হচ্ছি। এই অবস্থায় এখন আমাদের মনে এই প্রশ্ন দেখা না দিয়ে পারছে না যে, পর্যায়ক্রমে মানুষের উৎকর্ষ-বিধানের যে কথা কোরআনে বলা হয়েছে, তা কি শুধু গর্ভাশয়ে মানব-ভ্রূণের ক্রম-পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী, নাকি সেই বক্তব্যে— সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেহাবয়বের পরিবর্তন ও রূপান্তরের তথ্যও নিহিত রয়েছে?

উল্লেখ্য যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির দেহাবয়বগত পরিবর্তন ও রূপান্তরের বিষয়টা আধুনিক জীবাশ্ম-বিজ্ঞান কর্তৃক সমর্থিত এবং এ সম্পর্কে জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের প্রমাণ এতবেশি স্পষ্ট যে, তা নিয়ে এখন আর প্রশ্ন উত্থাপনের কোনও অবকাশ নাই। সেই প্রাচীনযুগে বসে যাঁরা কোরআনের তাফসীর রচনা করেছেন, তাঁদের পক্ষে জীবাশ্ম-বিজ্ঞান-সমর্থিত মানবজাতির দেহগত বৈশিষ্ট্যের এই পরিবর্তনের বিষয়টা ধারণা করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা, জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের গোটা ব্যাপারটাই আধুনিক যুগের অবদান। সুতরাং, সে যুগে বসে কোরআনের আয়াতে বর্ণিত মানুষের এই পরিবর্তন বা রূপান্তরের বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাচীন তাফসীরকারদের পক্ষে মাতৃগর্ভে মানব-ভ্রূণের রূপান্তরের বেশিকিছু ধারণা করা কিংবা তার বিকল্প কিছু চিন্তা করার তেমন কোন অবকাশ ছিল না।

এরপর, আধুনিক যুগের সূচনায় এল ডারউইনবাদের সেই 'বম-শেল'! অবস্থা শেষপর্যন্ত এমন দাঁড়াল যে, অনুসারী-অনুরাগীরা ধরে-বেঁধে ডারউইনের মতবাদকে এমন একটা-কিছু বলে দাঁড় করালেন, যা ডারউইন নিজেও বলেননি; এমনকি ধারণাও করেননি! তবুও, এই ডারউইন-থিওরির উপর আরোপ করা হল সেই তথাকথিত 'বিবর্তনবাদ', যে 'বিবর্তনবাদ' এ যাবতকালের মধ্যে প্রাণিজগতের ক্ষেত্রে কখনই কার্যকরভাবে প্রমাণিত হয়নি! তথাপি, সেই

'বিবর্তনবাদকে' অনেক টানা-হ্যাঁচড়া করে নিয়েই যুক্ত করা হল মানবজাতির 'উদ্ভাবন' ও 'ক্রমবিকাশের' ইতিহাসের সঙ্গে।

মূলত, 'মানুষ বানরের বংশধর'— এই বক্তব্যটা তত্ত্ব হিসেবে বিজ্ঞানের ধারায় আদৌ স্বীকৃত কোন তত্ত্ব নয়; সুতরাং, সত্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের দ্বারা সমর্থনের প্রশ্নও অবান্তর। পক্ষান্তরে, সময়ের ধারাবাহিকতায় মানবজাতির দেহাবয়ব বা শারীরিক গঠন-কাঠামোর পরিবর্তন ও রূপান্তরের ধারণাটি শুধু ধারণা হিসেবেই থাকেনি; বরং আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় তা সুপ্রমাণিত হয়ে ইতিমধ্যেই সুস্পষ্ট এক মতবাদের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানেই দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ধারণা বা মতবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

এক. ডারউইনের থিওরি, যেখানে বলা হয়েছে, মানুষের আদি উৎস হচ্ছে, বানর অর্থাৎ বানরই রূপান্তরের মধ্যদিয়ে মানুষে পরিণত হয়েছে; এবং

দুই, দুনিয়াতে মানুষ আবির্ভূত হয়েছে মানুষ হিসেবেই এবং আবির্ভাবের কাল থেকেই নানাপরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্যদিয়ে মানুষ তার বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। তাছাড়াও, মানুষের সেই রূপান্তর শুধু তার জ্ঞান-বুদ্ধিগত নয় এবং তার শারীরিক গঠন-কাঠামোর দিক থেকেও হয়েছে কার্যকর।

উল্লেখ্য যে, কোরআনের বহুসংখ্যক বাণী ও বক্তব্য মানুষের দৈহিক রূপান্তরের বিষয়টা সমর্থন করে বটে; কিন্তু এসব বাণী ও বক্তব্যে কোথাও বলা হয়নি যে, মানুষ বানরের বংশধর।' বলাই বাহুল্য যে, 'মানুষ বানরের বংশধর'— এই ধারণাটা সঙ্গত কারণেই মুসলিম, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয়বোধ ও ভাবাবেগকে আহত করে। কোরআনের মত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আসমানী কিতাবে এই ধরনের কোন ভিত্তিহীন বিষয় এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অপ্রমাণিত কোন তথ্যের স্থানলাভের ধারণা একান্তই অবান্তর।

কোরআনের মতে মানুষ, মৃত্তিকা ও পানি

নিচে কোরআনের যে দুটি আাত উদ্ধৃত করা হচ্ছে, তাতে দেখা যাবে মানবজীবন মাটির সঙ্গে একান্তভাবে সম্পৃক্ত। যথা ঃ

"বরং আল্লাহ্ তোমাদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন ভূমি হইতে— উদ্ভিদের ন্যায়। অতঃপর তিনি ইহাতে তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে সেখান হইতে বাহির করিবেন— এক (নতুন) জাত হিসেবে।" –সূরা ৭১ (নূহ্), আয়াত ১৭ ও ১৮ (সূত্র নং ১) ঃ

"এই (জমিন) হইতেই আমরা তোমাদিগকে পরিগঠিত করিয়াছি, এবং ইহাতেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া লইব এবং ইহা হইতেই তোমাদিগকে বাইর করিব অন্য সময়ে।"–সূরা ২০ (ত্বাহা), আয়াত ৫৫ (সূত্র নং ২) ঃ

এই আয়াতে মাটি থেকে মানুষের বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ পুনরায় এই মাটিতেই ফিরে যাবে এবং সেইসাথে এখানে এই ধারণাও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ শেষবিচারের দিনে এই মাটি থেকেই পুনরুত্থান ঘটাবেন। বাইবেলেও একই আধ্যাত্মিক অর্থে ও তাৎপর্যে অনুরূপ বক্তব্যই রয়েছে।

পাশ্চাত্যে (এবং অন্য দেশেও) আরবী 'খালাকা' শব্দের তরজমা করা হয় সাধারণত 'টু ক্রিয়েট' বা 'সৃষ্টি করা'— এই ক্রিয়াবাচক শব্দ দিয়ে। লক্ষণীয়, কাজিমিরিস্কির সুবিখ্যাত অভিধানে এই 'খালাকা' শব্দের আদি বা মূল অর্থ নিম্নরূপ ঃ

'কোন জিনিসকে সমানুপাত বা সৌষ্ঠব দান করা' অথবা 'কোন কিছুকে সমানুপাতে বা সমমাত্রায় নির্মাণ করা।'

সুতরাং, এখানে 'খালাকা' শব্দের অর্থ যদি শুধু 'সৃষ্টি করা' বলে উল্লেখ করা হয়, তাহলে এই অর্থের একান্ত সরলীকরণ করা হয় মাত্র। আর এভাবে 'খালাকা' শব্দের অর্থ যখন শুধু 'সৃষ্টি করা' লেখা হয় বা বলা হয়, তখন তাতে শুধু সৃষ্টির কাজটাকেই বুঝায় ঃ নির্মাণকর্মে অনুপাত ও মাত্রা প্রদান এবং সৌষ্ঠবদানের কথাগুলো উহ্যই থেকে যায়। এ কারণেই 'খালাকা' শব্দের দ্বারা

যা-কিছু বলা হয়েছে— সেই অর্থই শুধু তাকে তার মূল অর্থের কাছাকাছি নিতে পারে। এ কারণে এই শব্দটির প্রাচীন আরবী ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রায় সব অনুবাদে 'খালাকা' শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে 'টু ফ্যাসন' বা 'সৌষ্ঠব দান', 'পরিগঠন' কিংবা শুধু 'গঠন' শব্দের দ্বারা।

মানুষ মৃত্তিকা থেকে পরিগঠিত— কোরআনের এই বক্তব্যের সকল আধ্যাত্মিক তাৎপর্য অটুট রেখেও বলা চলে, এই তাৎপর্যের দ্বারা আধুনিক যুগে মানুষের দেহ-গঠনের যেসব 'রাসায়নিক উপাদানের' কথা বলা হয়, সেই অর্থও একেবারে খারিজ হয়ে যায় না। (মানবদেহ পরিগঠনের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক এই উপাদান বা উপকরণ— যাই বলা হোক, তা কিন্তু মাটির সারনির্যাস থেকেই পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া, এসব উপাদান বা উপকরণ কখনো নির্মূল হয় না বা হারিয়ে যায় না ঃ যেমন, অ্যাটমিক উপাদান— যেগুলো মলিক্যুল তৈরি করে থাকে। অন্যকথায়, যেসব উপাদান ও উকপরণে মানবদেহ পরিগঠিত সে-সব কমবেশি মৃত্তিকায় বিদ্যমান।)

যে-কালে কোরআন নাজিল হয়েছিল, তখনকার মানব-সমাজকে বুঝাবার জন্য তাঁদের মেধা ও জ্ঞানের উপযোগী করে 'মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা পরিগঠিত' বলে যে কথাটা বলা হয়েছিল, সে কথাটাই এখন এভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অর্থাৎ, মানবদেহ পরিগঠিত হয়েছে মৃত্তিকার সারনির্যাস বা মধ্যস্থিত উপাদান সহযোগে। কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে এ কথাটা আরো স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে এবং সেখানে মানবদেহ পরিগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও উপকরণকে আখ্যায়িত করা হয়েছে নানাভাবে। যথা ঃ

"তিনিই (আল্লাহ্) তোমাদের উদ্ভব ঘটাইয়াছেন জমিন হইতে।"

—সূরা ১১ (হুদ), আয়াত ৬১ (সূত্র নং ৩) ঃ

(জমিন—মৃত্তিকা—আরবী আরদ্, ইংরেজি আরথ্) এই আরদ্ বা আরথ্ তথা মৃত্তিকার কথাটাই পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে ৫৩নং সূরার (নজম) ৩২নং আয়াতে।

"আমরা তোমাদিগকে গঠন করিয়াছি (বা সৌষ্ঠবদান করিয়াছি) মাটি হইতে।"— সূরা ২২ (হজ্ব), আয়াত ৫ (সূত্র নং ৪) ঃ

মানুষ যে মৃত্তিকা দ্বারা পরিগঠিত, সেই কথাটা এখানে আবারও উল্লিখিত হয়েছে ১৮ নং সূরার (কাহাফ) ৩৭নং আয়াতে; ৩০নং সূরার (রুম) ২০নং আয়াতে; ৩৫ নং সূরা (ফাতের) ১১নং আয়াতে এবং ৪০ নং সূরার (মুমেন) ৬৭ নং আয়াতে।

"(আল্লাহ্) সেই একক সত্তা যিনি তোমাদিগকে গঠন করিয়াছেন কর্দম হইতে।"—সূরা ৬ (আনআম), আয়াত ২ (সূত্র নং ৫) ঃ

মানব পরিগঠন প্রসঙ্গে কর্দম (আরবী— তীন) শব্দটি কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এর দ্বারা মানুষ যেসব উপাদানে পরিগঠিত তা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেমন ঃ

"(আল্লাহ্) মানবসৃষ্টির সূচনা করিয়াছেন কর্দম হইতে।"

— সূরা ৩২ (সাজদা), আয়াত ৭ (সূত্র নং ৬) ঃ

এখানে যা গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় তাহল, কোরআন 'তীন' বা 'কর্দম' থেকে মানবসৃষ্টির 'সূচনা'র কথা বলছে। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে, 'সূচনা' থেকে 'শেষ' পর্যন্ত এই সৃষ্টির আরো পরবর্তী-পর্যায় বিদ্যমান।

"আমরা তাহাদিগকে গঠন করিয়াছি আঠালো কর্দম হইতে।"

— সূরা ৩৭ (সাফ্‌ফাত), আয়ত ১১ (সূত্র নং ৭) ঃ

এই আয়াতে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় নতুন কোন তথ্য তেমন না-থাকলেও, আলোচনার সম্পূর্ণতার জন্য এটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে। বলা অনাবশ্যক যে, এখানে মানবসৃষ্টির কথাই বলা হয়েছে।

"(আল্লাহ্) গঠন করিয়াছেন মানুষকে কর্দম হইতে— মৃৎশিল্পের মত করিয়া।" — সূরা ৫৫ (রহমান), আয়াত ১৪ (সূত্র নং ৮) ঃ

এই বক্তব্যে আভাস পাওয়া যায় যে, মানুষকে মডেল বা নমুনা অনুযায়ী নির্মাণ করা হয়েছে। পরের আয়াতেও এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাবে।

"আমরা মানুষকে গঠন করিয়াছি কর্দম হইতে নকশাকাটা নরম মাটি হইতে।"—সূরা ১৫ (হিজর), আয়াত ২৬ (সূত্র নং ৯) ঃ

(হামায়েম মাসনুন-এর আরেক অর্থ ঃ 'পচা-গলা কাদামাটি— সুদীর্ঘ সময়কালের যার চেহারা-সুরত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়েছে।'

এই একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে একই সূরার (হিজর) ২৮–৩৩ আয়াতেও।

"আমরা গঠন করিয়াছি মানুষকে কাদামাটির বিশুদ্ধ সারভাগ হইতে।"

—সূরা ২৩ (মুমেনুন), আয়াত ১২ (সূত্র নং ১০) ঃ

আরবী 'সুলালাত' শব্দের অর্থ 'বিশুদ্ধ সারভাগ'— যার দ্বারা 'কোন কিছু থেকে তার সার-নির্যাস নির্গত করা' বুঝায়। এই 'সুলালাত' শব্দটি কোরআনের অন্যত্রও ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেখানে মানুষের বংশধারা সৃষ্টিতে মানব-বীর্যের সারভাগ বা নির্যাসের কথা বুঝানো হয়েছে। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, মানুষের তরল বীর্যের একটিমাত্র জীবকোষ, যা সাধারণত শুক্রকীট নামে

পরিচিত— সেই একটিমাত্র জীবকোষই মানুষের বংশধারা বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে ('কর্দমের সারভাগ' বলতে সেইসব রাসায়নিক উপাদানকে বুঝানো হয়েছে— যেসব উপাদান আসে পানির সারনির্যাস থেকে; এবং যেসব উপাদান কাদার মূল উপকরণ হিসেবে কাজ করে।)

কোরআন পানিকে সকল জীবনের 'আদি উৎস' হিসেবে বর্ণনা করেছে। সেই পানি যে মানবসৃষ্টিতেও অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল— সে কথাটাই বর্ণিত হয়েছে নিম্নলিখিত বাণীতে। যথা ঃ

"(আল্লাহ্) সেই একক সত্তা যিনি মানুষকে পানি হইতে গঠন করিয়াছেন এবং প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বংশধারা (পুরুষের মাধ্যমে) এবং আত্মীয়তার ধারা নারীদের মাধ্যমে।"–সূরা ২৫ (ফোরকান), আয়াত ৫৪ (সূত্র নং ১১) ঃ

কোরআনে অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনি পুরুষ বলতে অনেকে আদমকে বুঝে থাকেন। পক্ষান্তরে, কোরআনের অনেক আয়াতে নারীর সৃষ্টি সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে। যেমন ঃ

"(আল্লাহ্) সেই একক সত্তা যিনি গঠন করিয়াছেন তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতে এবং তাহা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার স্ত্রী।"
– সূরা ৪ (নিসা), আয়াত ১ (সূত্র নং ১২) ঃ

একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ৭নং সূরার (আরাফ) ১৮৯ নং আয়াত এবং ৩৯ নং সূরার (জু'মার) ৬নং আয়াতে। এ ছাড়াও ৩০নং সূরার (রুম) ২১ নং আয়াতে এবং ৪২নং সূরার (শূরা) ১১ নং আয়াতে একইবিষয়ের সূত্র টানা হয়েছে একইভাবে।

[এই স্থানে দুটি বিষয় পরিষ্কার করে নেয়া দরকার। (১) সাধারণভাবে বলা হয়, পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেকসময় কোরআন-হাদিসের বক্তব্য হিসেবেও এই ধারণাটাকে চালিয়ে দেয়া হয়। মূলত, এ বক্তব্য বাইবেলের (দেখুন, পুরাতন নিয়ম, ২ অধ্যায়, বাণী এবং ২২)। সেখানে বলা আছে ঃ "সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন"— ইত্যাদি। অথচ, বোখারী শরীফের 'বিবাহ' অধ্যায়ে, বলা আছে, শেষনবী (দঃ) বলেছেন ঃ

"স্ত্রীলোকেরা পাঁজরার (হাড়ের) মত; যদি তোমরা তাকে সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙে যাবে— সুতরাং, বাঁকা অবস্থায় তা থেকে ফায়দা গ্রহণ কর।" {আরবীসহ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এই হাদিসটির জন্য দেখুন, 'সহী আল-বোখারী' ৫ম খণ্ড, প্রকাশনা—

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, আধুনিক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৭০ ।} এখানে কোথাও 'পুরুষের পাঁজরা' থেকে 'নারী সৃষ্টির' কথা বলা নেই; এমনকি হযরত আদম (আঃ) কিংবা বিবি হাওয়ার কথাও নেই। বরং সাধারণভাবে সকল কালের স্ত্রী-জাতির বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে।

(২) কোরআনে যে 'নাফ্সেন ওয়াহেদাতেন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, ডঃ মরিস বুকাইলি তার অর্থ করেছেন— 'সিঙ্গল পার্সন' বা 'এক ব্যক্তি' বলে। মোহাম্মদ মারমাডিউক পিকথল তাঁর জগদ্বিখ্যাত *'দি মিনিংস অব দি গ্লোরিয়াস কোরআন'*-এ এর অর্থ করেছেন 'সিঙ্গল সোল' বা 'একক আত্মা'। আল্লামা ইউসুফ আলীও তাঁর 'দি হোলি কোরআনে' সূরা নিসার ১নং আয়াতের টীকায় এই অর্থ সমর্থন করেছেন। এই 'নাফসেন ওয়াহেদাতেন'-এর আরেক অর্থ 'অভিন্ন সত্তা' বা 'একটি প্রাণ' অথবা 'একটি জীবকোষ'ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে, উপরে উদ্ধৃত আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে ঃ

"সেই তিনি যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন একটি অভিন্ন প্রাণ' কিংবা একক জীবকোষ হইতে এবং উহা হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার জোড়া (জাওজ)।"

কোরআনের এই বক্তব্য থেকে, এই অর্থে, মানুষের আদি-পিতা ও আদি-মাতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া যে অভিন্ন ছিল, সেই তথ্যই বেরিয়ে আসে।

পূর্বোক্ত কোরআনের আয়াতগুলোর সূত্রে মানুষের আদি উৎস-সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য উচ্চারিত হয়েছে— কোরআনের সুবিস্তৃত স্থান জুড়ে। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর মানুষের কি হবে। তাছাড়াও, সেখানে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেষবিচারের দিনে মানুষকে আবারও দুনিয়ায় ফিরিয়ে আনা হবে। অন্যদিকে, মানবদেহের পরিগঠনে যে-সব উপাদান-উপকরণের প্রয়োজন— সে সবের কথাও এসব আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে স্পষ্টভাষায়।

মানুষের দৈহিক পরিগঠন

আধুনিক শারীরবিজ্ঞান অনুসারে যাকে রূপান্তর-প্রক্রিয়া বলা হয়, মানবজাতির দৈহিক পরিগঠনে সেই রূপান্তর-প্রক্রিয়া গোড়া থেকেই কার্যকর ছিল। শুধু তাই নয়, মানবজাতির দৈহিক গঠন-কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেই রূপান্তর-প্রক্রিয়া কার্যকর হয়েছে এক সুপরিকল্পিত কর্মসূচির অধীনে, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুষমধারায়, একের-পর-এক পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতায়। বলা অনাবশ্যক যে, এই পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার পেছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে সেই মহান স্রষ্টার মহতী ইচ্ছা— যিনি সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। আর এই পরিকল্পনা তথা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মধ্যদিয়ে সেই মহান সৃষ্টিকর্তার সর্বময় ক্ষমতা ও সার্বিক মহত্ত্বই যে প্রতিফলিত হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

কোরআনে প্রথম 'মানবসৃষ্টির' কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বক্তব্য সেখানেই থেমে থাকে নাই; বরং 'দ্বিতীয় বা পরবর্তী পর্যায়ে' মহান স্রষ্টা তাঁর সেই সৃষ্টিতে যে 'গঠনাকৃতি' প্রদান করেছেন সে কথাও গুরুত্বসহকারে সেখানে উল্লিখিত হয়েছে। যথা ঃ

> "আমরা তোমাদের নির্মাণ করিয়াছি; উহার পর আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি গঠনাকৃতি; উহার পর আমরা ফিরিশতাদিগকে বলিয়াছি, সিজদা কর আদমকে।"– সূরা ৭ (আ'রাফ), আয়াত ১১ (সূত্র নং ১৩) ঃ

এখানে সৃষ্টিকর্মের তিনটি 'পর্যায়কে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। তবে, প্রথম দুটি 'পর্যায়' হচ্ছে এই গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাধিক জরুরি ঃ আল্লাহ্ মানবসৃষ্টির সূচনা করেছেন; এবং 'উহার পর' মানবজাতিকে প্রদান করেছেন 'গঠনাকৃতি' (আরব, সাওওয়ারা)।

সময়ের ধারাবাহিকতায় সুষ্ঠু একটা পরিকল্পনার অধীনে মানুষের সেই চেহারাসুরত বা গঠনাকৃতি যে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে,— লাভ করেছে পরিপূর্ণ এক সুসমতা, সে কথাটাও কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে এভাবে ঃ

> "যখন তোমার প্রভু প্রতিপালক ফিরিশতাদিগকে বলিলেন, আমি একটি মানুষ তৈয়ার করিতে যাইতেছি কাদা হইতে, নকশাকাটা নরম মাটি হইতে। অতঃপর যখন আমি সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তাহার গঠন পুরাপুরি সমাপ্ত করিব এবং তাহার মধ্যে আমার রূহ ফুৎকার করিব, তখন

তোমরা উহার সামনে সিজদা নত হইও।"—সূরা ১৫ (হিজর), আয়াত ২৮-২৯ (সূত্র নং ১৪) ঃ

মানুষকে 'সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গঠন করিবার' (আরবী— *সাওওয়ায়*) এই কথাটি পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে কোরআনের ৩৮ নং সূরার (*সাদ বা সোয়াদ*) ৭২ নং আয়াতে।

গঠন-কাঠামোগত মিশ্র ও জটিল প্রক্রিয়ায় মানুষের এই চেহারাসুরত বা আকৃতি কিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমতা ও সুসম্পূর্ণতা লাভ করেছে (আরবী ক্রিয়াপদ 'রাককাবা', অর্থ, বিভিন্ন উপাদানের সহায়তায় কোন কিছু তৈরি করা, সুসম্পন্ন করা) সে কথাও কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে স্পষ্ট ভাষায় ঃ

"(আল্লাহ্) সেই একক সত্তা যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; তোমাকে গঠন করিয়াছেন সঠিক ও সুসমমাত্রায়; তোমাকে ভারসাম্যপূর্ণ করিাছেন সেই সুরত বা আকৃতিতে— যাহা তিনি ইচ্ছা করিয়াছেন; এবং তিনি তোমাকে সুসম্পন্ন করিয়াছেন বিভিন্ন উপাদানে।"— সূরা ৮২ (ইনফিতার), আয়াত ৭-৮ (সূত্র নং ১৫) ঃ

মানুষ পরিগঠিত হয়েছে— আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে এক নির্দিষ্ট আকৃতিতে। আমাদের আলোচ্য গবেষণার জন্যে কোরআনের এই বক্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

"আমরা (এখানে আল্লাহ্) মানুষকে গঠন করিয়াছি সর্বোত্তম সাংগঠনিক পরিকল্পনা অনুসারে।"— সূরা ৯৫ (তীন), আয়াত ৪ (সূত্র নং ১৬) ঃ

আরবী 'তাকবীম'-এর অর্থ 'কোন কিছুকে সুপরিকল্পিতভাবে সুসংগঠিত করা।' এরদ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার জন্য আগেথেকেই সুনির্ধারিত এক পরিকল্পনা ছিল এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির ধারাও ছিল সুনির্দিষ্ট ও স্থিরীকৃত।

কোরআনের এই আয়াত অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় 'সাংগঠনিক পরিকল্পনার' কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ডারইউনের কথিত 'বিবর্তন' নয়, বরং আধুনিক 'সৃষ্টিশীল বিবর্তনে'র ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষজ্ঞ— তাঁরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষারক্ষেত্রে এ বিষয়ে অভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। এমনকি সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে মানবজাতির রূপান্তর সাধনের ব্যাপারে তাঁরা অনেকেই 'অর্গানাইজেশনাল প্ল্যান' বা 'সাংগঠনিক পরিকল্পনা'—এই টার্মটি পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। বলা অনাবশ্যক যে, মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় 'সাংগঠনিক পরিকল্পনার' এই বিষয়টি এখন বিজ্ঞানের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত তত্ত্ব। যদিও প্রায় দেড় হাজার বছর আগে অবতীর্ণ কোরআনে আরবী 'তাকবীম' শব্দের দ্বারা ঠিক এই টার্মটিই একই অর্থে ও একই তাৎপর্যে উল্লিখিত হয়েছে!

মূলত, কোরআনের ৯৫ নং সূরা 'তীন'-এ (যেখান থেকে 'তাকবীম' শব্দ-সম্বলিত আয়াতটি গৃহীত হয়েছে, সেখানে) আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত মানবসৃষ্টির জাগতিক প্রক্রিয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, এভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে মানুষকে দৈহিকভাবে একটি অত্যুত্তম গঠন-কাঠামো প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু এই মানুষই আবার তুচ্ছাতিতুচ্ছ অবস্থায় নিমজ্জিত হয়ে যায় (বৃদ্ধ বয়সে জরাগ্রস্ত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিতবাহী)। এই সূরার কোথাও কিন্তু গর্ভাশয়ে মানব-জ্রূণের ক্রমবিকাশের কথা বলা হয়নি। বরং, মানবজাতির সাধারণ সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার কথাই এতে বর্ণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, 'তাকবীম' শব্দের দ্বারা একটি 'সাংগঠনিক পরিকল্পনার' উল্লেখ করে সেই পরিকল্পনার অধীনে গোটা মানবজাতির সুষম গঠনাকৃতি লাভের প্রক্রিয়ার বিষয়টিই এখানে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।

এই যে ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য এখানে তুলে ধরা হল, কোরআনের একটিমাত্র শব্দে এই গোটা আলোচ্য বিষয়টি তার সকল গুরুত্বসহ কি আশ্চর্যজনকভাবেই না ফুটে উঠেছে।

"(আল্লাহ্) গঠন করিয়াছেন তোমাদিগকে উন্নতির নানামাত্রায় (পর্যায়ক্রমে— বিভিন্ন পর্যায়ে— ধাপে ধাপে)। — সূরা ৭১ (নূহ), আয়াত ১৪ (সূত্র নং ১৭) ঃ

এখানে যে শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে 'উন্নতির নানামাত্রায়' (স্টেজেস) বা 'বিভিন্ন পর্যায়ে' অথবা 'পর্যায়ক্রমে'— 'ধাপে ধাপে' (ফেজেস) সেগুলোই হল, আরবী শব্দ 'তাওয়ার' (একবচনে 'তাওর')-এর সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য। এটাই হল কোরআনের একমাত্র আয়াত— যেখানে এই শব্দটি বহুবচনে এসেছে।

'উন্নতির নানা মাত্রায়' বা 'ধাপে ধাপে— বিভিন্ন পর্যায়' অর্থে এখানে এই যে শব্দটি (তাওয়ার) ব্যবহৃত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে মানবসৃষ্টির ইঙ্গিতবাহী। এই 'পর্যায়ক্রমিক উন্নতির নানা মাত্রা'— বক্তব্যের দ্বারা কি শুধু গর্ভাশয়ের মানব-জ্রূণের ক্রমবিকাশের কথাই বলা হয়েছে, নাকি এই শব্দের দ্বারা সময়ের ধারাবাহিকতায় দেহাবয়বের দিকথেকে মানবজাতিকে যে বিভিন্ন রূপান্তর ও

পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে— তার কথাও বলা হয়েছে? উল্লেখ্য যে, অতীতের প্রায় সকল অনুবাদক ও তফসীরকারগণ এই 'তাওয়ার' শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যায় মানব-ভ্রূণের ক্রমবিকাশের কথাই বলেছেন। এমনকি ড. মরিস বুকাইলিও তাঁর গবেষণামূলক পুস্তক "বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞানে" সেই ধারণাই ব্যক্ত করেছেন। তবে, অধুনা পুংখানুপুংখ বিচার-বিশ্লেষণে, সর্বাধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও আবিষ্কারে এ কথা বিশ্বাস করার মত পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ রয়েছে যে, কোরআনের এই 'তাওয়ার' শব্দের দ্বারা এখানে সময়ের ধারাবাহিকতায় মানবজাতির দেহ-কাঠামোগত রূপান্তর ও পরিবর্তনের কথাই বলা হয়েছে। যদিও এ রকম শব্দের দ্বারা কোরআনের আর কোথাও এ ধরনের কথা বলা হয়নি, তবুও কোরআনের অন্যত্র ব্যবহৃত নানা শব্দে ও বাক্যে এ সম্পর্কে যে-সব বক্তব্য রাখা হয়েছে— সেই নিরিখে এই 'তাওয়ার' শব্দটির অর্থ, ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য নিঃসন্দেহে ভেবে দেখার মত।

'তাওয়ার' শব্দ ছাড়াও কোরআনের অন্যত্র উল্লিখিত এতদসম্পর্কিত বক্তব্যের ইঙ্গিত রয়েছে। তবে, 'তাওয়ার' শব্দ-সম্বলিত উক্ত ৭১ নং সূরায় (নূহ্) মূলত আল্লাহ্র মহাশক্তির কথা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, সেই মহাক্ষমতাসম্পন্ন সৃষ্টিকর্তাই সকলকিছু সৃষ্টি করেছেন। এ সূরার যে রুকু বা অনুচ্ছেদে আলোচ্য 'তাওয়ার' শব্দ-সম্বলিত ১৪নং আয়াতটি বিদ্যমান [যা নিজ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হযরত নূহের (আঃ) ভাষণের অংশ] সেখানে মহান আল্লাহ্র অসীম রহমতের কথা স্মরণ করে বলা হয়েছে, কিভাবে তিনি তাঁর পরম করুণা ও মহানুভবতার দ্বারা মানুষকে নিষিক্ত করেছেন এবং শুধু মানুষকে নয়, বরং, তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য— সমস্ত কিছু। সৃষ্টি-সম্পর্কিত বক্তব্য-সম্বলিত এই সূরায় মাটি থেকে মানুষ-সৃষ্টির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বিদ্যমান, সে বিষয়ের উপরেও যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এই ৭১ নং সূরা নূহের কোথাও মাতৃজরায়ুতে শিশু-ভ্রূণের ক্রমবিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়নি বা ইঙ্গিতও দেয়া হয়নি। অথচ, প্রাচীনকালের তফসীরকারগণ 'তওয়ার' বলতে ভ্রূণের ক্রমবিকাশকেই বুঝিয়েছেন। যদিও এই সূরায় নেই; কিন্তু অন্য অনেক সূরায় ভ্রূণের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির বক্তব্য রয়েছে। অর্থাৎ, 'তাওয়ার' শব্দ-সম্বলিত আয়াতে গর্ভাশয়ে ভ্রূণের ক্রমবিকাশের ধারণা যেমন গ্রহণ করা যেতে পারে তেমনি এই শব্দে মানবজাতির দৈহিক ক্রমবিকাশের ধারণাও বাদ দেয়ার উপায় নেই।

ক্রমবিকাশের ধারা ঃ জিন-এর ভূমিকা

'ক্রমবিকাশের ধারা' বুঝাতে গিয়ে কোরআনের সেই প্রক্রিয়ার তথা কার্যকারণের ধারাকেই বুঝানো হয়েছে— যা সময়ের ধারাবাহিকতায় কোন ব্যক্তি বা কোন প্রাণী-প্রজাতির ক্রমোন্নতি ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে, এখন বিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 'জিন' বলে অভিহিত করা হয়, সেই 'জিন'-এর ভূমিকার কথাই বলা হয়েছে কোরআনের এইসব বক্তব্যে। কেননা, এই 'জিন'-ই প্রজননের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে পিতৃপুরুষ ও মাতৃকুলের উত্তরাধিকার নিয়ে ব্যক্তি বা প্রাণীর ক্ষেত্রে পালন করে থাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক ভূমিকা। সুতরাং, কোরআনের এসব আয়াতে উল্লিখিত মানবজাতি বা প্রাণী-প্রজাতির ক্রমবিকাশের 'পর্যায়' বা উন্নয়নের 'স্তর' বুঝাতে যদি আমরা বিজ্ঞানের এই নব-আবিষ্কৃত 'জিন'-এর সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের 'স্তর' বা 'পর্যায়' ধরে নিই, তাহলে কোরআনের বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ তথ্যের সাথে সম্পূর্ণভাবেই মিলে যায়।

আলোচ্যক্ষেত্রে কোরআনের বক্তব্যের মর্মে 'জিন'-এর সেই ভূমিকা মেনে নেয়ার পিছনে আরো একটি যুক্তি কাজ করছে। তাহল, শুধু এই সূত্রের দ্বারাই ইতিপূর্বে উল্লিখিত মানুষের দেহাবয়বগত পরিবর্তন বা রূপান্তরের যৌক্তিক একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আর সেক্ষেত্রে পাঠক যদি এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুসারে উল্লিখিত আয়াতের বক্তব্য সূত্র নং ১৭ নাও ধরেন, তাহলেও এর দ্বারা সময়ের ধারাবাহিকতায় মানবজাতির দেহাবয়বের পরিবর্তন ও রূপান্তরের ধারণা ক্ষুণ্ন হয় না।

কোন-এক মানবজাতির স্থলে অন্য এক মানবজাতির আবির্ভাবের বক্তব্য কোরআনের নিম্নোক্ত দুটি আয়াতে বিদ্যমান। যথা ঃ

> "নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহাদের সবাইকে করিয়াছি শক্তিসম্পন্ন (বা তাহাদের গঠনকে মজবুত করিয়াছি); এবং যখন আমরা ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে সরাইয়া দিয়া (অথবা বদলাইয়া দিয়া) তদ্‌স্থলে অনুরূপ ধরনের মানুষকে করিয়াছি স্থলাভিষিক্ত।" —সূরা ৭৬ (দাহর), আয়াত ২৮ (সূত্র নং ১৮) ঃ

উপরের আয়াতে মানুষের শারীরিক গঠন-কাঠামোর যে কথা বলা হয়েছিল, এখানে তাকে ক্ষমতাসম্পন্ন করার বা তার গঠন মজবুত করার কথা বলে খুব সম্ভব সময়ের ধারাবাহিকতায় মানুষের সেই দেহাবয়বগত ক্রম-উন্নয়নের তথ্যই তুলে ধরা হয়েছে।

"তিনি (আল্লাহ্) চাহিলে তোমাদিগকে বিলুপ্ত করিতে পারেন, এবং তিনি যাহাদিগকে চাহিবেন, উত্তরাধিকারী হিসেবে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করিতে পারেন।— ঠিক যেভাবে অন্য মানুষের বংশধর হইতে তোমাদের উদ্ভব ঘটাইয়াছেন।" — সূরা ৬ (আন্‌আম), আয়াত ১৩৩ (সূত্র নং ১৯) ঃ

এই দুই আয়াতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে সময়ের ধারাবাহিকতায় নির্দিষ্ট মানব-সম্প্রদায়ের অবলুপ্তি এবং তদস্থলে অন্যদের স্থলাভিষিক্তকরণের যে প্রক্রিয়া চালু ছিল— সেই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রাচীন তফসীরকারগণ এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় পাপাসক্ত মানব-সম্প্রদায়ের উপরে আল্লাহ্‌র গজব ও আজাব নিপতিত হওয়ার ব্যাপারটাকে বড় করে তুলে ধরেছেন। এসব আয়াতের মর্মে ধর্মীয় এই তাৎপর্য প্রথমদৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বটে; কিন্তু বাস্তবে সুগভীর বিচার-বিশ্লেষণে এটাও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে, এই দুই আয়াতের অতীতের বহু মানব-সম্প্রদায়ের (যাদের সংখ্যা এখানে উল্লেখ করা হয়নি) বিলুপ্তির কথাই বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সময় বিশেষে অন্য মানুষের বংশধরদের দ্বারা এমনকি ভিন্ন কোন মানব-সম্প্রদায়ের দ্বারাও তাদের স্থান পূরণের কথাও এখানে উল্লিখিত হয়েছে সমান গুরুত্বের সাথেই।

সুতরাং, মোদ্দাকথাটা এখানে এই দাঁড়াচ্ছে যে, বহুকাল আগে থেকেই বিভিন্ন সময় দুনিয়াতে যে সব মানবগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিল, তাদের মধ্যে ছিল শারীরিক গঠন-কাঠামোগত ভিন্নতা। তখনকার সেইসব মানুষের দেহাবয়বগত গঠন-কাঠামোর যে ভিন্নতা, সেই ভিন্নতা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়মে এক মহা-সাংগঠনিক পরিকল্পনার অধীনেই ক্রমাগতভাবে রূপান্তরিত ও পরিবর্তিত তথা সংশোধিত হয়ে চলেছে। এই সংশোধন তথা পরিবর্তন ও রূপান্তরের ধারায় একেক সময় একেক মানব সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি ঘটেছে; এবং সেই একইধারায় তাদের স্থান পূরণ করেছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী।

উপরে যে-সব আয়াত তথা বাণী ও বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে— ওইসব বাণী ও বক্তব্যের দ্বারা কোরআন আলোচ্য এই বক্তব্যকে বিশদভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরছে। বলা অনাবশ্যক যে, জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের আবিষ্কার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষণার সিদ্ধান্তও আশ্চর্যজনকভাবে একইরকম। এক্ষেত্রে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের তথ্য-প্রমাণের সঙ্গে কোরআনের বাণী ও বক্তব্যের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। অন্যকথায়, মানুষের সৃষ্টি, তার গঠন-সৌকর্য, মানবজাতির শারীরিক সংগঠন-কাঠামোর ক্রমবিকাশ, জাতিগতভাবে মানুষের দেহাবয়বের পরিবর্তন ও রূপান্তর ইত্যাদি সম্পর্কিত জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের আবিস্কৃত ও গবেষণালব্ধ তথ্য-প্রমাণের সঙ্গে কোরআনের এতদ্‌সংক্রান্ত বাণী ও বক্তব্যের কোনও গরমিল নেই ঃ গরমিল খুঁজতে গেলে বরং নিরাশই হতে হয়।

মানুষের আদি উৎস কি? এ প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞান জানাচ্ছে যে, মানুষের এই রূপান্তরের কাজটি সম্পাদিত হয়েছে 'জেনেটিক কোড' বা বংশগতির-ধারায় তথা সুনির্দিষ্ট এক নিয়মে। বিজ্ঞান আরো তথ্য দিচ্ছে যে, বংশগতির এই সূত্রটি প্রতিটি নবজাতক লাভ করে তার পিতা ও মাতার প্রজনন-কোষ থেকে। যে মুহূর্তে পুরুষের বীর্য মাতৃজরায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়, সেইমুহূর্ত থেকেই বংশগত উত্তরাধিকার নির্ধারণের কাজটি শুরু হয়ে যায়। প্রথম পর্যায়ে এই কাজটি শুরু হয় ভ্রূণের একান্ত প্রাথমিক স্তরে— (গর্ভধারণের ২ মাসের মধ্যে); এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজটি শুরু হয় ভ্রূণের ২ মাস বয়সের পরে। (প্রথম স্তরে ভ্রূণকে বলা হয় 'এমব্রাইও'; দ্বিতীয় স্তরে ভ্রূণের বৈজ্ঞানিক নাম হল, 'ফিটাস'।) এই দুই স্তরে বা পর্যায়েই নির্ধারিত হয়ে যায় গর্ভস্থ শিশু পিতামাতা থেকে কি রকম দৈহিক গঠন-কাঠামো লাভ করবে ঃ অর্থাৎ শিশুর ভবিষ্যৎ চেহারা-সুরত কি রকম হবে, পিতামাতা থেকে কতটা আলাদা হবে। এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের মানুষের দেহ-কাঠামো তথা অবয়বের ক্ষেত্রে এই যে পরিবর্তন কিংবা সংশোধন— যাই বলা হোক, তাই কিন্তু সুনির্দিষ্ট একটা রূপ লাভ করে সন্তান জন্মগ্রহণের পর। শুধু তাই নয়, প্রতিটি নবজাতকের দেহের গঠন-কাঠামোগত এই সংশোধন পরিবর্তন তথা রূপান্তরের কাজটা চলে তার গোটা শৈশব জুড়ে— শরীরের বাড়ন্ত অবস্থা অব্যাহত থাকা পর্যন্ত।

পিতামাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার সত্ত্বেও সন্তানের এই যে দেহগত আলাদা বৈশিষ্ট্য— আলাদা চেহারা, তার কারণ কি? এ বিষয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে এমন একটি উপাদান, যা 'জিন' নামে খ্যাত।

এই 'জিন'-এর আবিষ্কার মানব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধন করেছে এক বিপ্লব। বংশগতির ধারায় 'জিন'-এর ভূমিকা এতই অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর যে, তা ইতিপূর্বের এতদসংক্রান্ত বহুতত্ত্ব ও ধারণাকে পাল্টে দিয়েছে। যাহোক, সংক্ষেপে বলতে গেলে, এই 'জিন'-এর দ্বারা সংশোধিত ও পরিমার্জিত কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে বিকৃত হয়ে ভ্রূণের বেলায় এবং পরবর্তী পর্যায়ে জন্মগ্রহণকারী শিশুর বেলায় যে পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে, তা সেই সন্তানটিকে দান করে দৈহিক কাঠামোগত এমন এক বৈশিষ্ট্য— যা এককথায় একক এবং অনন্য।

শুধু একটি ডিম্বকোষ ঘটনাচক্রে যদি (এবং তা অবশ্যই ব্যতিক্রম) দুটি পৃথক শুক্রকীট দ্বারা নিষিক্ত হয় এবং তার ফলে যে জমজ সন্তানের জন্ম হয়, সেই বিশেষ শ্রেণীর জমজ ছাড়া কোন-একজন মানুষই কোন দিক দিয়েই অপর কোন মানুষের মত হয় না। না চেহারা সুরতে, না আচার-আচরণে। একেবারে প্রাথমিক স্তরে জিন-এর এই ভূমিকা মানুষের দেহাবয়বগত পার্থক্য প্রদানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তার ভূমিকা দাঁড়ায় ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর।

এভাবেই বংশপরম্পরায় মানবজাতির মধ্যে সার্বিক ও সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনের যে ধারা চলে এসেছে, সময়ের ধারাবাহিকতায় সেই 'পরিবর্তনই' ক্রমান্বয়ে একটি একটি করে গোটা মানব-প্রজন্মকে বদলে দিয়েছে সম্পূর্ণভাবেই। আধুনিক জীবাশ্ম-বিজ্ঞান এখন অতীতের মানব-প্রজন্মের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজাতির অস্তিত্বের যে প্রতিষ্ঠিত তথ্য-প্রমাণ পেশ করছে, তা মূলতঃ পুরুষানুক্রমে বিভিন্ন মানব-প্রজাতির মধ্যে জিন-এর এই ভূমিকাজাত রূপান্তরেরই ইতিবৃত্ত।

এই পর্যায়ে কোরআনে মানব-প্রজনন সম্পর্কে যে বক্তব্য রয়েছে তার বিচার-বিশ্লেষণ অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে স্বাভাবিকভাবেই। সুতরাং, বিষয়টি কোরআনের মত একটি ধর্মগ্রন্থের বাণী ও বক্তব্যের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। যেমন ঃ

কোরআন নাজিল হয়েছিল খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে।

তখন রচিত যেকোন পুস্তকের মানব-প্রজনন-সম্পর্কিত যেকোন তথ্যই আধুনিক বিজ্ঞানের নিরিখে ভ্রান্তিপূর্ণ হতে বাধ্য।

কেননা, বিজ্ঞান তখন মোটেও তেমন কোন উন্নতি বা উৎকর্ষতা লাভ করেনি।

তখন বিশ্বের সর্বত্র মানব-প্রজনন সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ভাবনা এমনকি জ্ঞান-প্রজ্ঞাও যতসব উপকথা ও কুসংস্কারজাত ধ্যান-ধারণাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। যা হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

এখন আমরা দেহবিজ্ঞান, ভ্রূণতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কে যে অত্যাধুনিক তথ্য-জ্ঞান অর্জন করেছি, তা মূলত মানবদেহ-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার অবদান।

এমতাবস্থায় সপ্তম শতাব্দীর কোন পুস্তকে মানবদেহযন্ত্রের মত জটিল একটি বিষয়ে কতটুকু জ্ঞান আমরা আশা করতে পারি? এবং তা থেকে মানব-প্রজননের মত জটিলতর বিষয়ের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানার ও বুঝার মত কতটুকু তথ্য আমরা পেতে পারি?

এই আলোচনা অবতারণার উদ্দেশ্য এই যে, এর দ্বারা আমরা নতুন কোন থিওরি বা তত্ত্ব জানাতে চাই। বরং, এই আলোচনার দ্বারা একটি সত্যই তুলে ধরতে চাই, সপ্তম শতাব্দীতে অবতীর্ণ কোরআনে মানব-প্রজনন সম্পর্কে এমন সব তথ্য ও ধারণা প্রদান করা হয়েছে— যা সর্বাধুনিক বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরেও বাস্তব এবং সঠিক বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এ কথা সবারই জানা কোন থিওরি বা তত্ত্ব সাধারণ নিয়মানুসারেই পরিবর্তনশীল। সে কারণে শুধু তত্ত্বগত জ্ঞান সম্বল করে ও শুধু তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিজ্ঞানের কোন বিষয়ে হাত দেয়ার অর্থ অসংখ্য তত্ত্বের জালে জড়িয়ে পড়ে দিশাহারা হওয়া। তাছাড়া, এখন যে তত্ত্ব সঠিক বলে বিজ্ঞানে পরিগৃহীত হচ্ছে, কাল সেই তত্ত্ব ভিত্তিহীন বা অকেজো বলে প্রমাণিত ও পরিত্যক্ত হওয়া বিচিত্র কিছু নয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে!

মূলত, বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত দিয়ে কোনকিছুর তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন পড়ে এমনসব তথ্য ও উপাত্তের যা অপরিবর্তনীয়। শুধু তাই নয়, সেইসব তথ্য এমন হওয়াও আবশ্যক যেন প্রয়োজনে বাস্তবেও সেগুলোর কার্যকর প্রমাণ দাখিল করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠিত তথ্য-প্রমাণের আলোকে কোনকিছু তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের এটাই হচ্ছে সর্বোত্তম পদ্ধতি।

যাহোক, মানুষের জন্ম তথা মানব-প্রজননের কাজটা বিশেষ কতকগুলো দৈহিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে চালু রয়েছে। সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণায় এসব প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি শনাক্ত ও বিশ্লেষিত করাও সম্ভব হয়েছে। এভাবেই বিজ্ঞান এখন জানিয়ে দিচ্ছে যে, মানব-প্রজননের সূচনা ঘটে নারীর ফেলোফিয়ন টিউবে (ডিম্বাশয় থেকে বহির্গত নালী)— ডিম্বাণুর উর্বরতাপ্রাপ্তির মাধ্যমে।

এই ডিম্বাণুটি দুই ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী সময়ে নারীর ডিম্বকোষ থেকে স্খলিত হয়। এই ডিম্বাণুটিকে উর্বরতা প্রদান করে থাকে পুরুষের শুক্রকীট— যা মূলত একটি জীবকোষ। যৌনমিলনের কালে পুরুষ কর্তৃক নিঃসৃত এক কিউবিক

সেন্টিমিটার পরিমাণ বীর্যে এরকম কোটি কোটি শুক্রকীট অবস্থান করে। কিন্তু নারীর ডিম্বাণুকে উর্বরতা প্রদান করে একটিমাত্র শুক্রকীট। অর্থাৎ, পুরুষ-নিঃসৃত বীর্যের মধ্যস্থিত শুধু একটি একক জীবকোষই নারীকে গর্ভবতী করে থাখে। অন্যকথায়, যৌনমিলনের কালে স্খলিত বীর্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অণু-ভগ্নাংশই নারীর ডিম্বাণুকে উর্বরতা প্রদানের জন্য তথা নারীকে গর্ভবতী করার জন্য যথেষ্ট।

এই যে পুরুষের বীর্য, যা থেকে নারীর গর্ভাধারণ হয়ে থাকে, সেই বীর্য তৈরি হয় পুরুষের অণ্ডকোষে। সেখানে এই বীর্য তৈরির ব্যবস্থা যেমন রয়েছে; তেমনি সেখানে সেই বীর্য মওজুদ রাখার জন্যও রয়েছে বিশেষ-ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনে সেই বীর্য সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্যও রয়েছে নির্দিষ্ট নালিপথ। যৌনমিলনের পরিণতিতে পুরুষের বীর্য এই নালিপথ দিয়ে বেরিয়ে আসে তার মওজুদ অবস্থান থেকে। বেরিয়ে আসার পথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্ল্যান্ডের বহুবিধ তরল পদার্থের সঙ্গে তা সংমিশ্রিত হয়।

অবশ্য, এসব গ্ল্যান্ড-নিঃসৃত তরল পদার্থের কোনটাতেই নারীর ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করার বা উর্বরতা প্রদান করার মত কোনও উপাদান থাকে না। নারীর ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় শুধু পুরুষের অণ্ডকোষ-নিঃসৃত শুক্রকীটের দ্বারাই। তবে অপরাপর গ্ল্যান্ড-নিঃসৃত পদার্থসমূহ সংশ্লিষ্ট শুক্রকীটটিকে এমনভাবে নারীর ডিম্বাণুর নাগালে পৌছাতে সহায়তা করে— যার ফলে ডিম্বাণুটি সহজেই নিষিক্ত হয়, হয় উর্বরতাপ্রাপ্ত। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষের বীর্য হচ্ছে এমন একটি তরল পদার্থ যাতে রয়েছে শুক্রকীট ছাড়াও অন্যবিধ তরল পদার্থের সংমিশ্রণ। এভাবে পুরুষবীর্যের সহায়তায় উর্বরতাপ্রাপ্তির পর নারীর ডিম্বাণুটি ফেলোপিয়ন টিউবের মাধ্যমে জরায়ুগর্ভে নীত হয়। এই নীত হওয়ার সময় থেকেই শুরু হয় উর্বরতাপ্রাপ্ত ডিম্বাণুতে প্রবেশকারী শুক্রকীট তথা একক জীবকোষের বিভক্তির কর্মধারা। এরপর উর্বরতাপ্রাপ্ত ডিম্বাণুবাহী ওই শুক্রকীটটি আক্ষরিক অর্থেই 'রোপিত' হয় জরায়ুগর্ভের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ও পেশীর মধ্যে। পরবর্তী পর্যায়ে এদেরই সমবায়ে গঠিত হয় গর্ভফুল।

এভাবে নারীর গর্ভাধানের পর ভ্রূণটি যখন খালি চোখে দেখার মত পর্যায়ে পৌছায়, তখন তার অবস্থা দাঁড়ায় অতিক্ষুদ্র একখণ্ড মাংসপিণ্ড ঃ আলাদা করে বুঝবার মত আর কোন অঙ্গের অস্তিত্ব তখন সেখানে থাকে না। এই অবস্থায় সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মাংসপিণ্ডটি ক্রমান্বয়ে সেখানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। এরপর বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে সেই আকার-অবয়বহীন মাংসপিণ্ডটি একসময় ধারণ করে মানবাকৃতি।

অবশ্য, প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণের কোন কোন অঙ্গ বিশেষত মাথাটি বাকি দেহের তুলনায় বৃহদায়তন হয়ে থাকে। পরে অবশ্য মাথার আয়তন হ্রাস পায় এবং একসময় সেই ভ্রূণটি প্রাণবাহী দেহ-কাঠামোর রূপ পরিগ্রহ করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে সেই প্রাণবাহী ভ্রূণটি একে একে লাভ করে মাথার খুলি, মাংসপেশী, রক্তসংবাহী শিরা-উপশিরা, নাড়ীভূঁড়ি ইত্যাদি।

মোটামুটিভাবে, এই হচ্ছে মানব-প্রজনন-সংক্রান্ত আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণাজাত তথ্য যা একাধারে সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত; এবং মানব-প্রজননের এই ধারা অপরিবর্তনীয়ভাবেই অব্যাহত রয়েছে।

মানব-প্রজনন সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য-উপাত্ত উপরে তুলে ধরা হয়েছে। এবারে আমরা ওইসব তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে কোরআনে বর্ণিত মানব-প্রজনন-সংক্রান্ত বাণী ও বক্তব্যের তুলনামূলক বিচার-পর্যালোচনা শুরু করা যায়।

কোরআনে মানব-প্রজনন সম্পর্কে যেসব বাণী (আয়াত) রয়েছে, আলোচনার সুবিধার্থে সেগুলোর মূলবক্তব্য প্রথমেই সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে। যথা ঃ

(১) নারীর ডিম্বাণুকে উর্বরতা প্রদানের জন্য প্রয়োজন পুরুষ-বীর্যের এক ক্ষুদ্র অণু-ভগ্নাংশ;

(২) পুরুষের বীর্য বিভিন্ন উপাদানে পরিগঠিত এক সংমিশ্রিত তরল পদার্থ;

(৩) উর্বরতাপ্রাপ্ত ডিম্বাণুর রোপণ-প্রক্রিয়ার কাজটি ঘটে জরায়ুতে; এবং

(৪) জরায়ুগর্ভে ভ্রূণের নানা বিবর্তনক্রিয়া সাধিত হয়।

সামান্যতম বীর্য ঃ শুক্রকীট

"(আল্লাহ্) গঠন করিয়াছেন মানুষকে সামান্যতম পরিমাণ (শুক্র) হইতে।"

—সূরা ১৬ (নহল), আয়াত ৪ ঃ

এই একই বক্তব্য কোরআনে উচ্চারিত হয়েছে মোট এগারোবার। এসব আয়াতে যে আরবী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেই 'নুৎফা' শব্দের অনুবাদ এখানে করা হয়েছে 'সামান্যতম পরিমাণ শুক্র'। মূলত, এই আরবী শব্দটি দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে, তার সঠিক অর্থ ও ভাবপ্রকাশকারী কোনও শব্দ আমাদের জানা নেই। কোন কোন অনুবাদক এই 'নুৎফা' শব্দের অর্থ করেছেন 'একবিন্দু'। আরবী যে ক্রিয়াপদ থেকে এই শব্দটি (নুৎফা) এসেছে— তার মর্মার্থ হল ঃ ফোঁটা ফোঁটা করে চুয়ানো (টু ড্রিবল, টু ট্রিকল)। কোন পাত্র থেকে তরল কিছু ঢেলে ফেলে দেয়ার শেষপর্যায়ে সেই পাত্র থেকে সেই তরল পদার্থের যেমন কিছু

চুঁইয়ে পড়ে, তেমনি। অন্যকথায়, 'নুৎফা' হল 'অতি সামান্যতম পরিমাণ তরল পদার্থ'। এই শব্দের দ্বিতীয় অর্থ 'এক ফোঁটা পানি'। এইক্ষেত্রে এই শব্দটির দ্বারা বুঝানো হয়েছে, 'বীর্যের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-ভগ্নাংশ'। কেননা, কোরআনের অপর এক আয়াতে এই 'নুৎফা' শব্দটিকে 'বীর্য' (আরবী 'মনি' ঃ চলতি বাংলায়ও 'মনি' শব্দটি 'বীর্য' অর্থেই চালু রয়েছে) শব্দের সঙ্গে যুক্তভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যথা ঃ

> "সে (মানুষ) কি সেই অতি সামান্যতম শুক্র ছিল না— যাহা সজোরে নির্গত/নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল?"— সূরা ৭৫ (কিয়ামাহ্), আয়াত ৩৭ ঃ

এখানে কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছে যে, নারীর ডিম্বাণু নিষিক্ত করার ব্যাপারটা যোনিতে নিক্ষেপিত পুরুষ-বীর্যের পরিমাণের উপরে আদৌ নির্ভরশীল নয়, আধুনিক টেস্ট টিউবে সন্তান উৎপাদনেও বিষয়টা প্রমাণিত। কোরআনের এই বক্তব্য আমাদের আলোচ্য পর্যালোচনার জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, প্রজননের ক্ষেত্রে কোটি কোটি শুক্রকীটধারী পুরুষ-বীর্যের এই অণু-ভগ্নাংশ অর্থাৎ শুধু শুক্রকীট বা একক জীবকোষ এবং তার ভূমিকা মোটেও খালি চোখে দেখার ব্যাপার নয়! অতীতে পুরুষের বীর্যের এই জীবন্ত জীবকোষ বা শুক্রকীট ও তার ভূমিকা-সম্পর্কে মানুষ আদৌ অবহিত ছিল না। ফলে, এই আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যায় অনেকে বিষয়টা শুধু যে গুলিয়ে ফেলেছেন, তাই নয়, এ সম্পর্কে তাঁরা যে ধারণা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন, তাও ছিল বিভ্রান্তিকর।

এ কথা সবার জানা যে, পুরুষ-বীর্যে শুক্রকীটের অস্তিত্ব আবিস্কৃত এবং তার ভূমিকা সনাক্ত করা হয়েছে— এই কিছুদিন আগে, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। অথচ, তখনও হাজার বছর আগে সপ্তম শতাব্দীর কোরআন এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য ঘোষণা করেছে এবং একান্ত আধুনিক যুগে এসে শুধু বিজ্ঞানের গবেষণায় তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। মূলত, শুক্রকীট এতই সূক্ষ্ম যে, খালি চোখে তা দেখার আশা করা বাতুলতা মাত্র। শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রকীটের যে আকার-আয়তন পাওয়া গেছে, তা এক মিলিলিটারের সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অতিসূক্ষ্ম শুক্রকীটই হচ্ছে, বীর্যের মূল উপাদান বা সারভাগ।

এই অণুবিন্দু পরিমাণ শুক্রকীটের সঙ্গে থাকে ডি. এন. এ. টেপ (আধুনিক বিজ্ঞান আবিস্কৃত এক ধরনের এসিড— যার ভূমিকা হল কোনকিছু পরিবহন

করা)। এই ডি. এন. এ. টেপের দ্বারাই পিতার 'জিন' ভ্রূণ তথা সন্তানের মধ্যে চালিত হয়। এবং এভাবে পিতৃ-জিন এবং (ডিম্বাণুর মাধ্যমে পরিবাহিত) মাতৃ-জিন সম্মিলিতভাবে গঠন করে শিশুর ভবিষ্যৎ। একেই সাধারণ ভাষায় বলা হয়ঃ 'বংশগত উত্তরাধিকার'।

পুরুষের প্রজনন-সেলের (শুক্রকীট) মধ্যস্থিত জিন এবং নারীর প্রজনন-কোষের (ডিম্বাণু) মধ্যস্থিত জিন যৌথভাবে নির্ধারণ করে গর্ভস্থ শিশুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমরা জেনেছি, প্রজননের কাজ শুরু হওয়ামাত্রই জিন-বহনকারী শুক্রকীটের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়ে যায় গর্ভস্থ সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে হবে।

শুক্রকীট যদি হেমিক্রোমোজম 'ওয়াই' হয়, তবে সন্তান হবে পুত্র; আর তা যদি 'এক্স' হয়, তবে হবে কন্যা। এ পর্যায়ে কারো পক্ষেই নির্ধারণ করার উপায় যে, গর্ভস্থ সন্তান পুত্র হবে না কন্যা হবে। কেননা, বীর্যের সঙ্গে কোটি কোটি শুক্রকীট নিক্ষিপ্ত হয় যোনিগর্ভে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে শুধু শুক্রকীট নারীর ডিম্বাণুতে অনুপ্রবেশে সক্ষম হয়, বাকিগুলো বরণ করে ব্যর্থতা বা মৃত্যু। ডিম্বাণুতে অনুপ্রবেশকারী শুক্রকীটটি যদি 'এক্স' হেমিক্রোমোজম হয়, তাহলে শিশুটি হবে কন্যা, আর তা যদি 'ওয়াই' হয় তাহলে সেই সন্তান হবে পুত্র। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, জন্মসূত্রে ঠিক সেই মুহূর্তেই শিশুর লিঙ্গ নির্ধারিত হয়ে যায়, যে মুহূর্তে পুরুষের বীর্যস্থ কোটি কোটি শুক্রকীটের মধ্যথেকে একটিমাত্র শুক্রকীট নারীর ডিম্বাণুতে অনুপ্রবেশ ঘটে।

তাছাড়া, যোনিগর্ভে নিক্ষেপিত পুরুষ-বীর্যের পরিমাণের তুলনায় সেই শুক্রকীটটি যে অণুবিন্দু ভগ্নাংশের চেয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সূক্ষ্ম, সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে। অবশ্য, ভ্রূণ-সৃষ্টির পর নির্ধারিত একসময় আল্ট্রা সোনো-গ্রাফিক স্ক্যানিং-এর মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র না কন্যা? বিজ্ঞান তা এখন জানাতে সক্ষম। তবুও, শুক্রকীট কর্তৃক ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার আগেপর্যন্ত কারোপক্ষেই সন্তানের লিঙ্গ-পরিচয় জানা সম্ভব নয়। এই পটভূমিকায়ই কোরআন চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে যে, গর্ভের সন্তান পুত্র হবে না কন্যা হবে, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তা আর কেউ জানে না। এদিকে এই অণুবিন্দু ভগ্নাংশের চেয়েও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শুক্রকীটের সঙ্গে পরিবাহিত হয়ে থাকে সেই জিন— যা সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণের পাশাপাশি নির্ধারণ করে দেয় সেই সন্তানের গড়ন, ভবিষ্যৎ চেহারা এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও! এই কথাটাই কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে অত্যন্ত পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে ঃ

"এক অণুবিন্দু পরিমাণ তরল পদার্থ হইতে (আল্লাহ্) তাহাকে গঠন করেন (সুষম মাত্রায়), এবং নির্ধারণ করিয়া দেন তাহার নিয়তি।"

— সূরা ৮০ (আবাসা), আয়াত ১৯ ঃ

"খালাকা" শব্দের সাধারণ প্রচলিত অর্থ 'সৃষ্টি করা'। কিন্তু তার আদি-অর্থ ধরে নিয়েই এখানে 'খালাকা' শব্দের তরজমা করা হলো— 'সুষম মাত্রায় গঠন করা' কিংবা 'নির্মাণ করা' অথবা 'সৌষ্ঠব দান করা'।

কোরআনের এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, পিতৃবীর্যের মধ্যস্থিত শুক্রকীটের দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার মুহূর্তেই শিশুর নিয়তি বা ভাগ্য নির্ধারিত হয়। বিজ্ঞানও জানাচ্ছে, পিতৃবীর্যের মধ্যস্থিত শুক্রকীট নির্ধারণ করে সন্তানের লিঙ্গ এবং ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার মুহূর্ত থেকে পিতৃ ও মাতৃ জিন-এর ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় পরিগঠিত হতে শুরু করে সন্তানের চেহারা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি। এভাবেই সন্তান লাভ করে তার বংশগত উত্তরাধিকার। আর একইভাবে জিন-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত জীবাণীশক্তি, আয়ুষ্কাল, স্বাস্থ্য, ভালমন্দ, গুণাগুণ সবমিলিয়ে নির্ধারিত হয় সন্তানের নিয়তি অর্থাৎ তার ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ। সুতরাং, স্বীকার করতেই হবে, আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক আবিষ্কার বিশেষত জিন- সম্পর্কিত প্রাপ্ত-তথ্য আর কোরআনের বাণীতে উপস্থাপিত বক্তব্যের মিল-মিছিল শুধু বিস্ময়কর নয়, অনুসন্ধিৎসু সকলের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণীয়ও বটে।

পুরুষের বীর্য যে বিভিন্ন গ্ল্যান্ড-নিঃসৃত উপাদানে গঠিত একটি সংমিশ্রিত তরল পদার্থ, তা আধুনিক বিজ্ঞান-গবেষণায় প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। কথাটা কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

"নিশ্চয় আমরা মানুষকে গঠন করিয়াছি সামান্য পরিমাণ সংমিশ্রিত তরল পদার্থ হইতে।"—সূরা ৭৬ (দাহর), আয়াত ২ ঃ

এখানে যে মিশ্রিত তরল পদার্থের উল্লেখ করা হয়েছে, আরবি শব্দে তা হচ্ছে 'আমসাজ'। প্রাচীন তাফসীরকারকগণ এই 'সংমিশ্রিত তরল পদার্থ' বলতে সাধারণ পুরুষ ও নারীর 'মিশ্রিত বীর্য' বুঝিয়েছেন। তাঁরা 'নারীর বীর্য' বলতে সেই 'তরল পদার্থ'কে বুঝিয়েছেন— যৌনমিলনেরকালে যা নারীর যোনী থেকে নিঃসৃত হয়। তাঁরা মনে করতেন যে, সন্তান-প্রজননে নারীর যোনী নিঃসৃত এই তরল পদার্থও পুরুষ-বীর্যের সমান ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিষয়টা বৈজ্ঞানিক বিচারে ভিত্তিহীন হিসেবে প্রমাণিত। প্রকৃতপক্ষে, নারীর কোনও বীর্য নেই। প্রাচীন অনুবাদক ও তাফসীরকারগণের 'আমসাজ' শব্দের এই অর্থ ও ব্যাখ্যা (নারী ও পুরুষের মিশ্রিত বীর্য) তাই আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু প্রাচীন তাফসীরকারগণ এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন যেহেতু তাঁদের সময় এই ধারণাই সর্বত্র চালু ছিল। এমনকি কোরআন যখন নাজিল হয়েছিল, তখনো মানুষ এই ধারণাই পোষণ করত।

এর কারণ অবশ্য অবোধগম্য নয়। কেননা, সেকালে দেহবিজ্ঞান-সম্পর্কিত নারীর আলাদা দৈহিক বৈশিষ্ট্য ও ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক কোন জ্ঞান কারো ছিল না। সে-কারণে সাধারণ মানুষের মত সেকালের বিজ্ঞ-বিশেষজ্ঞ তাফসীরকারগণও মনে করতেন যে, নারীরও বীর্য রয়েছে এবং সন্তান উৎপাদনে তা পুরুষ-বীর্যের সমান ভূমিকা পালন করে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রাচীনকালের বরেণ্য তাফসীরকারগণের সবাই ছিলেন ধর্মীয় জ্ঞানে সুপণ্ডিত এবং আরবী ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী। কিন্তু তাহলে কি হবে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাজাত তথ্য-

উপাত্ত তাঁদের নাগালের মধ্যে ছিল না। ফলে, তাঁদের অনুসরণের দরুন এ যুগেরও অনেক তাফসীরকার শুধু এ বিষয়ে নয়, কোরআনের প্রকৃতি ও বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বহুবিষয়ে একইধরনের অবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রচার করে চলেছেন।

এই স্থলে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন। 'আমসাজ' বা 'সংমিশ্রিত বীর্য' যদি 'নারী ও পুরুষের মিশ্রিত বীর্য' হত, তাহলে শব্দটি কোরআনে 'বহুবচনে' না হয়ে আরবী ভাষার সাধারণ রীতি অনুসারে 'দ্বিবচনেই' উল্লিখিত হত। কোরআনের ভাষা সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকেফহাল, তাঁরা জানেন, এ ধরনের প্রকাশভঙ্গিতে ভাষা ব্যবহারে কোরআনের কোথাও কোন ভুল পরিলক্ষিত হয়নি। এখানে বহুবচন ব্যবহারের দ্বারা বহু উপাদানের মিশ্রণে গঠিত পুরুষ-বীর্যের কথাই বলা হয়েছে— অন্য কিছু নয়!

এই পর্যায়ে আরেকটি বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার; এবং সেই তথ্যটি আলোচ্য গবেষণার জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তা হল, নারীর যে ডিম্বাণু, তা কোনক্রমেই পুরুষ-বীর্যের মত তরল পদার্থের সংমিশ্রণ-জাত কিছু নয়। তাছাড়া, যৌনমিলনেরকালে নারীর যোনীতে যে পিচ্ছিল তরল পদার্থের নিঃসরণ ঘটে এবং জরায়ুতে যে-সব শ্লেষ্মা-জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান, ডিম্বাণুর উর্বরতা প্রদানে তথা সন্তান-সৃষ্টিতে সে-সবের কোন ভূমিকা নেই। কেননা, সন্তান উৎপাদনের বা ডিম্বাণু নিষিক্তকরণের অপরিহার্য উপাদান ওইসব পদার্থে অনুপস্থিত।

সুতরাং, কোরআনে 'আমসাজ'; শব্দের দ্বারা যে 'সংমিশ্রিত তরল পদার্থের' কথা বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে পুরুষের সেই বীর্য— যা শুক্রকীটবাহী এবং বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণে গঠিত। আধুনিক গবেষণায় বিজ্ঞান জানাচ্ছে, পুরুষের বীর্যে যে-সব উপাদান বিদ্যমান, সেগুলো নিঃসৃত হয় নিম্নলিখিত গ্ল্যান্ড বা রসস্রাবী গ্রন্থি থেকে ঃ (১) টেস্টিক্যালস্ বা অণ্ডকোষদ্বয়; (২) সেমিন্যাল ভেসিক্যালস্ বা মৌলিক বুদবুদ কোষ; (৩) প্রোটেস্টেন্ট গ্ল্যান্ড এবং মূত্রনালী সংলগ্ন বিভিন্ন গ্ল্যান্ড।

মূলত, স্ত্রী-ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ তথা ডিম্বাণুকে উর্বরতা প্রদানের কাজটি শুধু বীর্যের দ্বারাই সাধিত হয়। এটি আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং প্রমাণিত একটি সত্য। কোরআনের অন্য এক আয়াতে প্রমাণিত এই সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে এইভাবে ঃ

"অতঃপর (আল্লাহ্) তৈয়ার করিয়াছেন তাহার (মানুষের) বংশধারা তুচ্ছ তরল পদার্থের সারনির্যাস হইতে।"
— সূরা ৩২ (সাজদা), আয়াত ৮ ঃ

এখানে তুচ্ছ, ঘৃণ্য বা অবজ্ঞাত বলতে বীর্যকে যতটা না বুঝানো হয়েছে তারচেয়েও বেশি বুঝানো হয়েছে সেই তরল পদার্থ নির্গত/নিক্ষিপ্তকারী পুরুষের মূত্রনালীকে— যা দিয়ে মূত্রের মত ঘৃণ্য পদার্থ নির্গত হয়। (উল্লেখ্য অনাবশ্যক যে, নারীর মূত্রনালী ও যোনীনালী এক নয়; বরং আলাদা)।

এই আয়াতে 'তরল পদার্থের সারনির্যাস' বলতে যে আরবী শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে— ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কর্দমের সারনির্যাস থেকে। এই 'সুলালাত' শব্দের আরেক অর্থ, 'সারনির্যাস' বা 'কোন-একটি পদার্থ থেকে নিঃসৃত অপর একটি পদার্থ,' বা 'নির্যাস'। এই 'সুলালাত'-এর অপর এক অর্থ, 'পদার্থের সর্বোত্তম অংশ' বা 'সারভাগ'। সুতরাং, এখানে এই 'সুলালাত' শব্দের দ্বারা অনিবার্যভাবেই পুরুষ-বীর্যের মধ্যস্থিত 'শুক্রকীটের' কথাই যে বুঝানো হয়েছে, তা বোধহয় না বললেও চলে।

ডিম্বাণুর রোপণ প্রক্রিয়া

পুরুষের শুক্রকীট দ্বারা উর্বরতাপ্রাপ্ত ডিম্বাণুটি যথাসময়ে নারীর জরায়ুতে অবস্থান গ্রহণ করে। কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে এ বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে কোরআনে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হল আরবী 'আলাক'। এই 'আলাক' শব্দের সঠিক অর্থ হল ঃ 'এমন কিছু যা দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন', 'দৃঢ়ভাবে জড়ানো', 'দৃঢ়ভাবে আটকানো'। এতদ্‌সংক্রান্ত শুধু দুটি আয়াত নিচে তুলে ধরা হল ঃ

"(মানুষ) কি সেই সামান্যতম শুক্র ছিল না— যাহা সজোরে নিক্ষিপ্ত/নির্গত হইয়াছিল? – সূরা ৭৫ (কিয়ামা), আয়াত ৩৭ ও ৩৮ ঃ

অতঃপর সে হইয়াছিল এমনকিছু যাহা দৃঢ়ভাবে আটকানো ছিল; ইহার পর (আল্লাহ্) তাহাকে গঠন করিয়াছেন যথাযথমাত্রায়, সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া।"

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শুক্র দ্বারা নিষিক্ত হওয়ার পর ডিম্বাণুটি মোটামুটিভাবে ষষ্ঠ দিবসে নারীর জরায়ু গর্ভস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে অবস্থান গ্রহণ করে। শারীরবিজ্ঞানের ভাষায় এটাকেই বলা হয়, 'ডিম্বাণুর রোপণকর্ম'। অন্যকথায়, এই ষষ্ঠ দিবসের পরে ডিম্বাণুটি জরায়ুগর্ভে দৃঢ়ভাবে আটকানো হয়। 'দৃঢ়ভাবে জড়ানো' কিংবা 'দৃঢ়ভাবে আটকানো' এটাই হচ্ছে এই আয়াতে এবং কোরআনের অন্যত্র ব্যবহৃত 'আলাক' শব্দের আদি ও প্রকৃত অর্থ। গৌণ অর্থে 'আলাক' শব্দকে 'রক্তপিণ্ড' বা 'জমাট বাঁধা রক্ত' বলা যায় বটে; কিন্তু এই ব্যাখ্যাজাত অর্থ এখানে আদৌ খাটে না। কারণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রজনন-প্রক্রিয়ার কোন পর্যায়েই ভ্রূণ তথা শিশুটিকে কখনই 'জমাট বাঁধা রক্ত' কিংবা 'রক্তপিণ্ডের' অবস্থা অতিক্রম করতে হয় না। অথচ, আধুনিককালেও কোরআনের বিভিন্ন অনুবাদে বিভ্রান্তিকরভাবেই 'আলাক' শব্দের তরজমা করা হচ্ছে ঃ 'রক্তপিণ্ড' কিংবা 'জমাট বাঁধা রক্ত'!

প্রকৃতপক্ষে, মানব-প্রজনন-সংক্রান্ত প্রচলিত ভুল ধারণার কারণে সেই প্রাচীনযুগের তাফসীরকারগণ 'আলাক' শব্দের এই ব্যাখ্যাজাত গৌণ অর্থ চালু করেছেন। একইভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণা তথা সঠিক তথ্য-প্রমাণের অভাবে

সেই প্রাচীনযুগের তরজমাকারী ও তফসীরকারগণ বুঝতেও পারেননি যে, 'আলাক' শব্দটির আদি বা মূল অর্থটিই কোরআনের এতদ্‌সম্পর্কিত বক্তব্য প্রকাশের জন্য যথেষ্ট ছিল ঃ ব্যাখ্যাজাত গৌণ অর্থে ব্যবহার এক্ষেত্রে ছিল বিভ্রান্তিকর।

এরদ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বক্তব্য প্রকাশের জন্য কোন কোন শব্দের মূল বা আদি অর্থই যথার্থ। সাধারণ নিয়মেও দেখা যায়, কোরআনে ব্যবহৃত বহু শব্দের আদি অর্থ আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাজাত সত্যের সাথে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে, কোরআনে ব্যবহৃত বহু শব্দের গৌণ বা ব্যাখ্যাজাত অর্থ শুধু ভুল কিংবা বিভ্রান্তিকর নয়; ক্ষেত্রবিশেষে তা অবান্তর বলেও প্রতিপন্ন। 'আলাক' শব্দের প্রচলিত অনুবাদ 'রক্তপিণ্ড' বা 'জমাট বাঁধা রক্ত' তেমনি একটি বিভ্রান্তি।

ভ্রূণের বিবর্তন

ভ্রূণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কোরআনের যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে তাতে দেখা যায়, শুক্রবিন্দু দ্বারা নিষিক্ত ডিম্বাণুটি মাতৃজরায়ুতে এমনভাবে অবস্থান গ্রহণ করে থাকে, যাকে বলা যেতে পারে, 'দৃঢ়ভাবে আটকানো'। এরপর ভ্রূণটি এমন একটি পর্যায় অতিক্রম করে— যাকে আক্ষরিক অর্থেই বলা যেতে পারে 'চিউড্ ফ্লেশ' বা 'চিবানো গোশত'। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নিরীক্ষায় আরো দেখা গেছে, 'দৃঢ়ভাবে আটকানোর' পর্যায় অতিক্রম করার পর ভ্রূণটি কমবেশি কুড়ি দিন পর্যন্ত এই 'চিবানো গোশতের' পর্যায়ে থাকে। অতঃপর শুরু হয় ভ্রূণের আরেক পর্যায় এবং এই পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যে দেখা দেয় অস্থিময় পেশী। অতঃপর তা আবৃত হয় গোশতের দ্বারা। ভ্রূণের এই বিবর্তন সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

> "অতঃপর আমরা সেই (শুক্র) বিন্দুকে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখি (জরায়ুতে), পরে সেই দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখা বস্তুটাকে পরিণত করি চিবানো গোশতের পিণ্ডরূপে; এবং সেই চিবানো গোশতের পিণ্ডকে রূপ দেই হাড়-হাড্ডিতে এবং সেই হাড্ডির উপরে দেই আবরণ— অক্ষত গোশতের দ্বারা।" — সূরা ২৩ (মুমেনুন), আয়াত ১৪ ঃ

ভ্রূণের বিবর্তনের এই বিভিন্নপর্যায়ে বর্ণনায় এখানে কোরআনে দুই ধরনের 'গোশতের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে, দুটি ভিন্ন শব্দের দ্বারা। 'চিবানো

গোশতের' জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'মুদগা'; এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের 'অক্ষত গোশতের' জন্য ব্যবহৃত হয়েছে 'লাহম' যা শরীরে মাংসপেশীর সমার্থক।

পরবর্তী পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও নাড়ীভুঁড়ি তৈরি হয়, তার কথাও কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে এভাবে ঃ

"(আল্লাহ্) দিয়াছেন তোমাদিগকে কর্ণ ও চক্ষুর অনুভূতি এবং নাড়ীভুঁড়ি।"

— সূরা ৩২ (সাজদা), আয়াত ৯ ঃ

ভ্রূণের লিঙ্গের গঠন সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ বিষয়ে কোরআনের বক্তব্য বরং সুনির্দিষ্ট। যথাঃ

"এবং তিনিই (আল্লাহ্) বানাইয়া থাকেন দুই মিলাইয়া এক জোড়া— পুরুষ ও নারী,— সামান্যতম (শুক্রবিন্দু) হইতে— যখন উহা স্খলিত/নিক্ষিপ্ত হয়।"

— সূরা ৫৩ (না'জম), আয়াত ৪৫-৪৬ ঃ

পূর্বোক্ত আলোচনায়, ডিম্বাণুর উর্বরতাপ্রাপ্তির জন্য সামান্যতম পরিমাণ বীর্য বিশেষত উহার মধ্যস্থ কোটি কোটি শুক্রকীট থেকে শুধু একটি শুক্রকীটের প্রয়োজন হয়। কোরআনও সেই বিষয়টির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ও প্রমাণিত আরো তথ্যও এই যে, পুরুষের বীর্য তথা শুক্রের মধ্যেই বর্তমান থাকে হেমিক্রোমোজম-এর চরিত্র— যা ভ্রূণ তথা সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে। ভ্রূণের এই লিঙ্গ নির্ধারণের কাজটি সম্পন্ন হয় ঠিক সেই মুহূর্তে, যে মুহূর্তে শুক্রকীটটি ডিম্বাণুতে অনুপ্রবেশ ঘটায়।

উপরোদ্ধৃত কোরআনের আয়াতেও বলা হয়েছে যে, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ হয় 'সামান্যতম তরল পদার্থ' থেকে। কোরআনের অন্যত্র বর্ণিত (৩২ ঃ ৮) এই 'সামান্যতম তরল পদার্থের সারভাগ' হচ্ছে সেই শুক্রকীটবাহী পদার্থ যে শুক্রকীটের মধ্যে থাকে হেমিক্রোমোজমের চরিত্র। এই হেমিক্রোমোজমের চরিত্রই গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করে (যথাঃ ওয়াই = ছেলে; এক্স = মেয়ে)। সুতরাং, দেখাই যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে কোরআনের বক্তব্য এবং আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণালব্ধ ফলাফল আশ্চর্যজনকভাবেই অভিন্ন।

প্রকৃতপক্ষে, কোরআনের মানব-প্রজনন-সংক্রান্ত সব বক্তব্য আধুনিক যুগের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তথ্যকে নতুন করে সত্য বলে প্রমাণ করছে। অন্যকথায়, কোরআনে বর্ণিত তথ্যাবলী আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কারের দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এখানেই প্রশ্ন ঃ

মোহাম্মদের (দঃ) যুগে বসে কিভাবে কারো পক্ষে আধুনিক জ্রূণতত্ত্বের এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় জানা সম্ভব?

এ কথা তো কারো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, জ্রূণতত্ত্বের এতসব তথ্য-উপাত্ত আবিস্কৃত ও প্রমাণিত হয়েছে কোরআন নাজিলের হাজার বছর পরে একান্ত হালে, আধুনিক যুগে এসে। সুতরাং বিজ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের এই ইতিহাসই এখন সবাইকে একটি স্থির-সিদ্ধান্তে পৌছে দিচ্ছে, আর তা হল ঃ "কোরআনের এতদসংক্রান্ত এইসব বাণী ও বক্তব্য কোনো মানুষের বাণী ও বক্তব্য হতে পারে না। এ বক্তব্য নিঃসন্দেহে ঐশী বক্তব্য; এই বাণী নির্ভুলভাবেই আসমানী ওহী।"

উল্লেখ্য যে, কোরআনের সূরা ওয়াকেয়া'র (৫৬নং সূরা) ৫৮নং বাণীতে মানব-সৃষ্টির বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিসের সৃষ্টি ও কর্মপ্রক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে; এবং ৭৭—৮১ নং বাণীতে বলা হয়েছে ঃ

"নিশ্চয় ইহা মর্যাদাসম্পন্ন কোরআন;
ইহা এমন এক কিতাবে লিপিবদ্ধ যাহা সুসংরক্ষিত;
—পবিত্রতম ব্যতিরেকে কেহ ইহা স্পর্শ করিতে পারে না;
বহুবিশ্বের প্রভু প্রতিপালকের নিকট হইতেই ইহা অবতীর্ণ।
—তবুও কি তোমরা ইহার প্রতি উপেক্ষা/তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিয়া চলিবে?"

পূর্বোক্ত আলোচনায় যে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে, তা হল, পিতা-মাতার নিকট থেকে প্রাপ্ত ক্রোমোজম তথা জিন-এর মাধ্যমে প্রতিটি নতুন শিশুর অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই ঘটে চলেছে পরিবর্তন, বিবর্তন ও রূপান্তর। আধুনিক ভ্রূণতত্ত্ব ও বংশগতি বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক গবেষণালব্ধ এই ফলাফল ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যাঁরা অনবহিত, তাঁদের পক্ষে মানুষের এই দৈহিক সংশোধন তথা পরিবর্তন ও রূপান্তরের বিষয়টা হঠাৎ অনুধাবন করা সহজ নাও হতে পারে।

বংশবিস্তারের মাধ্যমে ব্যক্তির বংশগতির উত্তরাধিকার যেমন বিভক্ত হয়ে পড়ে, তেমনি জিন-এর মাধ্যমে পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারও নতুন বংশগতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এভাবে জিন-এর এই সংযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এক নতুন বংশধারা। বলা অনাবশ্যক যে, নতুন বংশধারার দৈহিক পরিবর্তন-ক্রিয়ার সূচনা হয় মায়ের গর্ভাধারণের সঙ্গে সঙ্গে। শুধু তাই নয়, গর্ভস্থ শিশুর বিবর্তনের মধ্যদিয়ে এই পরিবর্তন, বিবর্তন ও রূপান্তরের ধারা অব্যাহতভাবে চালু থাকে। এভাবে শিশুর দৈহিক পরিবর্তনের নতুন মাত্রা শুরু হয় সংশ্লিষ্ট শিশুটির জন্মের পরবর্তী পর্যায়ে। এই পরিবর্তন, বিবর্তন ও রূপান্তরের কাজটি চলতেই থাকে শিশুর গোটা শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্য জুড়ে এবং শিশুটি যখন যৌবনে পৌঁছায়, শুধু তখনই তার দৈহিক এই রূপান্তরের কাজটি লাভ করে পূর্ণ পরিণতি।

এখানে, আধুনিক বিজ্ঞান-সমর্থিত মানুষের রূপান্তরের যে বিষয়টি আলোচিত হচ্ছে, সেই বক্তব্য কেউ যদি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম না হন, তবে তাঁর নিকট পূর্বেউদ্ধৃত কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের বক্তব্য সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে ধরা নাও পড়তে পারে। কেননা, তিনি ধরেই নিয়েছেন যে, মানুষের দেহগত যে পরিবর্তন, বিবর্তন ও রূপান্তর তা শুধু তার ভ্রূণবস্থায় মাতৃগর্ভেই সম্পাদিত হয় এবং কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে শুধু সেই কথাটাই বলা হয়েছে; অন্য কিছু নয়। কিন্তু এই ধারণা যে সঠিক নয়, উপরের আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট হলো।

মূলত, বিজ্ঞানের গবেষণায় যা ধরা পড়েছে এবং কোরআনের বিভিন্ন বাণীতে যা বলা হয়েছে, তা হল ঃ জন্মের পরেও পরিণত বয়সে পৌঁছানোর সময় পর্যন্ত মানুষের দেহগত পরিবর্তন, বিবর্তন ও রূপান্তরের কাজটা অব্যাহত থাকে। বিষয়টা সীমাবদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন যে-কারো নজর এড়িয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এতসব কারণেই এই গবেষণা-বিশ্লেষণে আধুনিক বিজ্ঞানের নব-আবিস্কৃত জিন-এর ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হলো এবং বিশেষ পরিশ্রম করেই অর্থ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণসহ কোরআনের বেশকিছু আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। সে সব আয়াতে, আমার স্থির বিশ্বাস, সময়ের ধারাবাহিকতায় ব্যক্তি-মানুষের তথা মানবজাতির দৈহিক পরিবর্তন, বিবর্তন ও রূপান্তরের কথাই বলা হয়েছে।

বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য এখানে উপস্থিতক্ষেত্রে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে। মানুষের দেহগত বিবৃতি খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার। দেহবিকৃতির একটি সাধারণ ব্যাধি 'মঙ্গোলিজম' নামে পরিচিত। আধুনিক প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা থেকে জানা গেছে, এই ব্যাধির দরুন যে বিকৃতি ঘটে থাকে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত একটি বিকৃত ক্রোমোজম। বিকৃত এই ক্রোমোজমটি সাধারণ ক্রোমোজম অপেক্ষা তিনগুণ বড়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এই ক্রোমোজমের নাম দিয়েছেন 'ক্রোমোজম—২১' এবং এই ব্যাধির নাম দেয়া হয়েছে 'ট্রাইজোমি—২১'।

সর্বাধুনিক গবেষণার ফলাফল থেকে আরো জানা গেছে, এই বিকৃত ক্রোমোজমের মধ্যে যেসব জিন অবস্থান করে, সেইসব জিনই এই ব্যাধি তথা বিকৃতির জন্য দায়ী। বৈজ্ঞানিক জরিপে আরো ধরা পড়েছে, যে-সব মা ৪০ বছরের বেশি বয়সে সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন, তাঁদের সন্তানেরাই সাধারণত অধিকমাত্রায় এই ব্যাধি তথা বিকৃতিতে আক্রান্ত হয়।

এই ব্যাধির লক্ষণ, শৈশবে দৈহিক বৃদ্ধির অভাব ও বুদ্ধিবৃত্তির ঘাটতি। তছাড়াও, এই ক্রোমোজম তথা জিনধারী ছেলেমেয়েরা দেহগত এমনসব বিকৃতির শিকার হয় যা জন্মকালে আদৌ বুঝা যায় না। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে সে-সব বিকৃতি প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

তবে, ব্যাধির কারণ যাই হোক, দেখা গেছে, গর্ভাধারণের প্রথম কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই রোগের মূল বীজ বা কারণ গর্ভস্থ শিশুর দেহে সঞ্চারিত হয়।

এটা গেল বিবৃতির উদাহরণ ঃ অনুরূপভাবে জাতিগত ক্ষেত্রে মানুষের যে ইতিবাচক দৈহিক সংশোধন, পরিবর্তন ও রূপান্তর, তাও ঘটে থাকে একইধারায়

সুষ্ঠু ক্রোমোজম তথা পরিপুষ্ট জিন-এর মাধ্যমে। আর এই পরিবর্তনের কাজটা শুরু হয় গর্ভধারণের সাথে সাথে, এবং জন্মগ্রহণের পরেও শিশু যতদিন পূর্ণবয়স্কে পরিণত না হয় ততদিন এই পরিবর্তন ও রূপান্তরের কাজটা তারমধ্যে থাকে ক্রিয়াশীল।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে, অস্ট্রালোপিথেকাস-মানব থেকে আধুনিক মানুষের সময়ের ব্যবধান সুদীর্ঘ (প্রায় ১০,০০০ পুরুষ)। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে পুরুষানুক্রমে এই একইধারায় ইতিবাচক এই পরিবর্তন, বিবর্তন ও রূপান্তরের কাজটা চলে এসেছে। প্রতিটি পুরুষের এই ইতিবাচক রূপান্তরের কাজটা ঘটেছে হয়তোবা অতিসামান্য পরিমাণে। কিন্তু কয়েক হাজার পুরুষ ধরে চলতে চলতে এই অতিবাচক রূপান্তরেরধারা ক্রমান্বয়ে দানা বেঁধে বেঁধে একটি চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছে গেছে। আর এভাবে ক্রমান্বয়ে ঘটে-যাওয়া পরিবর্তনের চূড়ান্ত পরিণতিতে সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে আবির্ভূত হয়েছে এখনকার আধুনিক মানুষ।

সুতরাং, ভ্রূণাবস্থার পরিবর্তন ও রূপান্তর এবং জন্ম-পরবর্তী রূপান্তর ও পরিবর্তন যত সামান্যই হোক, একদিকে যেমন তুচ্ছ করে দেখার উপায় নেই; তেমনি অন্যদিকে ভ্রূণাবস্থার পরিবর্তনকেও জন্ম-পরবর্তী পরিবর্তনের সাথে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। বরং, মানবজাতির গোড়া থেকেই সর্বাবস্থায় এই পরিবর্তন, বিবর্তন ও রূপান্তরের কাজটা চলে এসেছে নীরবে, নিরবচ্ছিন্ন এক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কোরআনে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কথা বলে, মাতৃগর্ভে এবং জন্ম-পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের পরিবর্তন, বিবর্তন ও রূপান্তরের যে বক্তব্য স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। আধুনিক জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের ধারায় সুপ্রমাণিত তথ্যের এটাই যে শুধু গ্রহণযোগ্য ও যথাযথ ব্যাখ্যা তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ধর্ম ও বিজ্ঞান

পৃথিবীর বুকে অস্তিত্ব সম্পর্কে যে দুটি প্রশ্ন প্রায়ই বড় হয়ে দেখা দেয়— এর একটি হল, আমাদের শেষ পরিণতি কোথায়? এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে ঃ যে মানবজাতির আমরা সদস্য, সেই মানুষের আদি উৎস কি? সবিনয়ে স্বীকার করতে হচ্ছে, এই পর্যায়ে ডঃ মরিস বুকাইলি যে-সব বক্তব্য রেখেছেন, বাংলাভাষায় রূপান্তরের সময় কোন কোন ক্ষেত্রে তা সংক্ষেপে করতে হয়েছে; এবং বহুক্ষেত্রেই বিশদব্যাখ্যা সংযোজন করতে হয়েছে, পাঠক-সাধারণের বুঝার সুবিধার জন্য।

প্রথম প্রশ্নের জবাবে আধুনিক সেক্যুলার-নলেজ বা ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, মানবজাতির শেষ পরিণতি হচ্ছে, ধ্বংস বা বিলুপ্তি এবং মানবজাতি মূলত সেই ধ্বংস তথা বিলুপ্তিরদিকেই অগ্রসরমান। পদার্থগত দিকথেকে মানবদেহের ভবিষ্যৎ পরিণতি ধূলি কিংবা তদনুরূপ কিছু। এই একই কথা অবশ্য একত্ববাদী সব ধর্মগ্রন্থেও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। সব মানুষের দেহই আজ হোক বা কাল হোক, পরিবর্তিত হয়ে ধূলিতে পরিণত হবে। আগেই বলেছি, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের কথাও একই। শুধু তাই নয়, আধুনিক বিজ্ঞান এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে নিতে গিয়ে অপরাপর গ্রহ-উপগ্রহের দিকেও নজর দিয়েছে। এ বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ

এই যে আমাদের সৌরজগৎ, পৃথিবী যার একটি গ্রহমাত্র, সেই গোটা সৌরজগতেরও শেষপর্যন্ত একই পরিণতি ঘটবে। অর্থাৎ, গোটা সৌরজগৎটাই একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

বস্তুগত দিকথেকে বিচার করেও নির্দ্বিধায় এই ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করা চলে যে, এই ধ্বংসের প্রক্রিয়ায় মানুষেরা বড়জোর 'পরিবর্তিত' কোন 'পদার্থে' পরিণত হবে। আর সেই পরিবর্তনের কারণে গোটা মানবজাতির দেহাবশেষ পরিণত হবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য কিছুতে। এদিকে মানবজাতির সেই শেষপরিণতি ঘনিয়ে আসার আগেই মানুষের দেহাবশেষ সমেত পৃথিবী

নামক গোটা এই গ্রহটি পরিণত হবে মহাশূন্যের এক প্রাণহীন বস্তুতে। অর্থাৎ, পৃথিবী পরিণত হবে একটি মৃত গ্রহে— অনেকটা ঠিক চাঁদের মতই। উল্লেখ্য, আইনস্টাইনের মত বরেণ্য মহাবিজ্ঞানীও মানুষের এই ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে এই বলে আর্তনাদ করেছেন যে, 'শেষপর্যন্ত মানবজাতি তার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতাসমেত নিক্ষিপ্ত হবে মহাশূন্যের আস্তাকুঁড়ে।'

কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। একত্ববাদী ধর্মগ্রন্থগুলোতে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মৃত্যুই মানুষের পরিণতি বটে ঃ কিন্তু মৃত্যুই জীবনের শেষ নয়। আমরা মানুষেরা পুনর্বার জীবন ফিরে পাব; এবং এই মৃত্তিকার ধূলি থেকে পুনরুত্থিত হয়ে হাজির হবো শেষ বিচারের জন্য।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে ইতিমধ্যে দেখা গেছে, আধুনিক সেক্যুলার জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানুষ এমনসব বস্তুনিষ্ঠ তথ্য-উপাত্ত উপহার পেয়েছে— যা থেকে এখন অনায়াসেই মানুষ তথা জীবনের উদ্ভব তথা প্রাণের আদি উৎস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

মানুষের আদি উৎস সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য ও ধর্মীয়গ্রন্থের বক্তব্যের এই যে বিচার-বিশ্লেষণ, এবং তার ভিত্তিতে এই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ— এরমধ্যে সুবিধা-অসুবিধা কতটুকু তারও বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

কোন কোন চিন্তাবিদ সম্ভবত বলবেন, এরকম একটি তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত টেনে আনাতে সুবিধা অনেক। আবার কেউ সম্ভবত এর বিপরীত অভিমতই প্রকাশ করবেন। আবার কেউ হয়তোবা বলতে চাইবেন, সুদীর্ঘ সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা ও বিশ্লেষণের ধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত একটি তথ্যের নতুন করে আলোচনার উপযোগিতাই-বা কি? আবার এমন লোকেরও অভাব হবে না যিনি মনে করবেন, এরকম আলোচনা এ ধরনের বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণকে নতুন একমাত্রা প্রদান করতে পারে।

পক্ষান্তরে, ধর্মে যাঁরা বিশ্বাসী, এই প্রশ্নের জবাবে তাঁদের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য, এ কথা ঠিক যে, ধর্মবিশ্বাসীদের অনেকে এ ধরনের গবেষণামূলক বিশ্লেষণে ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যকে সবার উপরে স্থান দিতে চাইবেন। পক্ষান্তরে, ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও কোন কোন বিজ্ঞানী চাইবেন, ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্য-উপাত্তের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে। এই অবস্থায় যা

সবচেয়ে সঠিক ও ন্যায্য বলে আমরা মনে করি, তা হল, ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত এবং ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যকে সম-গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা এবং উভয়ধরনের তথ্য ও বক্তব্যের উপর সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ পরিচালনা করা।

আমাদের এই বক্তব্যের পেছনে যুক্তি একটিই। আর তা হল, বিজ্ঞানের তথ্য ও ধর্মগ্রন্থের বক্তব্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ বিদ্যমান বলে যা-কিছু প্রচার করা হয় তা যেমন সত্য নয়; তেমনি ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী বলে শিক্ষিত সমাজে যে ধারণা প্রচলিত রয়েছে, তাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইতিপূর্বে তার পরিচয়ও পেয়েছি।

অনেকেরই অজানা নয় যে, কেউ কেউ এমনও আছে, যাঁরা তাঁদের নিজস্ব রীতি অনুযায়ী আল্লাহ্ কিংবা তাঁর অস্তিত্বের ধারণা বাদ দিতে প্রস্তুত। তাদের কথা, এক্ষেত্রে যদি আমরা নাও ধরি, তবুও দেখতে পাই যে, মানব-সৃষ্টির রহস্যের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য কোন জবাব শুধু বিশ্বাসের জোরে প্রদান করা অসম্ভব ঃ বিশ্বাসের সাথে সাথে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি।

যদিও অনেকে মনে করেন, এরকম আধুনিক তথ্যজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ ধর্মীয়-বিশ্বাস তথা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের জন্য ক্ষতিকর বা তার পরিপন্থী; তথাপি, যিনি যাই বলুন, এই জটিল প্রশ্নের জবাব খুঁজতে এটাই একমাত্র সঠিক, যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ পন্থা বলে আমরা মনে করি।

মূলত, সবযুগে সবদেশেই 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' ধরনের লোক থাকে। 'জ্ঞানপাপী' বা 'পণ্ডিতমূর্খ' বলে পরিচিত লোকদেরও সমাজে সদম্ভে বিচরণ করতে দেখা যায়। কিন্তু মুষ্ঠিমেয়সংখ্যক ওই ধরনের লোক যাই বলুন বা যাই ভাবুন, আধুনিক যুগের তথ্য-উপাত্ত গবেষণা ও বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে এমন যুক্তি-প্রমাণই প্রদান করছে যা মানুষকে অবিশ্বাসী করা তো দূরে থাক বরং আল্লাহ্র প্রতি অধিকতর বিশ্বাসী হওয়ারই শিক্ষা দিচ্ছে। এটি আরও বেশি সম্ভব হয়েছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নবনব গবেষণা ও আবিষ্কারের দরুন।

এই গবেষণা-বিশ্লেষণেও দেখা যায়, মানব-সৃষ্টি-সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান এখন আমাদের সবাইকে এক পরম বিস্ময়কর 'সাংগঠনিক ক্ষমতার' মুখোমুখি করছে। সেই 'মহাক্ষমতার' অদৃশ্য ইঙ্গিতেই জারি রয়েছে জীবনের ধারাপ্রবাহ— অব্যাহত গতিতে। সেই বিস্ময়কর সংগঠন ও জীবনের

অব্যাহতধারার মুখোমুখি হয়ে বিজ্ঞানীমাত্রেরই এখন স্বীকার না করে উপায় থাকছে না যে, সবকিছুর মূলে রয়েছেন একজন মহান কর্মকর্তা। শুধু তাই নয়, সকল ধরনের জটিল বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিষয়ের অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও গবেষণা-বিশ্লেষণে এটাও এখন সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে যে, সেই মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব এখন আর শুধু 'সম্ভাবনার' কোন বিষয় নয়, বরং তা একান্ত 'বাস্তব' এবং সম্পূর্ণভাবে 'বিশ্বাসযোগ্য' একটি বিষয়।

অবশ্য, সমাজে এমন লোকেরও অভাব নেই যারা পারলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেকোন আবিষ্কার-গবেষণা ও তথ্য-উপাত্তকে তুড়ি মেরেই উড়িয়ে দেন। তাঁদের ধারণা, এসব গবেষণা ও তথ্য-উপাত্ত পরম স্রষ্টার মহান অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ক্ষেত্র ও অবকাশ সৃষ্টি করে দেয়; মানুষকে মহান স্রষ্টার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মধ্যযুগের ধর্মীয় গোঁড়ামির দরুন বিজ্ঞানে প্রতিক্রিয়া, এবং বিজ্ঞানের ধর্ম-বিরোধিতার বাড়াবাড়ির দরুন ধর্মীয় প্রতিক্রিয়া একটি ঐতিহাসিক বিষয়। তাছাড়াও, নিছক অজ্ঞতার কারণে বিজ্ঞানের প্রাথমিক জয়যাত্রাকালে এমনটি যে ঘটেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ইতিহাস অন্যকথা বলছে।

এই গ্রন্থের ইতিপূর্বেকার অধ্যায়সমূহের পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে, পরবর্তী পর্যায়ে আধুনিক বিজ্ঞান তার প্রাথমিক-পর্যায়ের সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যানুসন্ধান, আবিষ্কার ও গবেষণার ফলাফল আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণকেই সুদৃঢ় করছে ঃ সকল সৃষ্টির পেছনে এক মহান স্রষ্টার সৃষ্টিকুশলতার প্রমাণকে করছে অনেক বেশি স্পষ্ট।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার গোড়ার দিকে কিছুসংখ্যক বিজ্ঞানী নাস্তিক্যধারার বস্তুবাদী-তত্ত্বকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে ভালবাসতেন। বিজ্ঞানের অব্যাহত জয়যাত্রার দরুন বিশেষত নবনব আবিষ্কার ও বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত উদ্ভাবনার ফলে তাঁদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। কারণটি সত্যিই বিচিত্র। এসব বিজ্ঞানী প্রথমত বস্তুবাদী তত্ত্বকেই গুরুত্ব দিতেন এবং বস্তুই ছিল তাদের নিকট শেষ সত্য। বেশকিছুকাল এইধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু বস্তুকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা প্রায় সবাই এমন এক পর্যায়ে উপনীত হন, যেখানে বস্তু আর বস্তু থাকে না। বস্তুর অতীত এমনকিছু হিসেবে প্রতিভাত হতে শুরু করে যে, তাঁরা প্রায় সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় না হয়ে পারেন না।

অধুনা, বস্তুবাদী গবেষণার ধারায় এভাবে বস্তুনিরপেক্ষ সত্যকে তো বটেই; সেই সাথে বস্তুর অতীত সত্যকে পাওয়ার ঘটনাই ঘটে চলেছে এন্তার। এজন্য, বস্তুবাদী তত্ত্ব অবশ্যই কৃতিত্বের হকদার! পক্ষান্তরে, হাতে গোনা যে দু'চারজন বিজ্ঞানী বস্তুর অতীত সত্যকে পেয়েও অস্বীকার করতে চেয়েছেন বা এখনো নাস্তিক্যবাদীধারায় পরম স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছেন, তাঁরা শুধু যে বস্তুর পক্ষেই নিমজ্জিত হয়ে রয়েছেন, তাই নয়, আধুনিক বিজ্ঞানের এই সর্বাধুনিক অগ্রযাত্রার কাফেলা থেকেও তাঁরা নিজেদের করেছেন বিচ্ছিন্ন।

অবশ্য, বস্তুবাদী বিজ্ঞানীদেরও অনেকে ইতিমধ্যে নিজেদের বস্তুতন্ত্রের মোহমুক্তি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। তাঁরা এখন উপলব্ধি করেছেন যে, বিজ্ঞানীমাত্রেরই উচিত, বস্তুর অতীত বস্তুর সাংগঠনিক রূপকারের অস্তিত্ব স্বীকার করা। কেননা, বিজ্ঞানের নবনব গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই ধারায় একটি সত্যই এখন তাঁদের নিকট স্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছে যে, শুধু এই পন্থায় আরেকটি এবং এই পদ্ধতিতেই যেকোন জটিল গবেষণার শেষ-প্রশ্নের জবাবপ্রাপ্তি সম্ভব। অনেকে, ইতিমধ্যে তা পেয়েও গেছেন এবং জবাব একান্ত স্পষ্ট।

মানুষের তথা জীবনের সৃষ্টি-সংক্রান্ত রহস্যের গবেষণায় আরেকটি ধারা বা পন্থার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহল, জীবকোষ পর্যায়ে জীবনের-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সর্বাধুনিক বিশ্লেষণ ও আবিষ্কার। মলিক্যুলার বায়োলজি এবং বংশগতি-সম্পর্কিত সর্বশেষ কয়েকযুগের গবেষণায় দেখা গেছে, কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করতেন, এই বিষয়ে আরও গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে এ অবকাশ রয়েছে। তাঁরা এর যৌক্তিকতা স্বীকার করতেন এবং শুধু মনে করা নয়, মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করতেন যে, এই ধারার গবেষণায় জীবনের সূচনা সম্পর্কিত সব রহস্যের সন্ধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু, তাঁদের সেই গবেষণার ফলাফল শেষপর্যন্ত কি দাঁড়িয়েছে? তাঁদের সেই গবেষণার সেই ফলাফলের কথা এভাবে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা হলে অনেকে হয়তোবা আহত বোধ করবেন।

কিন্তু তবুও সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে, যে দু'চারজন বিজ্ঞানী এ বিষয়ে শেষপর্যায় পর্যন্ত গবেষণাকর্মে লিপ্ত ছিলেন, তাঁরাও সর্বশেষ একপর্যায়ে পৌঁছে থেমে যেতে বাধ্য হন। ঠিক থেমে-যাওয়া নয়, বরং বলা ভালো, থমকে যাওয়া। বিস্ময়ে হতবাক হয়েই তাঁরা দেখেছেন, গবেষণার শেষপর্যায়ে গিয়ে জীবনের মানব-সৃষ্টি-সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নের সমাধানের আলোক উদ্ভাসিত হয়েছে বটে; কিন্তু সে আলোক জাগতিক নয় বরং অতীন্দ্রিয়!

উদাহরণস্বরূপ, জীববিজ্ঞানী জিন রোস্ট্যান্ড (জাঁ রোস্তাঁ) মৃত্যুর মাত্র দিন-কয়েক আগে ফরাসী টেলিভিশনে যে সাক্ষাৎকার দেন— এক্ষেত্রে তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। জিন রোস্ট্যান্ডকে সাক্ষাৎকারের একপর্যায়ে 'আল্লাহ্' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। এ যুগের এই সেরা বায়োলজিস্ট জবাবে বলেন যে, এতদিন পর্যন্ত তিনি আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু গবেষণার শেষপর্যায়ে পৌঁছে এখন একজন বিজ্ঞানী হিসেবেই তিনি স্বীকার না করে পারছেন না যে, সবকিছুর পেছনে নিশ্চয়ই একজন 'মহাপরিচালকের' অস্তিত্ব রয়েছে। কারণ, জীব-বিজ্ঞানের গবেষণার শেষপর্যায়ে উপনীত হয়ে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখেছেন, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অর্থাৎ ধারণাতীত ক্ষুদ্র অথচ জীবন্ত কিছুরমধ্যেও সৃষ্টিশীল কার্যকারণের ধারা রয়েছে অব্যাহত। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি সেই কার্যকারণের (প্রায় অতীন্দ্রিয়) ধারা অনুধাবন করতে পারেন; কিন্তু সেই সৃষ্টিশীল কার্যকারণের প্রক্রিয়া-পদ্ধতির বর্ণনার বা বিবরণ প্রকাশের কোন ভাষা তিনি খুঁজে পান না।

সত্য কথা বলতে কি, এখন সকলেরই একটা বিষয় গভীরভাবে অনুধাবন করার সময় এসেছে। তাহল, যেকোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ধারায় এমন একটা পর্যায় এসে হাজির হয়— যখন সে বিষয়ে নতুন কোন তথ্য আবিষ্কারের আর কোন অবকাশ থাকে না। শুধু তাই নয়, সেই একই বিষয়ের উপর গবেষণা পরিচালনা করার তেমন আর কোন ক্ষেত্রেও বাকি থাকে না। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী-গবেষককে এই পর্যায়ে এসে থেমে যেতে হয় এবং তখনই সেই গবেষক-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিপতিত হয় একই বিষয়ের সম্পূর্ণ নতুন কোন তত্ত্ব বা তথ্যের উপর।

যাহোক, 'মানুষের সৃষ্টি রহস্য'-সম্পর্কিত ধর্মীয় বক্তব্য কি, এবং সে-সব বক্তব্যের ওপর কিভাবে গবেষণা ও বিশ্লেষণ পরিচালনা করা যায়, বেশ কয়েকবছর ধরেই ড. মরিস বুকাইলি তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করে আসছিলেন। দুনিয়াতে বহু ধর্ম রয়েছে; ধর্মগ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু সবকিছু দেখেশুনে তাঁর ধারণা জন্মেছে অন্যসব ধর্ম বাদ দিয়ে তিনটি একত্ববাদী ধর্ম এবং সেই তিন ধর্মের ধর্মীয়গ্রন্থে সন্নিবেশিত 'মানব-সৃষ্টির আদি রহস্য'-সংক্রান্ত বক্তব্য নিয়ে পর্যালোচনা করাটাই হবে সর্বোত্তম।

মূলত, কোন ইহুদী কিংবা কোন খ্রিস্টান অথবা কোন মুসলমান কিভাবে একইসঙ্গে নিজস্ব ধর্মীয়-শিক্ষাকে ধারণ করেও 'মানব-সৃষ্টির আদি রহস্য'-সম্পর্কিত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্তকে গ্রহণ করতে পারেন, তাই

ছিল ড. মরিস বুকাইলির চিন্তা-ভাবনার বিষয়। প্রকৃতপক্ষে কি একজন বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে একই সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা সম্ভব? আর চলা যদি সম্ভব হয়, তবে সেই বিষয়টিকে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষের নিকট কিভাবে তুলে ধরা যেতে পারে?

উপায় অবশ্য একটি রয়েছে, আর তা হল, বিজ্ঞানের কোন-একটা বিষয়ে আধুনিক গবেষণা ও আবিষ্কারের যে ফলাফল, তারমধ্য থেকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সত্যগুলো বেছে নিতে হবে; এবং তারপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিন ধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলোতে যা কিছু আছে— তার ওপরে পরিচালনা করতে হবে এমন তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ,— যা হবে একইসঙ্গে নিরপেক্ষ ও যৌক্তিক।

সেই পথেই এগিয়ে যেতে হবে; এবং এই নগণ্য পুস্তকটি হচ্ছে, 'মানব-সৃষ্টির আদি রহস্য'-সম্পর্কিত সেই তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াস মাত্র। অতএব, সেই তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণে এ যাবত যা-কিছু পাওয়া গেছে— তার ফলাফল একনজরে কি দাঁড়ায়,— এবারে তা খতিয়ে দেখা উচিত।

উপসংহার

উপসংহারের এই বক্তব্য নিজস্ব। বলা চলে, মূল লেখকের সকল বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ।

মোটকথাটা তাহলে শেষপর্যন্ত এই দাঁড়াচ্ছে যে, মানুষের আদি উৎস তথা পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-প্রমাণ একদিকে যেমন ডারউইনের বানর-তত্ত্বকে বাতিল করে দিচ্ছে ঃ তেমনি অন্যদিকে তা সর্বশেষ একত্ববাদী ধর্ম ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনের তথ্য ও বক্তব্যকে করছে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং, ডারউইনের 'বিবর্তনেরধারায়।' ধাপে-ধাপে— পর্যায়ক্রমে সেই মানুষকে তিনিই পরিগঠিত করেছেন এবং কোরআনের বর্ণনানুসারে তিনিই— ঐশীজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে তারমধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে সেই মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ও গৌরবে ভূষিত করেছেন। মানুষের আদি উৎস, মানুষের সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব সম্পর্কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা-আবিষ্কারের সারকথা এটাই।

বিজ্ঞানের 'শেষ কথা' বলে কোন কিছু নেই। কিন্তু সর্বশেষ ধর্ম (ইসলাম) শেষ নবীর (সঃ) মাধ্যমে সর্বশেষ আসমানী কিতাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সারকথাকে শেষ কথার আদলে পেশ করেছে এভাবে ঃ

"তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নাই। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুর পরিজ্ঞাতা। তিনি পরম করুণাময় ও দয়াশীল।

তিনিই আল্লাহ্, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। তিনি সবকিছুর মালিক, তিনিই পবিত্রতম, তিনিই শক্তিদাতা, তিনিই নিরাপত্তাবিধানকারী, তিনিই সকল কিছুর সংরক্ষক, তিনিই সর্বজয়ী, তিনিই প্রবল, তিনিই মহামহিমান্বিত। আরোপিত সকল শরিক থেকে আল্লাহ্ পবিত্র।—

তিনিই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টির পরিকল্পনা রচনাকারী, উহার বাস্তবায়নকারী,— সেই অনুসারে আকার-আকৃতি প্রদানকারী। সকল উত্তম নামের অধিকারী তিনি। আসমান ও জমীনের সকলকিছুই তাহার পবিত্রতা ঘোষণাকারী এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"—সূরা ৫৯ (হাশর), আয়াত ২২, ২৩ ও ২৪ ঃ

— ০ —